বঙ্কিমচন্দ্র

(জীবন ও সাহিত্য)

গোপালচন্দ্র রায়



সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

সাহিত্য অকাদেমী ॥ ১৯৮১

প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

সংযোজন

নিবেদন

প্রথমেই বলে রাখি—'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বা চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নামে আমার একটা বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ঐ বইয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রাবলী বিস্তৃত প্রসঙ্গ-কথা সহ দিয়েছি। তাতে বঙ্কিম-চন্দ্রের জীবনের অনেক টুকরো ঘটনা এবং তাঁর সাহিত্য সম্পর্কেও কিছু কাহিনী রয়েছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে সেই বইটিকেও এই 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ের একটা অংশ বা অঙ্গ হিসাবে ধরতে হবে।

এর আগে আমি, বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক জীবনের গল্প, আলাপ-আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র নামেও ক'টি বই লিখেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রের সম্বন্ধেও হালে লেখা 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য' নামে আমার আর একটা বই আছে। এই বইয়েও স্বভাবতই বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু কথা এসে গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এখানে উক্ত আমার বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক জীবনের গল্প প্রভৃতি চারটি বই-ই নিঃশেষিত হওয়ায় এবং পুনর্মুদ্রণের আর ইচ্ছা না থাকায়, ঐ বইগুলির অনেক কাহিনী এই 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে দিয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁর স্মৃতি-জড়িত বহু স্থানেই গেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জীবনের কর্মস্থল হুগলী, হাওড়া, বারাসত, বারুইপুর, বহরমপুর, আলিপুর প্রভৃতি স্থানেও গেছি। কোথাও কিছু কিছু তথ্য পেয়েছি, কোথাও ব্যর্থ হয়েছি। বারুইপুর কোর্টে বহুবার গেছি। তার কারণ, ঐ কোর্টের এক বৃদ্ধ উকিল বলেছিলেন—আমার কাছে এই কোর্টের বঙ্কিমচন্দ্রের একটা মামলার রায়ের নকল আছে। সেটা কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছি না।

ঐ উকিলবাবু শেষ পর্যন্ত সে নকল আর খুঁজেই পেলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের প্রথম দিকেই আছে—রসুলপুর নদীর মোহনার কাছে নবকুমার নৌকা থেকে নেমে বনে রান্নার জন্য কাঠ কাটতে গেলে, সেই সময় হঠাৎ নদীতে জোয়ার এসে যায়। প্রবল জোয়ারে মাঝিরা নৌকা সামলাতে না পারায়, যাত্রীরা নবকুমারকে ফেলে চলে আসে।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই জায়গার কথায় লিখেছেন—'যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয়।'··

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা ক্ষেত্র এই দরিয়াপুরেও গেছি। এই দরিয়াপুর বা দারিয়াপুর মেদিনীপুরে কাঁথির মাইল দশেক উত্তর-পূবে অবস্থিত। এর পাশেই দৌলতপুর গ্রাম ও রসুলপুর নদীর মোহনা। দারিয়াপুরবাসীরা বলেন—বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে (পরবর্তীকালে নেগুয়ার মহকুমা অফিস সেখান থেকে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কাঁথিতে উঠে আসে) একবার এক ডাকাতির তদন্ত করতে এখানে এসেছিলেন। এসে স্থানীয় ডাক বাংলোয় কয়েকদিন ছিলেন। তখনই তিনি এখানে বসে তাঁর কপালকুণ্ডলা রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। পরে তিনি বই লেখার সময় এখানকার নদী, সমুদ্রতীর ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা বইয়ে দেন।

দারিয়াপুরবাসীরা এই বঙ্কিম-স্মৃতি স্মরণে তাঁদের গ্রামে ১৩২৬ সালে একটা স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করে তাতে প্রস্তর ফলকে দারিয়াপুরকে কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা ক্ষেত্র বলে লিখে রেখেছেন। এখানে প্রতি বছর ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু দিনে বঙ্কিম-স্মৃতি সভা হয়। ১৩৬৩ সালের সভায় প্রধান অতিথি হয়ে আমি গিয়েছিলাম। পরে ১৩৬৪ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণের যুগান্তর পত্রিকায় রবিবারের সাময়িকীতে এ নিয়ে একটা প্রবন্ধও লিখেছিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে বর্ণিত গড়মান্দারণেও একাধিক বার গেছি এবং কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহেও সক্ষম হয়েছি। এখন এ সম্পর্কে এখানে একটু বিস্তৃত ভাবেই বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী লেখার কিছুদিন আগে, একবার জাহানাবাদে (বর্তমান নাম আরামবাগ) যান। তখন সেখানে তাঁর মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র এসেসরের কাজ করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র মেজদার কাছে বেড়াতে গিয়ে, ঐ অঞ্চলে প্রচলিত, মোগল-পাঠানের যুদ্ধে গড়মান্দারণের রাজারও যুদ্ধ করার কাহিনী শুনে, গড়মান্দারণ দেখতে গিয়েছিলেন। ঐ কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র অনেক আগে তাঁর মেজ-ঠাকুরদার মুখে প্রথম শুনেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে গড়মান্দারণ সম্বন্ধে লিখেছেন—'অদ্যাপি পর্যটক গড়মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলভ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন।

দুর্গের নিম্নভাগ মাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে। অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে।'

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার ৯।১০ বছর পরে বর্ধমান জেলার রায়না নিবাসী রাজেন্দ্রনাথ দাস দত্ত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ১২ই বৈশাখ ১২৮১, তারিখের সংখ্যায় এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'গড়ের পরিসর দুই-তিন ক্রোশের অধিক হইবে। গড়ের ভিতর একটি গির্জা আছে।...এটি এখনও অক্ষুন্ন ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহা দেখিতে নূতনের ন্যায়। এই গির্জার উপরে উঠিয়া বোধ হয় শত্রুপক্ষীয় সৈন্য দর্শন হইত।'

এখনকার নবাসন গ্রামের কাছে সেই উচ্চ মিনারটি এখনও আছে।

বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে লিখেছেন—মান্দারণের গড়ের আধ ক্রোশ দূরে শৈলেশ্বরের মন্দির।—বাস্তবেও মান্দারণ গড়ের আধ ক্রোশ দূরে কাঁঠালী গ্রামে এই শৈলেশ্বরের মন্দির আজও রয়েছে। পুরাতন মন্দির আজ আর নেই, শৈলেশ্বর বা শিব বর্তমানে একটি মাটির ঘরে থাকেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে, গড়মান্দারণ দেখে এসে দুর্গেশনন্দিনী লিখেছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই গড়মান্দারণের ভগ্নাবশেষ আজও যা সেখানে রয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়, মান্দারণ গড় একেবারে নগণ্য ছিল না। এই গড়েব অধীশ্বর রীতিমতই একজন প্রভাবশালী শাসনকর্তা ছিলেন।

বঙ্কিম-জন্ম শত বার্ষিকীর সময় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে যে বঙ্কিম-রচনাবলী প্রকাশিত হয়, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক বা ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাসগুলির একটা করে ঐতিহাসিক ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার। সেই হিসাবে যদুনাথ দুর্গেশনন্দিনীরও একটা ভূমিকা লিখে দেন। ঐ ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

'বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে সত্য ইতিহাস কতটুকু আছে? মানসিংহ কতলু খাঁ, খাজা ইসা, ওসমান—ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক পুরুষ এবং সে যুগে বঙ্গের ঠিক সেই স্থলে বাস করিতেন। ইহাও সত্য যে, জগৎসিংহ অগণিত পাঠানদের নিকট পরাজিত হইয়া এক দুর্গে আশ্রয় লন এবং তাহার কিছুদিন পরেই কতলু খাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার দেওয়ান খাজা ইসা কতলুর বালক পুত্রদের রাজ্য বাঁচাইবার জন্য মানসিংহের সহিত দেখা করিয়া বহুমূল্য

উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন। ইহা ভিন্ন দুর্গেশনন্দিনীর আর সব কথা কাল্পনিক।'

যদুনাথ আরও লিখেছেন—জগৎ সিংহের আহত হওয়া, কতলুর দুর্গে আবদ্ধ থাকা এবং তাঁর দ্বারা কতলুর মরণকালে সন্ধি ভিক্ষা করা, এই শাখা-পল্লবগুলি ইতিহাসের বাইরে হলেও বঙ্কিম এগুলি নিয়েছেন চার্লস ষ্টুয়ার্টের হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল বা বাঙ্গলার ইতিহাস (১৮১৩ খ্রীঃ) বই থেকে। ষ্টুয়ার্ট আবার নিয়েছেন ঘোর কাল্পনিক কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার ডাও এর বই থেকে।

এই বলে যদুনাথ ষ্টুয়ার্টের বই থেকে পাঠানদের সঙ্গে জগৎসিংহের যুদ্ধের ঘটনাটা নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত করে বলেছেন—এখানে অসংখ্য ভুল আছে। তারিখের গোলমাল, ঘটনার ওলট পালট সাজান।···জগৎসিংহের এই যুদ্ধ একমাত্র আকবরনামায় (৩য় ভলুমে) আছে।

শেষে তিনি আকবরনামা থেকেও ঐ পাঠানদের সঙ্গে জগৎসিংহের যুদ্ধের কাহিনীটা নিজের ভাষাতেই দিয়েছেন।

ষ্টুয়ার্টের বর্ণনায় অসংখ্য ভুল আছে বললেও এই পাঠান-মোগলের যুদ্ধ কাহিনী যদুনাথ দুটা বই থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন, সে তো প্রায় একই দেখছি—

ষ্টুয়ার্টের বই এবং আকবরনামা উভয় বইয়েই আছে, পাঠানদের দমন করবার জন্য রাজা মানসিংহ ৯৯৮ হিজরী সনে বাংলায় এসে জাহানাবাদে শিবির স্থাপন করেছিলেন।

উভয় বইয়েই আছে—কতলু যুদ্ধাভিলাষে উড়িষ্যা থেকে ধরপুরে আসেন। ধরপুর জাহানাবাদ থেকে ২৫ ক্রোশ দূরে।

আর দুটা বইয়েই এও আছে যে, মানসিংহ কুমার জগৎসিংহকে পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে ছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান সেনাপতির কপট সন্ধিতে ভুলে জগৎসিংহ শেষ পর্যন্ত পাঠানদের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। পরে জগৎসিংহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলেন।

জগৎসিংহের বিষ্ণুপুরে যাওয়া, এই শেষের কথাটা নিয়ে ষ্টুয়ার্ট লিখে-ছেন—পাঠানরা জগৎসিংহকে বন্দী করে বিষ্ণুপুরে নিয়ে গিয়েছিল।—কিন্তু আকবর নামা অনুযায়ী যদুনাথ বলছেন—আকবরের পরম ভক্ত বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির জগৎ সিংহকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে নিজ রাজধানী বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন।

যদুনাথ বলেছেন—দুর্গেশনন্দিনীতে বর্ণিত এই পাঠান-মোগলের যুদ্ধের কাহিনীর জন্য ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গলার ইতিহাসই 'বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র সম্বল ছিল।'

দুর্গেশনন্দিনীতে পাঠান সেনাপতি ওসমান প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। এই ওসমানের কথা কিন্তু ষ্টুয়ার্টের বইয়ে নেই। বঙ্কিম তাঁর দুর্গেশনন্দিনীর ২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদে ওসমানের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—'ওসমান কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র।' এই লিখে 'ভ্রাতুষ্পুত্রের' পাশে তারকাচিহ্ন দিয়ে পাদটিকায় লিখেছেন—ইতিহাসে লেখে পুত্র।

এ থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিম এই ওসমানের কথা ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস ছাড়া অন্য কোন ইতিহাস থেকেই নিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দুর্গেশনন্দিনীতে গড়মান্দারণের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখেছেন—'বাঙ্গালার পাঠান সম্রাটদিগের শিরোভূষণ হোসেন শাহের বিখ্যাত সেনাপতি ইসমাইল গাজী এই দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু কালক্রমে জয়ধর সিংহ নামে একজন হিন্দু সৈনিক ইহা জায়গীর পান। এক্ষণে বীরেন্দ্র সিংহ নামা জয়ধর সিংহের একজন উত্তর পুরুষ এখানে বসতি করেন।'

ওসমানের ক্ষেত্রে দেখা গেল, বঙ্কিম ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গলার ইতিহাস ছাড়া অন্য কোন ইতিহাস থেকে ওসমানের কথা নিয়েছেন।

এমনি, গড়মান্দারণের অধীশ্বর যদি বীরেন্দ্র সিংহ নাও হন, তবুও বীরেন্দ্র সিংহের কথা বঙ্কিম অন্যত্র থেকেও নিতে পারেন।

L. S. S. O' Malleyর লেখা Gazetteer of the Santal Parganas বইয়ে আছে—

মণিহারী অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তী যে, মানসিংহ বাংলা জয় করতে এসে রাজমহলের পাশে মণিহারীতে শিবির স্থাপন করেন এবং একটা দুর্গও নির্মাণ করেন। সেই সময় মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ ঐ অঞ্চলের পরগণাধিপতি বীরেন্দ্র সিংহের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। বীরেন্দ্র সিংহের রাজধানী ছিল বিক্রমকিতায়। তাঁর এক স্ত্রীর নাম ছিল বিমলা। তিনি এঁর নামে বিমলিগড় নামে একটা দুর্গ করেছিলেন। বিমলা ছিল জগৎ সিংহের ঐ নববিবাহিতা স্ত্রীর বিমাতা।

৪-৪-১৯৬৫ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকায় জনৈক চারুচন্দ্র চৌধুরী একটা চিঠিতে ও'ম্যালির এই লেখাটি প্রকাশ করে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেন। পরে প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তও তাঁর 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে ও'ম্যালির এই লেখাটা উদ্ধৃত করেছেন।

বঙ্কিম ও'ম্যালির বইয়ে ঐ প্রচলিত কিংবদন্তীর কাহিনীটি পড়ে তা থেকে বিমলা, বীরেন্দ্র সিংহ ও তাঁর কন্যার কথা নিয়ে গড়মান্দারণের প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করতেও পারেন। তারপর অন্যান্য ঘটনায় ও নামে কল্পনা তো আছেই।

দুর্গেশনন্দিনীতে দেখছি, বঙ্কিম লিখেছেন—বীরেন্দ্র সিংহের পিতা, সব দিক থেকে ভাল হবে ভেবে যেখানে পুত্রের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, বীরেন্দ্র সেখানে বিয়ে না করে নিজ পল্লীর পতিপুত্রহীনা এক দরিদ্র রমণীর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। এই নিয়ে পিতা-পুত্রের মধ্যে সর্বদা বিবাদ বচসা হ'ত। কিছুদিন পরে বীরেন্দ্র পিতার উপর বিরক্ত হয়ে দেশ ছেড়ে দিল্লী চলে যান। যাওয়ার সময় স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা থাকায় তাঁকে সঙ্গে নিতে পারেন নি।

বীরেন্দ্র দিল্লীতে গিয়ে রাজপুত সেনাদলের মধ্যে যোগ দিয়ে অল্প দিনে নিজগুণে উচ্চপদস্থ হন এবং কয়েক বৎসরেই ধনী ও যশস্বী হন। পরে পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নিজের গড়মান্দারণে ফিরে আসেন। আসার সময় দ্বিতীয়া স্ত্রী বিমলাকেও সঙ্গে আনেন।

বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে মূল কাহিনী আরম্ভ করে, গোড়াতেই বীরেন্দ্র সিংহের পূর্ব কাহিনী হিসাবে উপরোক্ত কাহিনীটি বলেছেন। আমার অনুমান, বঙ্কিম বীরেন্দ্র সিংহ ও বিমলার কাহিনীটি সাঁওতাল পরগণার গেজেটিয়ার থেকে নিয়েই এখানে বীরেন্দ্রর পূর্ব কাহিনী হিসাবে এইভাবে দিয়েছেন।

যদুনাথ দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক ভূমিকা লিখতে গিয়ে একবারও কিন্তু গড়মান্দারণের নাম করেন নি। কেবল একটা বাক্যে আকবরনামা বর্ণিত পাঠানদের সঙ্গে জগৎ সিংহের যুদ্ধের স্থান রায়পুরের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

জাহানাবাদ থেকে ৭ মাইল পশ্চিমে মান্দারণ গ্রাম, আর মান্দারণের ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীপুর গ্রাম। পারসিক হাতের লেখায় 'শ্রীপুর' শব্দ অযত্নে লিখলে রায়পুর পড়া অতি সহজ।

যদুনাথ বাড়িতে বসে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী একটা সার্ভে ম্যাপ দেখে এই জাহানাবাদ, মান্দারণ ও শ্রীপুর গ্রামগুলি ও এদের দূরত্ব দেখেছেন। কিন্তু গড়-মান্দারণ ও ঐ গড়ের অধীশ্বরের সম্বন্ধে একটা কথাও উচ্চারণ করেন নি।

যদুনাথ আকবরনামা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, মান্দারণ গ্রামের

২ মাইল দূরে রায়পুরে পাঠানদের সঙ্গে জগৎসিংহের যুদ্ধ হয়েছিল। যদুনাথ এই ইতিহাসের বাইরে গড়মান্দারণ সম্বন্ধে একটা কথা না বললেও বা আকবর নামায় লেখা না থাকলেও গড়মান্দারণ সম্বন্ধে স্থানীয় প্রচলিত কিংবদন্তীকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। উপেক্ষা করা যায় না, এই জন্য যে, এখানকার গড়ের ধ্বংসাবশেষ, গড়ের একটু দূরে শত্রু সৈন্য দেখার জন্য উচ্চ গির্জা বা মিনার, আর গড়ের সংলগ্ন যুদ্ধে-নিহত সৈন্যদের পাইকারী হারের কবরখানা বা সমাধি ক্ষেত্রের চিহ্ন ইত্যাদি অল্প বিস্তর আজও এখানে রয়েছে।

এই গড়মান্দারণ যে এক সময়ে, বীরেন্দ্র সিংহ হউন বা না হউন, কোন হিন্দু রাজার অধীন ছিল, তার প্রমাণ পেলাম, গড়মান্দারণে গিয়ে যখন একাধিক ব্যক্তির মুখে শুনলাম—কয়েক বছর আগে দুটি রাখাল বালক গড়ের মধ্যে গরু চরাবার সময় দুটি স্বর্ণমুদ্রা কুড়িয়ে পেয়েছিল। ঐ দুটি স্বর্ণমুদ্রার একটিতে ছিল শিশুকৃষ্ণের মূর্তি, অপরটিতে ছিল ধেনুসহ কৃষ্ণমূর্তি।

গড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শেষ প্রান্তে বড় বড় চৌকা কাল পাথরের নির্মিত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজও (১৯৮১ খ্রীঃ) রয়েছে।

এই কাল পাথরের দুর্গের ভগ্নাবশেষের লাগোয়াই যে গ্রাম তার নাম—রাঙ্গামাটি। গ্রামটি ছোট্ট; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, গ্রামের মাটি সত্যই লাল। অথচ গড়মান্দারণ বা আশপাশের অন্যান্য গ্রামের মাটির রঙ সাধারণ বেলে মাটির রঙের মত।

রাঙ্গামাটি গ্রামের মাটি লাল হওয়া সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ, এখানে এক সময় বাইরের আক্রমণকারী এক রাজা ও তাঁর সেনাদলের সঙ্গে গড়মান্দারণের রাজার ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। তাতে তখনকার তরবারি যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই এত লোকক্ষয় হয়েছিল যে, তাদের রক্তে এখানকার মাটি ভেসে গিয়েছিল। সেই রক্তে ভেজা মাটির এলাকাটাই হয়েছে রাঙ্গামাটি গ্রাম।

রাঙ্গামাটি গ্রামের উৎপত্তি সংক্রান্ত এই প্রবাদ অসত্য হতে পারে, তবুও এই প্রচলিত প্রবাদ থেকে একটা ব্যাপার অনুমান করা যেতে পারে যে, এক সময় গড়মান্দারণের অধিপতির সঙ্গে বাইরের কোন আক্রমণকারী রাজার একটা যুদ্ধ হয়েছিলই।

মান্দারণ গড়ের ভিতরে আমোদর নদের (বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে এই

আমোদরের কথাও বলেছেন) একেবারে গায়েই খুব উঁচু এক ঢিবির উপরে একটা সমাধি বেদি আছে। এর একটু দূরে আমোদরের অপর পারে আর এক ঢিবির উপর আর একটা সমাধি আছে। এই সমাধি দুটা এখানে যথাক্রমে বড় পীর সাহেবের ও ছোট পীর সাহেবের সমাধি বা আস্তানা নামে খ্যাত। ছোট পীর সাহেবের কবরের তত্ত্বাবধায়ক জনাব ইব্রাহিম হোসেনের সঙ্গে ঐ সমাধি প্রাঙ্গণে বসে আলাপ হয়েছিল। তখন তিনি বলে ছিলেন—এই দুই পীর সাহেব বা দুই প্রধান মুসলমান বীরেন্দ্র সিংহের দ্বাররক্ষক ছিলেন। এক জন অর্থাৎ এই ছোট পীর সাহেব ছিলেন গড়ের বাইরের দ্বারের রক্ষক; আর বড় পীর সাহেব ছিলেন গড়ের ভিতরের দ্বার রক্ষক। এঁরা বীরেন্দ্র সিংহের খুব বিশ্বস্ত ছিলেন। উভয়েরই নাম ছিল—ইসমাইল গাজী।

হোসেন সাহেব বললেন—বীরেন্দ্র সিংহেরও সঙ্গে পাঠানদের যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে ব্যবহৃত একটা বেশ বড তরবারি আজও আমার এক পিসতুতো ভাই-এর কাছে আছে। সে পুরুষানুক্রমে সেটা রক্ষা করে আসছে।

দেখলাম, ছোট পীর সাহেবের সমাধির কাছে ঢিপির নীচে উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রশস্ত জায়গাটা বর্তমানে স্থানীয় মুসলমানদের ব্যবহৃত কবরখানা। হোসেন সাহেব এই কবরখানায় আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন—কতলু খাঁর সৈন্যদলের সঙ্গে রাজা বীরেন্দ্র সিংহের সৈন্যদলের যুদ্ধে যে সব সৈন্য নিহত হয়েছিল, তাদের মৃতদেহগুলো এনে এখানে দু জায়গায় দুটা বিরাট কুয়োর মত খুঁড়ে, তাতে সমস্ত মৃতদেহ ফেলে ঐ দুটা বিরাট বিরাট কুয়োয় সমাধিস্থ করা হয়েছিল। সমাধিস্থ করে উপরে বড় বড় চৌকা কাল পাথর দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়। সেই কুয়োর উপরের কাল পাথর এখনও দেখা যাচ্ছে।—এই বলে তিনি ঐ বিরাট কুয়ো কবর ও তার উপরের কাল পাথর দেখালেন।

হোসেন সাহেব বর্ণিত ইসমাইল গাজী এই একই নামধারী দুই ব্যক্তি বীরেন্দ্র সিংহের প্রহরী ছিলেন ইত্যাদি কথায় অসত্য থাকতে পারে; কিন্তু তাঁর দেখানো কুয়ো কবর দুটি যে সত্যই বিরাট বিরাট কুয়ো কবর তাতে সন্দেহ নেই। তাই এই গড়মান্দারণে যে এক সময় একটা যুদ্ধ হয়েছিল, সে কথা সত্য বলেই ধরা যেতে পারে।

গড়মান্দারণের মধ্যস্থিত ইসমাইল গাজীর কবর দুটি সম্বন্ধে স্থানীয়

পরমেশপ্রসন্ন রায় ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর 'দুর্গেশ-নন্দিনী নিকেতন' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

গড়ের একটি দুর্গের 'উপরিভাগ অনেকটা সমতল ক্ষেত্র। সর্বোচ্চস্থলে প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত এক বৃহৎ সমাধি দৃষ্ট হইবে। ইহারই নাম বড় আস্তানা। ...জনপ্রবাদ গৌড়াধিপ হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজীর দেহ এস্থানে রক্ষিত আছে।

বড় আস্তানার প্রায় এক মাইল উত্তর-পূর্বে ভিতর গড়ে আরও একটি দুর্গের বিশাল স্তূপ বর্তমান। দুর্গমূলস্থিত সমতলক্ষেত্র সম্প্রতি স্থানীয় মুসলমানদের গোরস্থানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। উপরে এক পুরাতন ইদ্‌গা। ঈদের সময় এই স্থানে বিশেষ জনতা হয়। ইদ্‌গা সংলগ্ন এক জীর্ণ সমাধি মন্দির। এটিও উক্ত গাজী সাহেবের কবর বলিয়া পরিচিত। ইহার নাম ছোট আস্তানা। ...বড় আস্তানার তুলনায় ছোট আস্তানা প্রাচীন নহে। এই দুই স্থানেই উক্ত গাজী সাহেবের কবর হওয়া অসম্ভব। পুরাতত্ত্ববিদ্ মিঃ ব্লকমান অনুমান করেন যে, বরদা পরগণার রাজা বীরাগ্রগণ্য গাজী সাহেবের পূজা মানত করিয়া, বর্ধমানের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এইজন্য বরদা রাজ কৃতজ্ঞ চিত্তে গাজী সাহেবের নামে এই দরগা স্থাপন করেন।'...

ব্লকমানের এই অনুমানও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কারণ. এমনও হতে পারে—সেনাপতি ইসমাইল গাজী তাঁর মৃত্যুর পর যখন মুসলমান-দের কাছে, এমন কি হিন্দুদের কাছেও রণজয়ী বীর যোদ্ধা বলে গণ্য হতে লাগলেন, তখন বরদারাজ, ইসমাইলকে আদর্শ ও বীর যোদ্ধা হিসাবে স্মরণ করে বা তাঁর দরগায় মানত করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভের পর ইসমাইলের স্মরণে এই কবর তৈরি করে দিয়েছিলেন।

গড়মান্দারণের অদূরে বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার অন্তর্গত লোকপুর গ্রামেও ইসমাইল গাজীর একটি কবর আছে। এই কবরটি সম্বন্ধে স্থানীয় একটা কিংবদন্তী যে, এই ইসমাইল গাজী একজন ইসলাম ধর্মের প্রচারক ছিলেন। ইনি গড়মান্দারণের হিন্দু রাজার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। বাঁকুড়ার মুসলমানরা এই কবরটিকে ধর্মীয় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এই কিংবদন্তী থেকে জানা গেল যে, গড়মান্দারণে এক সময় হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল।

রঙ্গপুর জেলার কাঁটাদুয়ার নামক স্থানেও ইসমাইল গাজীর কবর বলে আর

একটা কবর আছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গলার ইতিহাস' বইয়ে এই ইসমাইল গাজী সম্বন্ধে লিখেছেন—ইনি বাঙ্গলার সুলতান রুকন-উদ্দীন বাবরক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪) সেনাপতি ছিলেন এবং গড়-মান্দারণের বিদ্রোহী রাজা গজপতিকে পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন।

রাখালদাসের বই থেকে আর একটা কথা জানা যায়—বাঙ্গলার নবাব হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সেনাপতি ইসমাইল গাজী ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন উড়িষ্যা আক্রমণ করেন, তখন উড়িষ্যা অধিপতি প্রতাপ রুদ্র রাজ্যের দক্ষিণাংশে ছিলেন। তিনি উত্তরাভিমুখী হয়ে অগ্রসর হলে ইসমাইল গাজী হুগলী জেলার গড়মান্দারণ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এখানে এই আলোচনায় একাধিক নামের ইসমাইল গাজীর সন্ধান পাওয়া গেলেও, এটা দেখা গেল যে, হোসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজীর সঙ্গে গড়মান্দারণ দুর্গের একটা যোগ ছিল। আর এটাও দেখা গেল যে, গড়মান্দারণে এক সময় হিন্দু রাজাও রাজত্ব করেছিলেন।

অতএব বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে গড়মান্দারণের প্রস্তুতকারক প্রভৃতি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাকে একেবারে অবাস্তব বলা যায় না।

এ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের যতগুলি জীবনী লেখা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে বঙ্কিম-চন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী' এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের লেখা 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' বই দুটিই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুটি বই থেকেই আমি অনেক সাহায্য নিয়েছি। তবে এঁদের লেখার মধ্যে যেখানে যেখানে ভুল দেখেছি, সেগুলোও আমার বইয়ে উল্লেখ করে আলোচনা করেছি।

আমার এই বইয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ রচনা হল 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিমচন্দ্র'। কারণ, রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও তাঁদের কথোপকথন নিয়ে এতকাল যে কাহিনীটি চলে আসছে, নানা কারণে আমি তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেছি। এ নিয়ে অবশ্যই আমি আমার স্বপক্ষে প্রচুর যুক্তি দেখিয়েছি।

তবুও আমার এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধে যদি কারও কিছু বলার থাকে, এই ভেবে প্রবন্ধটি গ্রন্থভুক্ত করার আগে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ছাপতে দিয়েছিলাম। 'দেশ'-সম্পাদক তাঁর কাগজে দীর্ঘকাল ধরে আমার অসংখ্য লেখা ছাপলেও এই লেখাটি কিন্তু ছাপতে সাহস করলেন না।

পরে 'অমৃত' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আমার এই প্রবন্ধটির কথা জানতে পেরে প্রবন্ধটি ছাপাতে আগ্রহী হন। প্রবন্ধটি নিয়ে অনেকটা কম্পোজ করে আমাকে প্রুফও দেখান। এমন কি. তখন 'অমৃত'র আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপনও দেন। কিন্তু যে সংখ্যায় বেরোবার কথা, সেই সংখ্যায় দেখা গেল—অনিবার্য কারণবশত প্রবন্ধটি ছাপা গেল না, বলে আর ছাপলেনই না। আসলে ওঁরাও প্রথমে খুব সাহস দেখিয়ে শেষে ছাপতে সাহস করলেন না।

তবে এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, আমার এই বই ছাপার সময় নৈহাটীর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের দুই বিখ্যাত রামকৃষ্ণ-ভক্ত অধ্যাপক ও সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিম-চন্দ্র' প্রবন্ধটি পড়ে প্রবন্ধটির উচ্চ প্রশংসাই করেছেন।

আমার এই বইয়ে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ লেখা হল—বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে মুসলমান লেখকদের মতামতগুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি গ্রন্থের জন্য মুসলমানরা যে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, বঙ্কিম-সাহিত্যের সমালোচকরা, এমন কি বঙ্কিমের জীবনীকাররাও কেউই এ পর্যন্ত তাঁদের লেখায় সে কথার উল্লেখও করেন নি। অথচ বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা (পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গলাদেশ মিলিয়ে) বাঙ্গালী হিন্দুর প্রায় তিন গুণের কাছে। আর শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে এঁরা আজ হিন্দুর চেয়ে কোন অংশেই পিছিয়েও নেই। তাই আমরা, যাঁরা বাঙ্গলা সাহিত্যের, তথা বঙ্কিম-সাহিত্যেরও পঠন-পাঠন করি, সেই মোট বাঙ্গালীর প্রায় তিন চতুর্থাংশ বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে কি বলেন, সেটাও দেখা বিশেষ প্রয়োজন। মুসলমানরা কেন বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর, সেই সূত্রে বঙ্কিমেরও উপর ক্ষুব্ধ, এঁদের ক্ষোভের কারণ কি, এই ক্ষোভ কতটা সঙ্গত ?—বঙ্কিম-সাহিত্যের বা বঙ্কিম-জীবনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য মুসলমানদের বঙ্কিম-বিষয়ক কথাও আলোচনা করা দরকার। আমি আমার এই বইয়ে 'সমালোচনার সম্মুখে' অধ্যায়ে বঙ্কিমের প্রতি মুসলমানদের অভিযোগগুলি নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় আমার ঘরে বসে এই অংশটা লেখার সময় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের (সংগ্রহশালার দুটা বাড়ির পরেই এই কলেজ) প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ সত্যজিৎ চৌধুরী ডি লিট সংগ্রহশালায় এসে আমার মুখে এই অংশটা শোনেন। শুনে তিনি লেখাটার প্রশংসা সহ বঙ্কিম-সাহিত্য-সমালোচনায় এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

এবার আর একটি বিতর্কিত বিষয়। আমি বিস্তৃত আলোচনা করে শেষে বইয়ে ১৪২ পৃষ্ঠায় বলেছি—'বন্দেমাতরম্' রচিত হলে বঙ্কিমের সংগীত-শিক্ষক যদু ভট্ট এতে প্রথম সুর দিয়ে বঙ্কিমকে শোনান।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—তাঁর (বঙ্কিমের) বন্দেমাতরম্ গান আমিই প্রথম সুর দিয়ে তাঁকে শোনাই।

সেকালের থিয়েটারের বিখ্যাত সুরকার দেবকণ্ঠ বাগচী তাঁর 'সুরের রূপ' গ্রন্থে লিখেছেন—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রঙ্গালয়ে আনন্দমঠ অভিনীত হওয়ার সময় তিনিই প্রথম বন্দেমাতরমে সুর দেন।

বন্দেমাতরম্ সংগীত প্রথম 'আনন্দমঠে'র সঙ্গে প্রকাশিত হয়, ১২৮৭ সালের চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে। যদু ভট্ট যে আগে এতে সুর দিয়েছিলেন, সেটা রবীন্দ্রনাথের না জানারই কথা। তাই তিনি যদি বন্দেমাতরম্ প্রকাশিত হওয়ার পর ১২৮৮ সালের ২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে গানটি শুনিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর দিক থেকে ঠিকই বলেছেন। তবে দেবকণ্ঠবাবু নন।

এখানে ২৯শে আষাঢ় বললাম এই জন্য যে, ১২৮৮ সালের ৩রা শ্রাবণ (১৭-৭-১৮৮১)-এর 'সাধারণী' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে দেখছি, ঐ ২৯শে তারিখে চুঁচুড়াবাসীরা চুঁচুড়ায় একটি সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানিয়ে ছিলেন। সেই সভায় মল্লার রাগে বন্দেমাতরম্ গাওয়া হয়েছিল। কে বা কারা গেয়েছিলেন, তা জানা যাচ্ছে না। তবে ঐ সংবাদে উল্লেখ আছে যে, সেদিন সভায় একজন বিদেশিনী সহ ৭ জন সংগীত শিল্পী উপস্থিত ছিলেন।

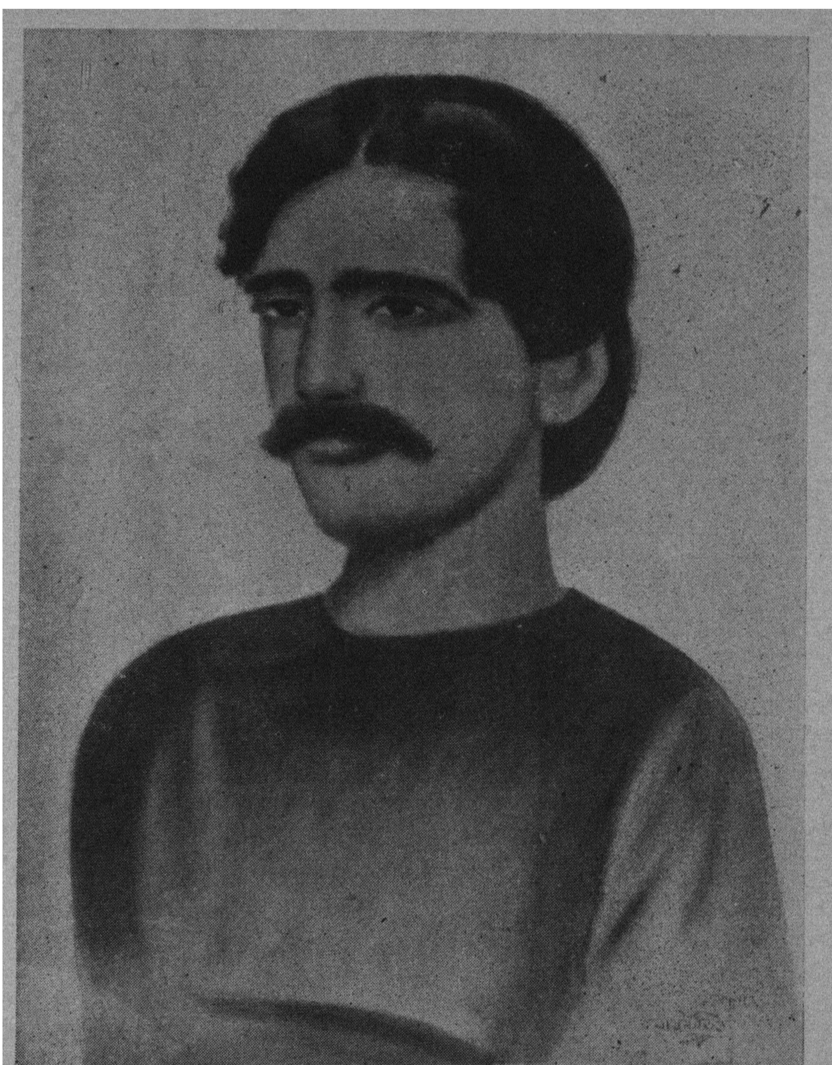
প্রুফ রিডারের অনবধানতায় বইয়ে দু একটা ছাপার ভুল থেকে গেছে। সেগুলো এতই নগণ্য যে পাঠক-পাঠিকারা পড়ার সময় নিজেরাই সহজে বুঝে নিতে পারবেন। তাই আর শুদ্ধিপত্র দিলাম না।

সব শেষে, এই গ্রন্থ রচনায় নানাভাবে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গোপালচন্দ্র রায়

নৈহাটী, ২৪ পরগণা — অধ্যক্ষ

১লা আষাঢ়, ১৩৮৮ — ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা



যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র

উপক্রমণিকা।

মহাভারতকে ইতিহাস বলে। ইতিহাসের লক্ষণ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।*

এই লক্ষণ সকল মহাভারতে আছে। মহাভারতকে প্রাচীন ঋষিগণ এত আদর করিতেন, যে তাহা পঞ্চম বেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। দ্বিজবর্ণ ভিন্ন শূদ্র, ও স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই। বেদে যাহা পাওয়া যায়, তাহার তুল্য উপদেশ ইহাতে মহাভারতে পাওয়া যায়। সুতরাং পঞ্চম বেদ বলায় অত্যুক্তি হয় না।

এ মহাভারত পঞ্চমবেদ প্রচারিত, তাহা

---

* ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের উপদেশ, এবং পূর্ব্ববৃত্ত কথা যাহাতে আছে তাহাকে ইতিহাস বলে।

মহাভারতে, [illegible] সকল লোকের অধিকার আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অজ্ঞাত অসম্পূর্ণ রচনা।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

২৪ পরগণা জেলায় কাঁটালপাড়া গ্রামের এক ধনী ও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন (১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ়) মঙ্গলবার রাত্রি ৯টা ৩ মিনিটের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম দুর্গা দেবী।

যাদবচন্দ্র ও দুর্গা দেবীর আরও তিন পুত্র এবং এক কন্যা ছিলেন। পুত্ররা হলেন যথাক্রমে—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। কন্যার নাম ছিল নন্দরাণী। নন্দরাণী বঙ্কিমচন্দ্রের বড় ছিলেন।

কাঁটালপাড়া আগে ছিল ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত। এখন ঐ জেলার বারাকপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর কাঁটালপাড়া পূর্বে ছিল একটি ছোট গ্রাম; বর্তমানে নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির একটি পল্লী। নৈহাটী পূর্ব রেলওয়ের একটি জংশন। কলকাতার শিয়ালদহ থেকে ২৪ মাইল উত্তরে এই নৈহাটী স্টেশন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ, হুগলী জেলার দেশমুখো * গ্রামের অধিবাসী রামজীবন চট্টোপাধ্যায় কাঁটালপাড়ার রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিয়ে করেন। রামজীবনের পুত্র রামহরি মাতামহের সম্পত্তি পেয়ে কাঁটালপাড়ায় বাস করতে থাকেন।

[* বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণের পুত্র শচীশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—দেশমুখো কোন্নগরের সন্নিকটে অবস্থিত।

শচীশবাবুর এ কথা ঠিক নয়। কোন্নগরে গিয়ে খোঁজ করে দেখেছি, সেখানে আশে পাশে কোথাও এ গ্রাম নেই। কোন্নগর থেকে ১৩।১৪ মাইল দূরে শিয়াখালার পাশেই আছে দেশমুখো। এই দেশমুখোয় গিয়েও দেখেছি, সেখানে যে চট্টোপাধ্যায়রা বাস করেন, তাঁদের মধ্যে প্রবীণরা বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদেরই বংশের।]

রামহরি চট্টোপাধ্যায় আর দেশমুখো়য় ফিরে গেলেন না। ফলে তাঁর পুত্র শিবনারায়ণ থেকে তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা কঁাটালপাড়ার অধিবাসী হলেন। শিবনারায়ণের তিন পুত্র—কাশীনাথ, যাদবচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র অত্যন্ত ধার্মিক ও পরোপকারী মানুষ ছিলেন। তিনি কর্মজীবনে প্রথমে ছিলেন নিমৃকির দারোগা বা সল্ট ইন্সপেকটর। পরে হন ডেপুটি কালেকটর। তিনি ফার্সী এবং ইংরাজি দুইই জানতেন।

শচীশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থের ১ম সংস্করণে লিখেছিলেন—'যাদবচন্দ্র ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তারিখে রিকেটস সাহেবের অনুগ্রহে ডেপুটি কালেকটরের পদ পাইয়াছিলেন। এতৎ পূর্বে তিনি নিমৃকির দারোগা ছিলেন।'

শচীশচন্দ্র তাঁর এই বইয়ের ৩য় সংস্করণে যাদবচন্দ্রের আত্ম-জীবনী বলে একটা ছোট্ট রচনা প্রকাশ করেন। ঐ 'আত্ম-জীবনী' তে দেখা যায়—যাদবচন্দ্র রিকেটস নয়, রিকেট সাহেবের সুপারিশেই ডেপুটি কালেকটরের চাকরি পেয়েছিলেন, তবে ১৮৪৩ এর নভেম্বরে নয় ১৮৩৮ এর জানুয়ারিতে। আর নিমকির দারোগাগিরির পর ডেপুটি কালেকটরের চাকরি পাওয়ার আগে ১৮৩৬ ও ১৮৩৭ এই দু বছর তিনি মেদিনীপুরের কালেকটারীতে খাজাঞ্চির কাজও করেছিলেন।

যাদবচন্দ্রকে প্রথমে সরকারী চাকরিতে লাগিয়ে ছিলেন তাঁর দাদা কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। কাশীনাথ তখন উড়িষ্যার জাজপুরে নিমকির দারোগা।

কথিত আছে, যাদবচন্দ্র একদিন বাড়িতে অশুচি বস্ত্রে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করলে তাঁর পিতা তাঁকে তিরস্কার করেন। এতে যাদবচন্দ্র অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে দাদার কাছে জাজপুরে যান। তখন যাদবচন্দ্রের বয়স প্রায় ষোল। জাজপুরে থাকার সময়েই কিছুকাল পরে কাশীনাথ যাদবচন্দ্রের চাকরি করে দিয়েছিলেন।

জাজপুরে থাকাকালে চাকরি লাভের আগে যাদবচন্দ্রের জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। একবার তিনি সেখানে ভয়ানক জ্বরে পড়েন। সেই জ্বরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল দেখে, মৃতদেহ দাহ করার জন্য বৈতরণী তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। মুখাগ্নির আগে এক সাধু এসে মৃত যাদবচন্দ্রকে বাঁচিয়ে তোলেন এবং পরে তাঁকে দীক্ষাও দেন।

যাদবচন্দ্রের এই পুনর্জীবন লাভের কাহিনীটি অনেকেই লিখেছেন। এ সম্পর্কে আমার 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বা চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থে ১২৫-৬ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ভাবে বলেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র (সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র) জ্যোতিশচন্দ্র পিতামহের জীবনের এই কাহিনীটি সম্বন্ধে লিখেছেন—'প্রাণশূন্য দেহে প্রাণকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। সে দেহ হইতে বহু পূর্বেই প্রাণ চলিয়া গিয়াছিল।'

জ্যোতিশচন্দ্রের পিতা সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর সম্পাদিত 'ভ্রমর' পত্রিকায় ১২৮১ সালের পৌষ ও ফাল্গুন এই দুই সংখ্যায় 'সৎকার' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে ছিলেন। এতে তিনি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন—মৃত ঘোষণা করে সেই সব মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করা, এমন কি সমাধিস্থ করা হলেও, আসলে তখনও ঐ মৃত বলে ঘোষিত ব্যক্তিদের প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু হয় নি। যে কোন কারণেই হোক, শরীর থেকে প্রাণবায়ু না বেরিয়ে কোনরূপে আবদ্ধ হয়ে ছিল। অথচ বাইরে থেকে মৃত্যুর সকল লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছিল। পরে ঐ দেহে আঘাত ও নাড়াচাড়া পেয়ে বা অন্য কোন কারণে সেই আবদ্ধ প্রাণবায়ু আবার চলাচল করতে থাকলে, ঐ ঘোষিত মৃতদেহই জীবিত হয়ে ওঠে।

আমার মনে হয়, যাদবচন্দ্রের ক্ষেত্রেও এইরূপ কোন একটা ব্যাপার ঘটেছিল। সাধু হয়ত সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। তা না হলে, বহু পূর্বে প্রাণ চলে গেলে, সেই প্রাণকে আবার ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব হয়েছিল?

সঞ্জীবচন্দ্রের 'ভ্রমর' পত্রিকা কোথাও পাওয়া না গেলে এ সম্পর্কে উৎসাহী পাঠক পাঠিকাদের আমার 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য' বইটি পড়ে দেখতে বলি। ঐ বইয়ে আমি সঞ্জীবচন্দ্রের 'সৎকার' প্রবন্ধের অনেকগুলি কাহিনী দিয়েছি।

যাদবচন্দ্রের পুনর্জীবন লাভের এই কাহিনীটি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেকেই লিখে গেছেন বলেই, এ নিয়ে এখানে আরও কয়েকটা কথা বললাম।

যাদবচন্দ্র দক্ষতা ও সুনামের সহিত সরকারী চাকরি করার ফলে তৎকালীন ইংরাজ সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়েছিলেন। রাঢ়ীয়

ব্রাহ্মণ সমাজে সমাজপতি হিসাবেও যাদবচন্দ্রের যথেষ্ট নাম ছিল। 'নায়ক'-সম্পাদক সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নায়কে' একবার লিখে ছিলেন—'আজকালকার শিক্ষিত বাবুসমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের নামই প্রকট। পরন্তু দক্ষিণ বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ সমাজে রায় বাহাদুর বলিলে, কেবল যাদব চাটুজ্যে মহাশয়কে বুঝাইত।'

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরও যাদবচন্দ্র দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি (১২৮৭ সালের ১৩ই মাঘ) ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সুস্থ শরীরের অধিকারী ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা দুর্গা দেবীও ধর্মপরায়ণা, গৃহকর্ম নিপুণা ও লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। জ্যোতিশচন্দ্র তাঁর পিতামহী সম্বন্ধে লিখেছেন—'যখন পিতামহী লাল কান্তা পেড়ে শাড়ী পরিয়া বাউটি ঝুলাইয়া, ফাঁদি নথ নাকে দিয়া গৃহিণীপনা করিতেন, তখন সত্যই তাঁহাকে লক্ষ্মী সদৃশা দেখাইত। ...পিতামহীর মুখে কিছু মাত্র অপবিত্রভাব দেখি নাই।'

দুর্গা দেবী ছিলেন সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের কন্যা। হুগলীতে বিদ্যাভূষণ মশায়ের এক বিরাট চতুষ্পাঠী ছিল।

যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গা দেবীর মৃত্যু হয়েছিল।

যাদবচন্দ্র নিজে যেমন ডেপুটি কালেকটর হন, তেমনি তাঁর চার পুত্রই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর হয়েছিলেন।

যাদবচন্দ্র একমাত্র কন্যা নন্দরাণীকে বাড়ির পাশেই জমি জায়গা দিয়ে সেখানে কন্যা ও জামাতার বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

ছাত্রজীবন

সেকালের প্রথা অনুযায়ী পাঁচ বছর বয়সে যথারীতি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। হাতে খড়ি দেন কুলপুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাপড়া শুরু হয় গ্রামের পাঠশালার গুরুমশায় রামপ্রাণ সরকারের কাছে। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠশালায় পড়তেন না। গুরুমশায় সকাল সন্ধ্যা দু বেলা বাড়িতে এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে পড়িয়ে যেতেন। বাড়িতে এই গুরুমশায়ের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও পড়তেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা' প্রবন্ধে লিখে-ছেন—'শুনিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র বাড়িতে গুরুমশায় রামপ্রাণ সরকারের কাছে ৮।১০ মাস মাত্র পড়েছিলেন। তারপর পিতা যাদবচন্দ্র তাঁর কর্মস্থল মেদিনীপুরে পরিবারবর্গ নিয়ে গেলে, সকলের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রও মেদিনীপুরে যান।

মেদিনীপুরে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে একটি স্কুলে ভর্তি হন। বালক বঙ্কিম-চন্দ্রও কিভাবে ঐ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে পূর্ণবাবু লিখেছেন—

'মেদিনীপুরে একটি হাই স্কুল ছিল। টিড নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেড মাষ্টার ছিলেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ঐ স্কুলে যাইতেন। একদিন ঐ সাহেব ক্লাস পরিদর্শনে আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের কথা বলিবার সময় তাঁহার যে এক বেলার মধ্যে বর্ণ পরিচয় হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ করেন।

টিড সাহেব শুনিয়া প্রীত হইলেন এবং পরে তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহা ঘটিল না।'—(বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা)

বঙ্কিমচন্দ্র তিন বৎসর ঐ স্কুলে পড়েন। তারপর তাঁর পিতা মেদিনীপুর থেকে বদলি হলে, পিতা পরিবারবর্গকে নিজের গ্রামের বাড়ি কাঁটালপাড়ায় নিয়ে আসেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবার বাড়িতে এসে কিছুদিন পরে কাঁটালপাড়ার অপর পারে অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম পারে হুগলী কলেজে ভর্তি হলেন।

পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—'মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের নূতন সেসন খুলিলে তথায় ভর্তি হইবেন স্থির হইল। তাঁহার জন্য গৃহে একজন প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইল।'

বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর থেকে এসে হুগলী কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা কবিতা শিখেছিলেন। পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—তাঁদের বড়দা শ্যামাচরণ বাড়িতে থাকলে সন্ধ্যার দিকে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর কাছে আসতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাছেই সংস্কৃত শ্লোক শিখেছিলেন। আর তাঁদের বাড়িতে তখন যে 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকা আসতো, তা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বাংলা কবিতা মুখস্থ করেছিলেন।

বালক বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই ঐ সব সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতেন।

বিখ্যাত পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণি একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার সঙ্গে দেখা করতে এসে, বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে 'পদাঙ্কদূতে'র একটা শ্লোকের আবৃত্তি এবং ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে সংস্কৃত শেখাবার জন্য যাদবচন্দ্রকে বলেছিলেন। কিন্তু যাদবচন্দ্র পণ্ডিত মশায়ের কথা না শুনে বঙ্কিমকে ইংরাজি স্কুলে ভর্তি করেছিলেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর এগার বছর চার মাস বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে ভর্তি হন। তখন এই কলেজ 'মহম্মদ মহসিনের কলেজ' নামেও পরিচিত ছিল।

২৩শে অক্টোবর ভর্তি হওয়ার কারণ, সে সময় স্কুল কলেজে শিক্ষাবর্ষ গণনা হত ১লা অক্টোবর থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সেপ্টেম্বর মাসেই ক্লাসের বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে যেত। তারপর 'মহালয়া' থেকে এক মাসেরও দুচার দিন বেশী পূজার ছুটি থাকত।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 'মহালয়া' ছিল ১৬ই সেপ্টেম্বর। ছুটির পর কলেজ খুললেই বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কলেজে ভর্তি হন, তখন সেখানে কলেজ বিভাগ ও স্কুল বিভাগ বলে দুটা ভাগ ছিল। স্কুল বিভাগকে আবার জুনিয়র ডিভিসন ও সিনিয়র ডিভিসন করে দুটা ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। স্কুলের এই জুনিয়র ডিভিসনে ছিল ৪টা শ্রেণী, আর সিনিয়র ডিভিসনে ছিল ৩টা শ্রেণী। কলেজ

বিভাগে পরে হয়ে ছিল ফার্স্ট ইয়ার, সেকেণ্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার ও ফোর্থ ইয়ার, এই চার বছরের ৪টা শ্রেণী।

বঙ্কিমচন্দ্র স্কুলের জুনিয়র ডিভিসনে সবার উপরের শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ছিলেন। তারপর প্রতি বছর কৃতিত্বের সহিত পাস করে সিনিয়র ডিভিসনের এক এক ক্লাসে ওঠেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন সিনিয়র ডিভিসনের উপরের ক্লাসে পড়েন, সেই বছর থেকে স্কুল-কলেজের শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তিত হয়ে ১লা মে থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ধার্য হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার আগে, বিভিন্ন স্কুল কলেজের মধ্যে, স্কুলের ছাত্ররা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা এবং কলেজ বিভাগের ছাত্ররা সিনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারত।

এই পরীক্ষা তখন এক এক স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে নেওয়া হত। যেমন— ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হুগলী কলেজে যে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাতে হুগলী কলেজ ও তার অধীনস্থ স্কুলসমূহ থেকে মোট ৭৩ জন পরীক্ষা দিয়ে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের স্কুল বিভাগ থেকে এই পরীক্ষা দিয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন এবং দু বছর মাসিক ৮ টাকা করে বৃত্তি লাভ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষার পর হুগলী কলেজের কলেজ বিভাগে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হন। ১৯৫৫র এপ্রিলে ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্রদের পরীক্ষায় বঙ্কিম সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

১৮৫৬র এপ্রিলে বঙ্কিম সিনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে মাসিক ২০ টাকা করে দু বছরের জন্য বৃত্তি লাভ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে পড়ার সময় অবসর সময়ে কাঁটালপাড়ার সংলগ্ন ভাটপাড়ার পণ্ডিত শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের কাছে কিছু দিন সংস্কৃত পড়েছিলেন।

সংস্কৃতের উপর ঝোঁক দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের মামা তাঁর পিতার সংগৃহীত বহু মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্কিমকে পড়বার জন্য উপহার দিয়েছিলেন।

হুগলী কলেজে পড়ার সময় বঙ্কিম বাড়িতে একটি সুন্দর ফুলের বাগান করেছিলেন। ফুল বাগানের সখ তাঁর জীবনে বরাবরই ছিল।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়েন সেই সময় ১২ই জুলাই তারিখে তিনি ঐ কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এসে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন সাধারণ বিভাগ ছাড়া আইন বিভাগ নতুন খোলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আইন পড়বার জন্যই হুগলী কলেজ ছেড়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে চলে আসেন। হুগলী কলেজে আইন বিভাগ ছিল না।

কাঁটালপাড়ার বাড়ি থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে যাতায়াতে অসুবিধা ছিল বলে, বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে সেখানে থেকে আইন পড়তে লাগলেন।

এই সময় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন, আগামী এপ্রিল মাসেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এই বলে তাঁরা এনট্রান্সের পরীক্ষার বিষয়গুলিও ঘোষণা করেন।

বঙ্কিম প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়তে পড়তেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। সেবার মোট ২৪৪ জন ছাত্র এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ১১৫ জন প্রথম বিভাগে এবং ৪৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তখন তৃতীয় বিভাগ ছিল না। সেবার পরীক্ষায় ২৫ থেকে ৪৯ নম্বর পর্যন্ত পেলে দ্বিতীয় বিভাগের পাস নম্বর এবং ৫০ থেকে তদূর্দ্ধে পেলে প্রথম বিভাগের নম্বর বলে গণ্য হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আরও যাঁরা প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাস করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন—উত্তরপাড়া স্কুল থেকে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ থেকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হিন্দু স্কুল থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আরও ঘোষণা করে যে, আগামী বৎসরে অর্থাৎ ১৮৫৮র এপ্রিলে প্রথম ডিগ্রি পরীক্ষা বা বি. এ. পরীক্ষা নেওয়া হবে। এই বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বি. এ. পরীক্ষার বিষয় সমূহও ঘোষণা করে জানিয়ে দেন।

পরীক্ষার ক'মাস আগে এই ঘোষণা করা হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের যে সব ছাত্র 'জেনারেল' বিভাগে পড়তো, কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী তাদের

পরীক্ষা দেওয়ার উপযোগী করবার জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে পড়াতে লাগলেন। বঙ্কিম প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগের ছাত্র থাকায় সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। তিনি তবুও উৎসাহী হয়ে নিজে পড়েই পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

মোট ১৩ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু সকলেই ফেল করেন। ফেল করার কারণ, বাংলার প্রশ্নপত্র ছাড়া প্রায় সকল প্রশ্নপত্রই অত্যন্ত কঠিন হয়েছিল। বিশেষ করে সিকস্থ পেপার অর্থাৎ 'মেণ্টাল এণ্ড মরাল সায়েন্সেস' পেপার যেমন ছিল অতি দীর্ঘ, তেমনি কঠিন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেষে সাত নম্বর গ্রেস দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু নামে অপর আর একজনকে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পাস বলে ঘোষণা করেছিলেন। এঁরা ছ'টা বিষয়ের মধ্যে পাঁচটায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে মাত্র একটা বিষয়ে ফেল করেছিলেন।

ফেল করার জন্য এঁদের যে-সাত নম্বর গ্রেস দেওয়া হয়েছিল, সেই সাত নম্বর যে বঙ্কিমই কম পেয়েছিলেন, সেটা নাও হতে পারে। যদুনাথ কম পেয়েছিলেন, এমনও হতে পারে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দু জনকে পাস করাবেন স্থির করেই ঐ সাত নম্বর গ্রেস দিয়েছিলেন।

এ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মিনিট বইয়ে লেখা আছে—'·· had passed creditably in five of six subjects and had failed by not more than seven marks in the sixth···'

এখানে in the sixth কথায় স্পষ্ট করে সিকস্থ পেপার না থাকলেও, সিকস্থ পেপার বোঝায় এমনও একটা অর্থ করা যেতে পারে।

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ এই পেপারেই ফেল করেছিলেন। এই সিকস্থ পেপারের প্রশ্নপত্র ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ ও কঠিন। পরীক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হয়তো এই সিকস্থ পেপারকে লক্ষ্য করেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন—

7. That the papers for the B. A, Examination should not contain so large a portion of difficult questions, as heretofore.

(Minutes for the year 1858. Page 32)

বঙ্কিম অল্প সময়ে এবং নিজে ঘরে পড়ে সকল ছাত্রের উপরে স্থান পেয়ে যে কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন, সেও কম নয়।

১৮৫৮র ১১ই ডিসেম্বর তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সভা হয়, তাতে ভাইস-চ্যান্সেলার বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করার পর প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসুকে সকলের সামনে উপস্থিত করেন। এর পরে এঁদের দুজনকে উপাধি দেওয়া হয়।

ভাইস চ্যান্সেলার Sir J. W. Colvile সেদিন তাঁর অভিভাষণে বি. এ. পরীক্ষা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

'···at the first and only examination for a degree in Arts that has yet been had, thirteen candidates presented themselves, but that two only, being the gentlemen on whom I shall have the happiness of conferring their degrees to-day attained the standard required; that after-wards, on a suggestion by some of the gentlemen concerned in the examination, to the effect that the standard was too high...'

(Minutes for the year 1858. Page 108)

১৮৫৮র ১১ই ডিসেম্বর (১২৬৫ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ) শনিবার তারিখের দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ সম্পর্কে তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

'আমরা আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি, শ্রীযুতবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুতবাবু যদুগোপাল বসুকে বি. এ. উপাধি প্রদানার্থ অদ্য দিন স্থির হইয়াছে। এই কার্য টৌনহালে অতি সমারোহপূর্বক নির্বাহ হইবেক। এজন্য কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সী কালেজ, হিন্দু কালেজ এবং সংস্কৃত কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্র, শিক্ষক এবং অন্যান্য কার্যালয়ের প্রধান প্রধান ইংরাজ ও এতদ্দেশস্থ কর্মচারি সকল তদ্দর্শনার্থ অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আরো অবগতি হইল যে, সাধারণ লোকের পরিচ্ছদের সহিত উক্ত উপাধি-ধারিদিগের সহিত বিশেষ প্রভেদ থাকিবেক। অর্থাৎ তাহাদের বেশের এরূপ বৈচিত্র থাকিবেক, যে, তাহাদিগকে দর্শনমাত্রই সর্বসাধারণ হইতে চিনিয়া লইতে পারা যাইবেক। অতএব এ বিষয়ে আমাদের যে কি পর্যন্ত আহ্লাদ ও উৎসাহ বর্দ্ধন হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। এমন সময়ে বাঙ্গালীদিগের গৌরব বর্দ্ধনার্থ রাজপুরুষদিগের যে এতদূর যত্ন হইয়াছে, ইহা অস্মদাদির পক্ষে অতিশয়

সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক, ইহাতে সুবিজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট এবং রাজপুরুষদিগকে আমাদের অগণ্য ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।'

ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর এই লেখায় যদুনাথ বসুর বদলে যদুগোপাল বসু লিখে সামান্য ভুল করেছিলেন। তিনি যে টৌনহাল লিখেছিলেন, এটা হ'ল কলকাতার বিখ্যাত টাউন হল।

এপ্রিল মাসে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় যথারীতি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়তে থাকেন। এই সময় যখন আইনের থার্ড ইয়ারের ছাত্র, তখন একটা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পেয়ে ৭ই আগষ্ট পর্যন্ত আইন পড়ে তিনি এই পড়া ছেড়ে দেন। অনেক পরে ঐ চাকরি করতে করতে আলিপুরে বদলি হয়ে এসে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ছুটি নিয়ে আইনের বাকি ক্লাস শেষ করে, ১৮৬৯ এর জানুয়ারিতে বি. এল. পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাঁদের লেখা সাহিত্য-সাধক চরিতমালার অন্তর্গত বঙ্কিম জীবনীতে লিখেছেন—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এনট্রানস পরীক্ষায় পরীক্ষার বিষয়গুলি ছিল—

English, Greek and Latin

Sanskrit, Bengali and Hindee ইত্যাদি।

এঁদের এই লেখা পড়লে মনে হবে, একজন পরীক্ষার্থীকে ঐ সব ক'টা ভাষাতেই পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কিন্তু মোটেই তা নয়। আসলে তাকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল ইংরাজি এবং অন্য যে কোন একটা ভাষায়।

এ সম্পর্কে তখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিষ্কার জানানো হয়েছিল—

Candidates for Entrance will be examined in the following subjects—

1. Languages

Two of the following languages of which English must be one, viz—

English, Greek, Latin, Arabic, Persian, Hebrew, Sanskrit, Bengali, Hindee, Urdu.

এনট্রান্স পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হিন্দু স্কুল থেকে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পাস করেছিলেন, ব্রজেনবাবুরা তাঁদের বইয়ে একথা লিখেও ভুল করেছেন। গণেন্দ্রনাথ নয় গুণেন্দ্রনাথ। ইনি ছিলেন গণেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এঁরা উভয়েই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের পুত্র।

১৩৬১ সালের ৭ই ফাল্গুন সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের লেখক ভবতোষ দত্তও তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্র জীবন' প্রবন্ধে ১৮৫৮র বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম দু পেপারে পাঠ্য ছিল—ইংরাজি-গ্রীক-লাটিন এবং সংস্কৃত-বাংলা-হিন্দী-উড়িয়া লিখে ভুল করেছেন। কারণ, সেবার বি. এ, তে প্রথম দু পেপার ভাষা পরীক্ষার মধ্যে প্রথমটি ছিল ইংরাজি, অপরটি ছিল ঐ গ্রীক প্রভৃতি ঘোষিত ভাষাগুলির মধ্যে একটি। সেবার বি, এ, পরীক্ষায় থার্ড পেপার হিস্ট্রীর জায়গায় 'ইতিহাস-ভূগোল' এবং ফিফ্‌থ পেপার ফিজিক্যাল সাইএন্‌সেস (যার মধ্যে ছিল কেমিষ্ট্রি, এনিম্যাল ফিজিওলজি ও ফিজিক্যাল জিওগ্রাফী) এর জায়গায় 'প্রাকৃতিক ইতিহাস-পদার্থ বিজ্ঞান' লিখেও ভবতোষ-বাবু ভুল করেছেন। ইনি না জেনে, ব্রজেনবাবুদের বইয়ে লেখা 'ন্যাচুরাল হিস্ট্রী ও ফিজিক্যাল সাইএন্‌সেস' এই ভুলটারই বাংলা করার চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে এই বইয়ের সংযোজনে 'বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ভুল কথা' প্রবন্ধেও আমি কিছু বলেছি।

বাল্য ও কৈশোরের কয়েকটি ঘটনা

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা' নামে দুটি প্রবন্ধ লিখে গেছেন। ঐ প্রবন্ধ দুটি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরের কিছু কাহিনী জানা যায়। পূর্ণবাবুর ঐ লেখা থেকেই এখানে ক'টি কাহিনী বলছি—

মেদিনীপুরে টিড সাহেবের আগ্রহে যে স্কুলে বঙ্কিমচন্দ্র ভর্তি হয়েছিলেন, সেই স্কুল ছিল বঙ্কিমচন্দ্রদের বাসার একেবারে নিকটেই। ঐ স্কুল বাড়িতেই টিড সাহেব সপরিবারে বাসও করতেন।

টিড সাহেবের বিবি বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে স্নেহ করতেন এবং প্রতিদিন বিকালে তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বিকালে সেখানে বেড়াতে যেতেন।

ঐ সময় মলেট নামে এক সাহেব মেদিনীপুরের জেলা শাসক ছিলেন।

টিড সাহেবের স্ত্রী তাঁর ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকেও নিয়ে অদূরেই মলেট সাহেবের বাসায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে যেতেন।

এইভাবে প্রায় তিন বছর বালক বঙ্কিমচন্দ্র ঐ দুই সাহেব বাড়িতে বিকালে বেড়াতে যেতেন। কিন্তু এক দিনের একটা ঘটনায় বঙ্কিমচন্দ্র মলেট সাহেবের বাড়ি যাওয়া একেবারে ছেড়ে দেন। সে ঘটনাটা এই—

সেদিন মলেট সাহেবের কুঠির মাঠে টি পার্টির জন্য চেয়ার টেবিল পড়েছে। মেম সাহেবরা চা প্রস্তুত নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় মলেট সাহেবের কুঠি থেকে এক অপরিচিত সাহেব বেরিয়ে মলেটের এবং টিড সাহেবের ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে চা খেতে গেলেন। সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ মলেট সাহেবের বাসা থেকে নিজেদের বাসায় ফিরে এলেন। এর পর থেকে তিনি টিড সাহেবের বাড়িতে গেলেও মলেট সাহেবের বাড়িতে আর কোন দিনই যান নি। এমন কি টিড সাহেবের স্ত্রী বিশেষ করে বলা সত্ত্বেও।

এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, অতি শৈশবেও বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল।

পূর্ণবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যের সময়কার কথায় লিখেছেন—'সেকালে পশ্চিমাঞ্চল হইতে গোরারা কুচ করিয়া কলিকাতায় আসিত। যেস্থানে সূর্যোদয় হইত, সেই স্থানে ঐ সকল গোরা প্রাতঃক্রিয়ার জন্য ডাঙায় উঠিত এবং গ্রামে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকারে উৎপাত করিত। দুই তিন বৎসর পূর্বে একবার গ্রামে নামিয়া ঐরূপ অত্যাচার করিয়াছিল। সেই অবধি গোরার বহর শুনিলে আমাদের গ্রামের লোকের হৃৎকম্প হইত।'

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালে আর একবার ঐরূপ গোরা সৈন্যের বহর তাঁদের কাঁটালপাড়া গ্রামে নেমেছিল। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স বছর দশেক।

কাঁটালপাড়া গঙ্গার তীরেই অবস্থিত। তাই গোরা সৈন্যরা নৌকা থেকে নেমেই একেবারে কাঁটালপাড়া গ্রামে যায়।

সেদিন সকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের বাড়ির দক্ষিণে সদর রাস্তার ধারে তাঁদেরই যে আটচালায় গ্রামের পাঠশালা বসতো, সেই পাঠশালায় গিয়ে গুরুমশায়ের বেতটা হাতে নিয়ে পাঠশালার একটা ছাত্রের কাছে বসে তার পড়া শুনছিলেন।

আগে বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্র পাঠশালায় পড়তেন না। এই পাঠশালারই গুরু-মশায় রামপ্রাণ সরকার বাড়িতে গিয়ে বঙ্কিমকে দু বেলা পড়িয়ে আসতেন। বঙ্কিম অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বলে গুরুমশায় তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন এবং বঙ্কিম পাঠশালায় এলে গুরুমশায় নিজেই বঙ্কিমকে ছাত্রদের পড়া দেখতে বলতেন।

বঙ্কিম পাঠশালায় ছাত্রটির কাছে বসে তার পড়া শুনছিলেন, এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন, পাশের রাস্তা দিয়ে লোকজন 'গোরা পল্টন নেমেছে' বলতে বলতে উর্দ্ধশ্বাসে গ্রামের আরও ভিতরের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

'গোরা' কথা শোনামাত্রই পাঠশালার ছাত্ররা এবং গুরুমশায় নিজেও পাঠ-শালা ছেড়ে দৌড়লেন। বালক বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু দৌড়লেন না। স্থিরভাবে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি মাথায় এক বাজরা বেগুন নিয়ে নৈহাটীর বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু গোরার কথা শুনে তাঁদের ঠাকুর বাড়ির দরজার কাছে বাজরা ফেলেই ছুটে পালাল।

দেখতে দেখতে রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। পাড়ায় লোকজনের বাড়ির বাইরের দরজাও বন্ধ হ'ল।

বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত দেখেশুনে একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি গুরুমশায়ের

সেই বেতটি হাতে নিয়ে নিকটেই রাস্তার ধারে তাঁদের সদর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা সেই সময় তাঁর কর্মস্থলে বিদেশে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ দুই দাদাও তখন তাঁর পিতার কাছে ছিলেন।

বাড়িতে বয়োজ্যেষ্ঠ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বঙ্কিমকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে বাইরের সদর দরজা বন্ধ করে দিতে চাইলেন। বঙ্কিম কিন্তু কিছুতেই বাড়ির ভিতরে গেলেন না এবং দরজাও বন্ধ করতে দিলেন না। বললেন—ভয় কিসের? দেখাই যাক্ না গোরারা কি করে!—এই বলে তিনি সেই বেত হাতে নিয়ে দরজায় নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা, যাঁরা বঙ্কিমকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, অগত্যা তাঁরাও বঙ্কিমের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটু পরেই দেখা গেল, একদল গোরা বঙ্কিমচন্দ্রদের সদর দরজার দিকেই আসছে। তারা এসে বঙ্কিমের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কি কথা বললো। একজন বঙ্কিমের হাত থেকে বেতটা নিয়ে দেখলো। তারপর তারা গ্রামের ভিতর দিকে চলে গেল। এরপর আরও কয়েক জন গোরা এল এবং গ্রামের ভিতরে গেল।

বালক বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত দেখলেন এবং নির্ভয়ে সেখানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে গোরারা ফিরে তাদের নৌকায় গিয়ে উঠলো এবং নৌকাও কলকাতার পথে গেল।

গোরারা চলে গেলে গ্রামের লোকজন আবার পথে বেরুল এবং গ্রামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে এল।

গ্রামবাসীরা পরে বালক বঙ্কিমচন্দ্রের ঐরূপ সাহসের কথা লোকমুখে শুনে তাঁর প্রশংসা করে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ছিলেন ডেপুটি কালেকটর, জ্যাঠামশায় ছিলেন সল্ট ইন্‌সপেকটর বা নিমকির দারোগা, আর পিতামহেরও ছিল প্রচুর বিষয় সম্পত্তি। তাই বঙ্কিমচন্দ্রদের আর্থিক অবস্থা প্রথম থেকেই খুব ভাল ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন দশ এগার বছর। সেই সময় একদিন তাঁদের

বাড়ির সকলে জানতে পারলেন, কোন এক ডাকাতের দল তাঁদের বাড়িতে ডাকাতি করবে স্থির করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা তখন বাড়িতে ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁর কর্মস্থলে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যাঠামশায়, খুড়ামশায় ও পিসেমশায় বাড়িতে ছিলেন। তাঁরা ঐ কথা শুনে স্থির করলেন—বাড়ির মেয়েরা এবং ছোট ছেলেপুলেরা রাত্রে আহারের পর প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে থাকবে। সকাল হলেই আবার বাড়িতে চলে আসবে। এইভাবে দিন কয়েক কাটাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা শুনে বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন—না, কেউ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না। সকলে বাড়িতেই থাকবে।

বঙ্কিমের কথা শুনে তাঁর পিসেমশায় বললেন—কেউ যাবে না, তবে ডাকাত এসে সকলকে কেটে রেখে যাক।

বঙ্কিম পিসেমশায়কে বললেন—কেন কেটে রেখে যাবে! আমাদের বাড়িতে তো এত লোকজন। তার উপর আপনারা বাড়িতে কয়েক রাত্রির জন্য পাহারা দিতে গ্রামের ও আশেপাশের গ্রামের লাঠিয়ালদের নিযুক্ত করুন। দেখা যাক্ কি করে ডাকাত আসে!

বঙ্কিমের অগ্রজ দুই দাদা শ্যামাচরণ এবং সঞ্জীবচন্দ্রও এই মতে মত দিলেন। ফলে বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিরা এঁদের কথা মেনে নিয়ে বাড়িতে পাহারা দিতে কয়েক রাত্রির জন্য লাঠিয়াল নিযুক্ত করলেন।

সেই সময় সত্যই এক রাত্রে এক ডাকাতের দল ডাকাতি করতে এসেছিল বটে, কিন্তু তারা পাহারাদার দুর্দ্ধর্ষ লাঠিয়ালদের লাঠির আঘাত খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

বাড়িতে ডাকাতির কথায় এবং গ্রামে গোরা সৈন্য নামার কাহিনীটিতে পূর্ণবাবু বালক বঙ্কিমচন্দ্রের অসীম সাহসের কথা বললেও, তিনি কিন্তু এও লিখেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাঁড়-গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই দিয়া ছাদে উঠিতে পারিতেন না। সাঁতার জানিতেন না।'

ষাঁড় গরু দেখে দূরে সরে থাকা বা মই দিয়ে ছাদে ওঠায় অক্ষম হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র গ্রামের ছেলে হয়ে সাঁতার জানতেন না, পূর্ণবাবুর এই কথাটায় একটু সন্দেহ হচ্ছে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় সাত বছর গঙ্গা পার হয়ে কাঁটালপাড়ার অপর পারে

হুগলীতে পড়তে যেতেন। এখানকার গঙ্গা বেশ প্রশস্ত এবং গভীরও। আর বর্ষার সময় এই গঙ্গা যে কী ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে সে তো সকলেরই জানা। তাছাড়া সময়ে অসময়ে ঝড় তুফানের দাপটও কম নয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিচক্ষণ পিতা পুত্রকে সাঁতার না শিখিয়ে ঐরূপ জলপথে স্কুলে পাঠাতেন, এ কি বিশ্বাস হয়?

বঙ্কিমচন্দ্রদের বাস্তুভিটাতেই বাড়ির একেবারে সংলগ্ন বেশ বড় যে দুটি পুকুর ছিল, তার একটি আজও আছে। তখন কাঁটালপাড়ায় কলের জল ছিল না। সকলে পুকুরের জলেই স্নান করতো। তাই গ্রামের অপর ছেলেদের মত বঙ্কিমচন্দ্রও বাড়ির পুকুরে ছেলেবেলায় সাঁতার কাটা শিখে ছিলেন বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে ১৩১৮ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতী'তে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বঙ্কিমযুগের কথা'র কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। হেমেন্দ্রবাবু লিখেছেন—'পূর্ণবাবুর মুখে তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) সাহসিকতার যে সকল কাহিনী শুনিয়াছি, এখানে তাহার দু একটি বলিলাম।'

এই বলে সুন্দরবনে 'পরস' নামক নদীতে পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের একবার সাঁতারের এবং বাল্যে হুগলী কলেজে অধ্যয়ন কালে বঙ্কিমচন্দ্রের গঙ্গায় একবার সাঁতারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

এই হেমেন্দ্রবাবুই দু মাস পরে আবার ঐ 'ভারতী'তেই লেখেন—বঙ্কিমচন্দ্র সাঁতার জানতেন লিখে ভুল করেছি।

ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের গঙ্গায় সাঁতারের প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রবাবু প্রথমে লিখে ছিলেন—

'বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কলেজে পড়িতেন, সেই সময়ে তাঁহার একখানি ছোট ডিঙ্গি ছিল। যখন কলেজে থাকিতেন, ডিঙ্গি তখন তটরোপিত একটি দণ্ডে বাঁধা থাকিত, ডিঙ্গিখানি তাঁহার বড় আদরের ছিল।

একদিন নদীবক্ষ চঞ্চল। স্রোত বড় প্রখর—তুফান জাগিয়াছে। হঠাৎ এক দুষ্ট বালক, ডিঙ্গির বন্ধন রজ্জু কাটিয়া দিল। এই বালকের সহিত বঙ্কিমের ততটা হৃদ্যতা ছিল না। অতএব সে সুযোগ বুঝিয়া শত্রুতা সাধন করিল। সে ভাবিয়া ছিল, এই প্রকার স্রোতে ডিঙ্গি একবার ভাসিলে আর তাহাকে ফেরানো যাইবে না। হইলও তাই! স্রোতের মুখে ডিঙ্গি কার্মুকমুক্ত শরের মত ছুটিয়া

চলিল। এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। বঙ্কিমও তখন বালক—বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ। এত সাধের ডিঙ্গি ভাসিয়া যায় দেখিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র তখনই জলে লাফাইয়া পড়িলেন। চারিদিক হইতে সকলে হাঁ-হাঁ কর কি, কর কি বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু কার কথা বা কে শোনে! বঙ্কিমচন্দ্র ফিরিলেন না। ডিঙ্গিও ভাসিল, তিনিও ভাসিলেন। তটস্থ ভীতি-ব্যাকুল জনসংঘ ভাবিল—ডিঙ্গিও গেল, বঙ্কিমও গেলেন। কিন্তু না, জলে ডুবিবার জন্য বঙ্কিম পৃথিবীতে আসেন নাই। সেই গর্জনমুখর তরঙ্গদলের অনাহত আলিঙ্গন ছাড়াইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র ডিঙ্গি ধরিলেন এবং নিরাপদে অন্য এক স্থলে গিয়া তীরে উঠিলেন।'—ভারতী, পৌষ ১৩১৮।

এই প্রসঙ্গেই পরে হেমেন্দ্রবাবু লেখেন—'আমি লিখিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবু সাঁতার জানিতেন। একবার ডিঙ্গি ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।··· পরে জানিয়াছি, কথাগুলি ঠিক নয়, সংশোধিত পাঠ এইরূপ হইবে—

·· গঙ্গাবক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন শত্রু বালক যখন তাঁহার ডিঙ্গির কাছি কাটিয়া দিয়াছিল, তিনি তখন ডিঙ্গিতেই নির্ভয়ে বসিয়াছিলেন। ভয় পান নাই এইজন্য, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, চারিদিকে এত নৌকা থাকিতে ডুবিয়া মরিবার ভয় নাই। শেষটা তাই দাঁড়াইয়া ছিল।' —ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৮

হেমেন্দ্রবাবুর এই দুটা লেখার কোনটাই ঠিক নয়, বলেই মনে হয়। কারণ, তিনি তাঁর লেখায় একবারও ডিঙ্গির মাঝির কথা বলেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে ডিঙ্গিতে করে হুগলী কলেজে পড়তে যেতেন, এ সম্পর্কে কাঁটালপাড়ায় অবস্থিত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরদের কাছ থেকে আমি যা জেনেছি, তা এই—

বঙ্কিমচন্দ্রদের বাড়ির দক্ষিণে সংলগ্ন আম কাঁটালের বাগানের পাশেই ছিল মুক্তপুরের খাল। বাগানের জায়গায় পরবর্তীকালে রেলপথ বসলেও ঐ খাল সংকীর্ণ অবস্থায় আজও রয়েছে। এই খাল ধরে তিন চার শ হাত পশ্চিমে গেলেই গঙ্গা। গঙ্গা পার হয়ে চুঁচুড়ায় নদী তীর থেকে হাঁটাপথে অন্তত ১০ মিনিট গেলে হুগলী কলেজ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের বাগানের পাশে মুক্তপুরের খালে ডিঙ্গিতে চেপে স্কুলে যেতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা পুত্রদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য একটি ডিঙ্গি বা ছোট

নৌকা কিনেছিলেন এবং ডিঙি চালাবার জন্য মাইনে দিয়ে নৈহাটীর একজন দক্ষ মাঝিও রেখেছিলেন।

স্কুল বসার আগে মাঝি বঙ্কিমচন্দ্রদের নিয়ে ওপারে পৌঁছে দিয়ে ডিঙি নিয়ে চলে আসত। স্কুলের ছুটির আগে আবার নৌকা নিয়ে ওপারে যেতো বঙ্কিমচন্দ্রদের আনবার জন্য।

অতএব হেমেন্দ্রবাবু যে লিখেছেন—বালক বঙ্কিমচন্দ্র যখন কলেজে থাকতেন. তখন তাঁর ডিঙি 'তটরোপিত একটি দণ্ডে বাঁধা' থাকত, (অথচ মাঝি থাকত না,) এবং শত্রু বালক ডিঙির কাছি কেটে দিলে বঙ্কিম ডিঙিতেই বসে ভেসে যেতে লাগলেন, (অথচ ডিঙির মাঝি কোথাও রইল না,) এ কথা আদৌ ঠিক নয়।

চাকরি

বি. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হ'লে বাংলার তৎকালীন ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেকে পাঠান এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে একটি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি দিতে চান।

সেই সময় ইংরাজ রাজত্বে ভারতীয়দের পক্ষে ঐ চাকরি বেশ উচ্চপদের ও খুবই সম্মানের ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তবুও ঐ চাকরির লোভ সংবরণ করেই সেদিন ছোটলাটকে বলেছিলেন—আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করে পরে আপনাকে জানাব।

নিজের ইচ্ছা না থাকলেও, শেষ পর্যন্ত পিতার আদেশেই বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি নিয়েছিলেন।

বি. এ. পরীক্ষার পর বঙ্কিমচন্দ্র তখনও প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়-ছিলেন। চাকরি করার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। সম্ভবত তিনি স্থির করে ছিলেন, আইন পাস করে আইন ব্যবসা করবেন, নয়ত জজিয়তি করবেন। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা তাঁর একটা চিঠির কিছু এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন—রমেশ মিত্র হাইকোর্টের জজ, আর আমি মালদহের ক্ষুদ্র চাকরিজীবি।

নিজের চাকরি-জীবন সম্বন্ধে পরে এক সময় সাহিত্যিক শ্রীশ মজুমদারের কাছেও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—চাকরি আমার জীবনের অভিশাপ।

বঙ্কিমচন্দ্র চাকরি নিয়ে যতদিন ঐ সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সহিত কাজ করে গেছেন। তবুও এই সরকারী চাকরির প্রতি তাঁর যে একটা বেশ অশ্রদ্ধার ভাব ছিল, সে কথা জানা যায়, পরে নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রনাথ বসু, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে চাকরি সংক্রান্ত তাঁর কথাবার্তার মাধ্যমে।

যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সরকারী চাকরি-জীবনের একটা ইতিহাস অর্থাৎ কবে কবে কোথায় কোথায় তিনি চাকরি করেছিলেন, তার একটা বিবরণ দেবার চেষ্টা করছি—

কলকাতায় মহাকরণের গ্রন্থাগারে বাংলা সরকারের গেজেটেড অফিসার-

দের চাকরির ইতিহাসের বই আছে। ১৮৮৯ ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের এইরূপ দুটি বই দেখেছি। ১৮৮৯ এর বইটি খুললেই দেখা যায়, প্রথম পাতায় আছে—

History of Services

of

Gazetted officers employed under the

Government of Bengal.

(Corrected upto 1st July 1889)

Compiled in the Office of the Chief

Secretary to the Government of Bengal.

and

Published by Authority

Calcutta

Printed at the Bengal Secretarial Press

1889

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের বইটির এই ধরণের প্রথম পাতাটি নষ্ট হয়ে গেছে। থাকলে দেখা যেত, এতেও ঐ ১৮৮৯ এর বইটির মতই লেখা আছে, কেবল বদল হয়েছে corrected upto 1st July 1890 এবং শেষে 1890.

এই দুটি বইয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির যে বিস্তৃত ইতিহাস আছে, তা হুবহু একই। কেবল শেষের বইটিতে সব শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরিতে একটা ছুটি নেওয়ার কথা অতিরিক্ত আছে। এই বইয়েরই ভিতরে গেজেটেড অফিসার-দের চাকরির ইতিহাস দেওয়ার ঠিক আগে বলা হয়েছে—

History of Services of officers in the First three grades of the Sub-ordinate Executive Service. From 1st appointment to 1st July 1890.

১৮৯০ এর অনেক আগেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরিতে ফার্স্ট গ্রেড বা প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন। আর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তাই এই ১৮৯০ এর বইটি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির একেবারে প্রায় শেষ সময় পর্যন্তরই ইতিহাস পাওয়া যায়। এই বই থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সরকারী চাকরির ইতিহাসটা এখানে দিচ্ছি—

চাকরি	চাকরির স্থান	নিয়োগের তারিখ
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর	যশোহর	২৩ আগষ্ট ১৮৫৮
ঐ	নেগুয়া	২১ জানুয়ারি ১৮৬০
ঐ (পঞ্চম শ্রেণী)	ঐ	৭ নভেম্বর ১৮৬০
ঐ	খুলনা	৯ নভেম্বর ১৮৬০
(ব্যক্তিগত কাজে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ থেকে ১৫ দিন ছুটি)		
ঐ (চতুর্থ শ্রেণী)	ঐ	১৩ জানুয়ারি ১৮৬৩
ঐ	বারুইপুর	৫ মার্চ ১৮৬৪
ঐ	ডায়মণ্ডহারবার (অস্থায়ী)	২৪ অক্টোবর ১৮৬৪
ঐ (তৃতীয় শ্রেণী)	বারুইপুর	৫ মার্চ ১৮৬৬
(অসুস্থতাবশত ১৬ জুন ১৮৬৬ থেকে ৬ সপ্তাহের ছুটি)		
গবর্ণমেণ্ট আমলাদের বেতন নির্ধারণের জন্য	কমিশনের কাজ	২ জুন ১৮৬৭
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর	আলিপুর (অস্থায়ী)	১৪ আগষ্ট ১৮৬৭
(ব্যক্তিগত কাজে ৪ জুন ১৮৬৮ থেকে ৬ মাস ছুটি)		
ঐ	মুর্শিদাবাদ	২৯ নভেম্বর ১৮৬৯
ঐ (দ্বিতীয় শ্রেণী)	ঐ	২৫ নভেম্বর ১৮৭০
বহরমপুরস্থ রাজসাহী বিভাগের কমিশনারের পার্শন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট (অস্থায়ী)		১৫ এপ্রিল ১৮৭১
(অসুস্থতাবশত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মে ১৮৭৪ পর্যন্ত ছুটি)		
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর	বারাসত	২৯ এপ্রিল ১৮৭৪
ডেপুটি কালেকটর রোড সেসের দায়িত্বে	মালদহ	৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪
(অসুস্থতাবশত ২২ জুন ১৮৭৫ থেকে ২০ মার্চ ১৮৭৬ পর্যন্ত ছুটি)		
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর	হুগলী	১৩ মার্চ ১৮৭৬

হুগলীস্থ বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের পার্শন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট (অস্থায়ী) — ৭ নভেম্বর ১৮৮০

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর, ঐ সঙ্গে বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের পার্শন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্টের কাজও — হাওড়া — ৬ জানুয়ারি ১৮৮১

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী (অস্থায়ী) — কলকাতা — ১৬ আগষ্ট ১৮৮১

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর — আলিপুর (অস্থায়ী) (২৪ পরগণা) — ২৩ জানুয়ারি ১৮৮২

ঐ — বারাসত (অস্থায়ী) — ২৯ এপ্রিল ১৮৮২

ঐ — জাজপুর (অস্থায়ী) (কটক) — ২৬ জুলাই ১৮৮২

ঐ — হাওড়া — ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩

(প্রিভিলেজ লীভ ২০ নভেম্বর ১৮৮৩ থেকে ১৩ দিন)

ঐ (প্রথম শ্রেণী) — ঐ — ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৪

(প্রিভিলেজ লীভ ১০ মার্চ ১৮৮৫ থেকে ৩ মাস)

ঐ — ঝিনাইদহ (যশোহর) — ২৫ জুন ১৮৮৫

(অসুস্থতাবশত ৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫ থেকে ৩ মাস ছুটি)

ঐ — ভদ্রক (অস্থায়ী) (বালেশ্বর) — ১২ মে ১৮৮৬

ঐ — হাওড়া — ৫ জুন ১৮৮৬

(অসুস্থতাবশত ১৮ নভেম্বর ১৮৮৬ থেকে ১৪ দিন ছুটি,
ঐ সঙ্গে ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নভেম্বর ১৮৮৬ থেকে ৬ মাস ছুটি)

ঐ — মেদিনীপুর — ১০ মে ১৮৮৭

(২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ থেকে ৬ মাস এক্সট্রা অর্ডিনারী ছুটি। ছুটির শেষ দিক বাতিল করে কাজে যোগদান।)

ঐ — আলিপুর (২৪ পরগণা) — ১০ এপ্রিল ১৮৮৮

(প্রিভিলেজ লীভ ৩১ মার্চ ১৮৯০ থেকে ১৫ দিন, ঐ সঙ্গে
আরও ১ মাস ১ দিন)

এই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের চাকরির ইতিহাস বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ থেকে অবসর নেওয়ার কথা নেই। তাঁর নিজের লেখা চিঠি ইত্যাদি থেকে জানা যায়, তিনি ১৮৯১ এর ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে কাজ থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

এই তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর থেকে অস্থায়ীভাবে ডায়মণ্ডহারবারে গিয়েছিলেন আছে। কিন্তু কবে আবার যে বারুইপুরে ফিরে এসেছিলেন, সে কথা নেই। বারুইপুরের রেজিষ্ট্রি অফিসের হেড ক্লার্ক কালীনাথ দত্তর এক স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, সে বছর ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে প্রবল বন্যা হওয়ায়, বন্যায় সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ কার্যের জন্যই কর্তৃপক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রকে ডায়মণ্ডহারবারে পাঠিয়ে ছিলেন। ত্রাণকার্য শেষ হলে কয়েক মাস পরে, সম্ভবত তিন চার মাস পরে আবার তিনি বারুইপুরে ফিরে এসেছিলেন। এখানে থাকাকালেই তিনি তাঁর চাকরির তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সরকারী চাকরির যে বিবরণ এখানে দেওয়া গেল, এতে ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির নিয়োগের তারিখের সঙ্গে দু একটা ক্ষেত্রে একটু অমিল দেখা যায়। যেমন—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত ক্যালকাটা গেজেটে আছে—বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটরের চাকরি পান ঐ ১৮৫৮র ৬ই আগষ্ট। অথচ গবর্ণমেণ্টের ১৮৯০ এর চাকরির ইতিহাস বইয়ে আমরা দেখলাম—২৩শে আগষ্ট।

এ সম্বন্ধে আমার মনে হয়, ক্যালকাটা গেজেটে ৬ই বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি পাওয়ার কথা ঘোষিত হলেও তিনি ২৩শে তারিখে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে এখনকার মত যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। তাই তখন গেজেটে ঘোষণার পর থেকে কাজে যোগ দেওয়ার তারিখের মধ্যে প্রায়ই ১০।১৫ দিনের ব্যবধান থাকত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট তারিখে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শচীশচন্দ্র তাঁর কাকা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এই কথা শুনেও লিখে থাকতে পারেন।

চাকরির ইতিহাস বইয়ে ও ক্যালকাটা গেজেটে—এইরূপ আর একটা অমিল—

উড়িষ্যার জাজপুর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের হাওড়ায় বদলি হওয়ার তারিখ সম্বন্ধে ১৮৮৯ ও ১৮৯০এর চাকরির ইতিহাস বইয়ে আছে—৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩। কিন্তু ১৪-২-৮৩ তারিখের ক্যালকাটা গেজেটে আছে—১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।

এখানে ক্যালকাটা গেজেটের তারিখটাকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাজে যোগদানের তারিখ বলে অনুমান করা যেতে পারে।

এইরূপ কয়েকটা ক্ষেত্রে তারিখের সামান্য ইতর বিশেষ দেখা গেলেও ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগের তারিখে ও ১৮ ০ এর চাকরির ইতিহাস বইয়ে বর্ণিত তারিখে অন্য সর্বত্রই এক।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর দপ্তর থেকে সংকলিত গেজেটেড অফিসারদের ঐ চাকরির ইতিহাস বই যে একেবারে নির্ভুল, একথা অবশ্য সংকলকরা জোর করে বলেন নি। বরং বইয়ের প্রথমে বাঁদিকে একটা পাতার মাঝখানে বড় বড় অক্ষরে তাঁরা লিখে দিয়েছিলেন—

Notice

It is requested that all errors and omissions discovered in the History of Services may be promptly brought to the notice of the Chief Secretary to the Government of Bengal with a view to their being corrected in the next edition.

গেজেটে এবং চাকরির ইতিহাস বইয়ে সামান্য ইতর বিশেষ সত্ত্বেও গেজেটেড অফিসারদের চাকরির ইতিহাস নির্ধারণে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর দপ্তর থেকে প্রকাশিত ঐ বইই বেশী সহায়ক এবং নির্ভরযোগ্যও।

গেজেটেড অফিসারদের চাকরির ইতিহাসের ঐ বই, ১৮৯০ এর পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯১ থেকে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর দপ্তরের বদলে একাউন-টেণ্ট জেনারেল বেঙ্গলের অফিস থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ এর বইয়ের নাম এবং সংকলক ও মুদ্রাকর প্রভৃতি সম্বন্ধে বইয়ের প্রথমেই এইরূপ ছাপা হয়েছিল—

History of Services of Officers holding Gazetted appointments under the Government of Bengal.
Corrected to 1st July 1891.

Compiled in the office of the Accountant General, Bengal

Calcutta
Office of the Superintendent of Government Printing, India
1891

একাউনটেণ্ট জেনারেলের অফিস থেকে সংকলিত এই ১৮৯১ এর বইয়ে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস নেই। আছে মাত্র—১৮৫৮ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত।

এই বইয়ে আবার আছে –Bankim Chunder Chatterji B. L.—Joined the Service, 7th August 1858. এতে বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি জীবনের যে সামান্য কয়েক বছরের ইতিহাস বা বিবরণ আছে, তার সব শেষে লেখা রয়েছে—Leave on private affairs for 6 months from 5th June 1869.

এই বইয়ে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরিতে প্রথম যোগদানের তারিখ এবং ঐ ১৮৬৯তে ৬ মাস ছুটি নেওয়ার তারিখ দুটাতেই ভুল আছে বলে আমার মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম চাকরিতে যোগদানের কথা নিয়ে আগে আলোচনা করেছি। এখন ঐ ৬ মাস ছুটি নেওয়ার কথাটা নিয়ে কিছু বলছি—

১৮৯০ এর চাকরির ইতিহাস বইয়ে আছে—বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত কাজে ৪ জুন ১৮৬৮ থেকে ৬ মাসের ছুটি নিয়েছিলেন।

শচীশচন্দ্রও তাঁর বঙ্কিম-জীবনীতে লিখেছেন—'১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) ৬ মাসের ছুটি লইলেন। ছুটির কিয়দংশ গৃহে থাকিয়া আইন পুস্তক পাঠ ও মৃণালিনীর পাণ্ডুলিপি সংশোধনে অতিবাহিত করিলেন।'

আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্র আইন ক্লাসের থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়ে চাকরি

নিয়েছিলেন। তারপর আর আইন পড়ার সুযোগ হয় নি। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকা কালে আইনের থার্ড ইয়ারের বাকি ক্লাস শেষ করে ১৮৬৯ এর জানুয়ারিতে বি. এল. পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

তাই ১৮৯০ এর চাকরির ইতিহাস বই এবং শচীশবাবুর কথা অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৮তেই ৬ মাসের ছুটি নিয়ে ছিলেন বলে মনে হয়।

বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারীর দপ্তর থেকে প্রকাশিত ১৮৯০ ও এর আগের আগের বছর সমূহের ঐ চাকরির ইতিহাস বইগুলিতে যেমন প্রথমেই নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছিল, কারো চোখে ভুল ধরা পড়লে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের জন্য চীফ সেক্রেটারীকে জানাবেন; ঠিক ঐরূপ একাউনটেণ্ট জেনারেল বেঙ্গলের দপ্তর থেকে প্রকাশিত চাকরির ইতিহাস বইয়েও ভুল চোখে পড়লে একাউনটেণ্ট জেনারেলকে জানাতে অনুরোধ করা হয়। ঐ সঙ্গে এই বইয়ের সংকলক প্রথমেই আর একটা কথা লিখেছিলেন। সেটা এই—

Note 1. The dates given against appointment are dates of actual taking charge and not those of orders of appointment.

একাউনটেণ্ট জেনারেলের দপ্তর থেকে প্রকাশিত বা সংকলিত ১৮৯১ এর বইয়েই যা বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির মাত্র অল্প কয়েক বছরের ইতিহাস আছে। ১৮৯১ এর পরের বছর থেকে প্রকাশিত বইগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আর নেই। তার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯১য়েই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

এই ১৮৯১ এর বইয়ে গেজেটেড অফিসারদের চাকরির কথা বলতে গিয়ে যে বলা হয়েছে, বইয়ে দেওয়া তারিখগুলো চাকরিতে যোগদানের তারিখ, এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ—

যশোহরে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগদানের তারিখ যেমন ৭ আগষ্ট ১৮৫৮ নয়, তেমনি এই বইয়েও লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের নেগুয়ায় যোগদানের তারিখ ২১জানুয়ারি ১৮৬০ও ঠিক নয়। কারণ, মেদিনীপুরের মহাফেজখানায় রক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা দুটি চিঠি থেকে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ৭ই ফেব্রুয়ারি নেগুয়ায় পৌঁছে, ৯ই ফেব্রুয়ারি কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ২১শে. জানুয়ারির তারিখটা ছিল আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের নেগুয়ায় এপয়েণ্টমেণ্টের তারিখ। এই সঙ্গে আর একটা কথা—একাউনটেণ্ট জেনারেল দপ্তরের ঐ ১৮৯১ এর বইয়ে মেদিনীপুরের

নেগুয়াকে (যা পরবর্তীকালের কাঁথী মহকুমা) ভুল করে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ মহকুমা বলে লেখা হয়েছে।

একাউনটেন্ট জেনারেলের অফিস থেকে সংকলিত ঐ ১৮৯১ এর চাকরির ইতিহাস বইটা সম্বন্ধে এখানে যে এত কথা বললাম, তার একটা কারণ আছে। কারণটা এই—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের লেখা সাহিত্য-সাধক চরিতমালার অন্তর্গত 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে (১৩৬১, বৈশাখে প্রকাশিত) আছে—

'বঙ্কিমচন্দ্র কতদিন রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং কখন কোথায় কি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন…এরূপ একটি তালিকা সংকলন করা দুরূহ নহে। এই কার্যের জন্য দুইটি উপকরণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি পুরাতন 'ক্যালকাটা গেজেটে, প্রকাশিত লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের রাজকর্মচারী নিয়োগাদির আদেশগুলি। দ্বিতীয়টি একাউন্‌টেণ্ট জেনারেলের আপিস হইতে সংকলিত History of services of officers holding Gazetted appointments under the Government of Bengal. এই ইতিহাসের ১৮৮৯, ১৮৯০ ও ১৮৯১ সালের তিনটি খণ্ড দেখিয়াছি। এ তিনটি খণ্ডে প্রদত্ত তারিখগুলি সর্বত্র একরূপ নহে। কিন্তু ১৮৯১ সালের (এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন) খণ্ডটি 'corrected to 1st July 1891' বলিয়া আমরা এই খণ্ডটিকেই প্রধানত অনুকরণ করিতে পারি।

এই দুইটি উপাদানের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকাযের ইতিহাস সংকলন করিয়া দেওয়া হইল। সরকারী হিসাব বিভাগের ইতিহাসের তারিখের সহিত 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত নিয়োগাদির তারিখের সর্বত্র মিল নাই। যে-যে স্থানে ব্যতিক্রম আছে, পাদটীকায় তাহা নির্দেশ করিয়াছি।'

এই বলে ব্রজেনবাবুরা তাঁদের বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি জীবনের একটা বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন। 'সাহিত্য সংসদ' থেকে প্রকাশিত, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত 'বঙ্কিম-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে বঙ্কিম-জীবনীতে ব্রজেনবাবু-দের দেওয়া এই তালিকাই আছে। কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরিতে ছুটি নেওয়ার ও পদোন্নতির কথাগুলো এতে বাদ দেওয়া হয়েছে। যোগেশবাবু ব্রজেনবাবুদেরই দেওয়া তালিকা নিজের লেখায় ব্যবহার করলেও এ সম্পর্কে কিন্তু তিনি কোন ঋণ স্বীকার করেন নি।

যাই হোক, ব্রজেন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত ও যোগেশচন্দ্রের ন্যায় তিন বিখ্যাত গবেষকের লেখাকে অভ্রান্ত মনে করে পরবর্তীকালের অনেক বঙ্কিম-গবেষকও ঐ তালিকাই তাঁদের বইয়ে দিয়ে চলেছেন।

এখন ব্রজেনবাবুদের প্রদত্ত ঐ তালিকাটি সম্বন্ধে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে—

(১) ব্রজেনবাবুরা ১০৮৯, ১৮৯০ ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের চাকরির ইতিহাসের বইগুলিকে একাউনটেণ্ট জেনারেলের অফিস থেকে সংকলিত বলেছেন। এ কথা যে ঠিক নয়, আমার আগের আলোচনায় তা প্রমাণ করেছি।

(২) ব্রজেনবাবুরা বলেছেন, ১৮৮৯, ১৮৯০ ও ১৮৯১—এই তিনটি খণ্ডে প্রদত্ত তারিখগুলি সর্বত্র একরূপ নহে। এঁদের এ কথাও যে ঠিক নয়, আমি আগেই তাও দেখিয়েছি।

(৩) ব্রজেনবাবুরা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের চাকরির ইতিহাসের বইকে অনুসরণের কথা বলেছেন। কিন্তু ঐ বছরের বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির মাত্র অতি অল্প কয়েক বছরের তো ইতিহাস রয়েছে!

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের দেওয়া তালিকায় 'ক্যালকাটা গেজেটে' বা বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারীর অফিস থেকে সংকলিত চাকরির ইতিহাস বইয়ের তারিখ দেন নি। পাদটীকায় ক্যালকাটা গেজেটের তারিখ এবং ঐ পাদটীকাতেই দু জায়গায় ১৮৮৯ এর বইয়ের তারিখ যে তাঁদের দেওয়া তারিখের সঙ্গে এক নয়, তা দেখিয়েছেন। কেবল একটা ক্ষেত্রে ঐ পাদটীকাতেই ১৮৯০ এর বইয়ের একটা তারিখের সঙ্গে তাঁদের দেওয়া তারিখের যে মিল আছে সে কথা বলেছেন। তবে এঁরা বরাবরই ভুল করে ১৮৮৯ ও ১৮৯০ এর বই দুটিকে চীফ সেক্রেটারীর বিভাগের না বলে একাউনটেণ্ট জেনারেলের বা হিসাব বিভাগের ইতিহাস বলে গেছেন।

এঁরা কোথা থেকে যে এঁদের দেওয়া তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন, তা জানা গেল না। অথচ এঁরা পরিষ্কার বলেছেন—'এই দুইটি (অর্থাৎ ক্যালকাটা গেজেট ও এঁদের লেখা মত হিসাব বিভাগের ইতিহাস) উপাদানের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকার্যের ইতিহাস সংকলন করিয়া দেওয়া হইল।'

ব্রজেনবাবুদের এই ঘোষণাই যখন সত্য নয়, তখন এঁদের প্রদত্ত তালিকা-কেও সত্য নয়, বলা যেতে পারে।

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের দেওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির ঐ তালিকায় অহেতুক

আর একটা ঝামেলা করেছেন। এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির নিয়োগের স্থান 'Howrah' কে হাওড়া না লিখে বরাবর 'হাবড়া' লিখে গেছেন। যোগেশ-চন্দ্র বাগলও তাঁর সম্পাদিত বঙ্কিম-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত বঙ্কিম-জীবনীতে ব্রজেনবাবুদের অনুকরণ করে 'হাবড়া'ই লিখে গেছেন। শচীশ চট্টোপাধ্যায় প্রথমে তাঁর বঙ্কিম-জীবনীতে হাবড়া লিখেছিলেন। ব্রজেনবাবুরা তাঁরই অনুকরণ করেছেন।

এঁদের এই লেখার ফল হয়েছে এই যে, 'সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র' নামক একটি বঙ্কিম-জীবনী গ্রন্থের লেখক, তাঁর ঐ বইয়ে লিখেছেন, তিনি চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত হাবড়া শহরে বহু অনুসন্ধান করেও জানতে পারেন নি যে, বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে হাবড়ার কোন বাড়িতে অবস্থান করতেন।

এই লেখক ব্রজেনবাবুদের লেখা অনুসরণ করে বৃথাই হাবড়ার বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে অনুসন্ধান করেছেন। এঁর এটুকু অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা মহকুমা শহরেই কাজে নিযুক্ত হন। চব্বিশ পরগণার এই হাবড়া আগে কোন দিনই মহকুমা শহর ছিল না এবং আজও নয়।

বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারীর দপ্তরের চাকরির ইতিহাস বই থেকে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির যে তালিকা দিয়েছি, তাতে উল্লেখিত অসুস্থতা-বশত দীর্ঘ ছুটিগুলি হ'ল মেডিকেল লীভ। কিন্তু একটা কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্য কি এতই খারাপ ছিল যে, তিনি শুধু স্বাস্থ্যের জন্যই অত দীর্ঘ দীর্ঘ ছুটি নিয়েছিলেন? আমার মনে হয়, ঐ ঐ সময়ে স্বাস্থ্য কিছুদিন করে খারাপ হলেও তিনি ঐ সূত্রেই নিজের অন্য কাজের জন্যও (যেমন বই লেখা, বই প্রকাশ করা ইত্যাদি) প্রাপ্য মেডিকেল লীভ নিয়েছিলেন।

বাংলা সরকারের গেজেটেড অফিসারদের চাকরির ইতিহাস বই অনুযায়ী আমার দেওয়া তালিকায় কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের ক্যাজুয়েল লীভের উল্লেখ নেই। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র বহু ক্যাজুয়েল লীভ নিয়েছিলেন।

এই সঙ্গে আর একটা কথা। বঙ্কিমচন্দ্র মাতার ও পিতার মৃত্যুর সময় এবং নিজের বিবাহের সময়ও যে সব ছুটি নিয়েছিলেন, সে সব কি ক্যাজুয়েল লীভ ছিল, না ক্যাজুয়েল লীভের চেয়ে বেশী দিনের ছুটি ছিল? যদি ক্যাজুয়েল লীভ না হয়ে তার চেয়ে বেশী দিনের করে ছুটি হয়, তাহলে বলতে হবে সরকারের ঐ তালিকায় সে সব ছুটির উল্লেখ নেই।

বিবাহ

আগেকার দিনে হিন্দু সমাজে ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। তখন এ প্রথা আদৌ নিন্দনীয় ছিল না। বরং এটা একটা প্রচলিত রীতিই ছিল। সেই হিসাবে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন দশ বৎসর আট মাস, সেই সময় তাঁর পিতা তাঁর বিবাহ দেন। পাত্রীর বয়স ছিল পাঁচ বৎসর। পাত্রী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রদের কাঁটালপাড়া গ্রামের নিকটস্থ নারায়ণপুর-নিবাসী জমিদার নবকুমার চক্রবর্তীর কন্যা। পাত্রী খুবই সুন্দরী ছিলেন। নাম ছিল মোহিনী দেবী।

বঙ্কিমচন্দ্র অতি অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। যখন তাঁর বয়স ১৪ বছরও পূর্ণ হয় নি, সেই সময়েই তাঁর একটি কবিতা ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্প আছে—বালক বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কবিতা লেখা কাগজ ছিঁড়ে বালিকা মোহিনী নাকি একদিন তাঁর পুতুলের শয্যা রচনা করেছিলেন। এই দেখে বালক বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। স্বামীর ক্ষুণ্ণ ভাব দেখে বালিকা বধূ অত্যন্ত ভয়-বিহ্বলা হয়ে পড়েন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁকে কাছে ডেকে আদর করে বলেছিলেন—ছিঁড়ে ফেলছ, তাতে আর কি হয়েছে? তুমি ভাবছ, আর লিখতে পারব না? এই দেখ, এখনি ঐ রকমের আর একটা কবিতা লিখে দিচ্ছি। বলেই বঙ্কিমচন্দ্র তখনই আর একটি কবিতা লিখে ফেললেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসন্নভাব দেখে বালিকা মোহিনী দেবীও আশ্বস্ত হলেন। এরপর থেকে তিনি আর তাঁর স্বামীর লেখা কাগজে হাত দিতেন না।

আরও একটি প্রচলিত কাহিনী আছে—

হুগলী কলেজে পড়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্র পর পর যে দুবার জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ পান, সেই টাকা থেকে নবীন যুবক বঙ্কিমচন্দ্র কিশোরী স্ত্রীকে কয়েকটা সোনার গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্বশুর এবং পিতা উভয়েই ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা মোহিনী দেবীকে প্রচুর গয়না দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজের স্কলারসিপের টাকা থেকে আরও কয়েকটা গয়না গড়িয়ে স্ত্রীকে দিয়েছিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মাত্র ২০ বৎসর ২ মাস বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি নিয়ে যশোহরে যান। যশোহরে কিছুদিন থাকার পর বঙ্কিমচন্দ্র যখন স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন, এইরূপ স্থির করেছেন, সেই সময় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে ভুগে মোহিনী দেবী মারা গেলেন। এই সময় তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। তাঁর কোন সন্তানও হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীর মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে থাকতে পারেন নি। তিনি যশোহরে বসে স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু সংবাদ শুনে, অতিশয় কাতর হয়ে পড়েন।

যশোহরে ঐ সময় সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্র থাকতেন এবং ডাক বিভাগে কাজ করতেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা লেখা নিয়ে দীনবন্ধুর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় হয়েছিল। যশোহরে সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

বিদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী-বিয়োগের ঐ দারুণ শোকে দীনবন্ধুই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

এই দুর্ঘটনার কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এলেন। সঙ্গে বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রও এলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি এলে তাঁর শোক নিবারণের জন্য তাঁর পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনরা পুনরায় তাঁর বিবাহ দেবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু তখন বিবাহ করতে রাজী হলেন না। ঐ সময় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি যশোহর থেকে মেদিনীপুরের নেগুয়া মহকুমায় (বর্তমান নাম কাঁথী) বদলি হলেন এবং সেখানে গিয়ে কাজে যোগ দিলেন।

কয়েক মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি এলে আবার তাঁর বিবাহের আয়োজন শুরু হল। এবার বঙ্কিমচন্দ্র বিবাহ করতে রাজী হলেন। তখন [illegible]রাচাঁদ নামে এক ঘটকের আগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন তাঁর মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র ও বন্ধু দীনবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে নৌকায় করে হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরী বাড়িতে একটি মেয়ে দেখতে গেলেন। মেয়ের নাম রাজলক্ষ্মী দেবী। বয়স ১২ বৎসর। দেখতে সুন্দরী। লেখাপড়াও কিছু কিছু জানেন। কাজকর্মে পটু এবং নানা গুণেরও। পাত্রীর পিতার নাম সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়। সীতারামবাবুর বাড়ি এখানে ছিল না। হালিশহরের চৌধুরী বাড়ি ছিল

তাঁর স্ত্রীর মামার বাড়ি। তাঁর স্ত্রী মামার বাড়িতেই থাকতেন বলে তিনিও সেখানে থাকতেন।

পাত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকে দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হ'ল। তখন ঐ বৎসরই ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রাজলক্ষ্মী দেবীর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়। পরে বঙ্কিমচন্দ্র নব পরিণীতা পত্নীকে নিজের কর্মস্থল নেগুয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কর্মসূত্রে যখনই যেখানে বদলি হতেন, রাজলক্ষ্মী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তবে যে জায়গায় অল্প দিনের জন্য যেতেন বা যেখানে সপরিবারে বাস করার সুবিধা থাকত না, সেখানে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন না। কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বাবা-মার কাছে রেখে যেতেন। রাজলক্ষ্মী দেবী একরূপ সর্বদাই তাঁর স্বামীর কাছে থেকে তাঁর সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে, সহায়-সম্পদে সত্যিকারের অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিণী ও সমভাগিনী হতে পেরেছিলেন।

রাজলক্ষ্মী দেবী নিজের হাতে রান্না করে পরম যত্ন সহকারে তাঁর স্বামীর আহারের ব্যবস্থা করতেন। সাহিত্যে ও সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের যখন অপ্রতিহত প্রভাব, তখনও রাজলক্ষ্মী দেবী অমন পদমর্যাদাসম্পন্ন এবং ধনী ব্যক্তির স্ত্রী হয়েও কোন রাঁধুনী না রেখে নিজের হাতেই সংসারের যাবতীয় রান্নার কাজ করতেন। ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাঁর যে সব বন্ধুরা বেড়াতে আসতেন, রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁর স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী ঐ অতিথিদের জন্য কখনো জলযোগের, কখনো বা ভুরিভোজের রান্নাও সবই নির্বিবাদে নিজের হাতেই করতেন। রাজলক্ষ্মী দেবীর হাতের রান্না খেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুরা কেউ কেউ তাঁদের স্মৃতি-কথায় লিখেও গেছেন। যেমন, নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় তাঁর এক প্রবন্ধে ইত্যাদি।

কালিদাস স্ত্রীকে সচিব বলেছেন। রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি অনুযায়ী তাঁর বিরাট প্রতিভাধর স্বামীর সচিবের কাজও অনেকাংশে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র অসুস্থ হলে বা বিশেষ কোনো কাজের জন্য সময় না পেলে, নিকট আত্মীয়দের কোন পত্র দিতে হলে বা পত্রের উত্তর দিতে হলে, সে সব চিঠি লেখালেখির কাজ রাজলক্ষ্মী দেবীই তাঁর স্বামীর নির্দেশমত করতেন। অনেক সময় তিনি নিজেই তাঁর স্বামীর হয়ে চিঠি দিতেন, কখনো

বা তাঁর স্বামী বলে যেতেন, তিনি লিখে দিতেন এবং পরে ঐ চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র সই করতেন।

রাজলক্ষ্মী দেবী যেমন পতিভক্তি পরায়ণা ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি স্ত্রীর কথা মানতেন এবং তাঁকে সমীহ করেও চলতেন। এ সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রেখে রাজলক্ষ্মী দেবীর কড়া হুকুম ছিল এই যে, রাত্রি ৯টার পর তিনি তাঁকে বাইরে এমন কি বার-বাড়িতেও থাকতে দিতেন না। ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে ভিতর বাড়িতে যেতেই হ'ত। এ সম্বন্ধে কাঁটালপাড়ার সংলগ্ন নৈহাটী নিবাসী বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, তিনি কোন কোনদিন সন্ধ্যার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁর বাড়িতে দেখা করতে যেতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির বাইরে তাঁর বৈঠকখানা ভবনটিতে বসে লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন। লোকজনের সঙ্গে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত তিনি কথাবর্তা বলতেন। এরপরই তিনি আর বৈঠকখানায় থাকতেন না। বাড়ির ভিতরে চলে যেতেন। যদি কোনদিন লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটু দেরী হয়ে যেত, তাহলে রাজলক্ষ্মী দেবী বাড়ির ঝিকে বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দিতেন। ঝি এলেই বঙ্কিমচন্দ্র আর একমুহূর্তও থাকতেন না। উঠে পড়তেন।

রাজলক্ষ্মী দেবী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁর স্বামীর ন্যায় তাঁরও বাড়ির গৃহদেবতা রাধাবল্লভের উপর অচলা ভক্তি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—'একবার বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর একখানি অলঙ্কার চাহিয়া পাঠাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন—অলঙ্কারখানি এখন পাইবে না। আমার আরোগ্য কামনা করিয়া আমার স্ত্রী উহা রাধাবল্লভের নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন, এখনও উদ্ধার হয় নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুদের কেউ কেউ বলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নায়িকা সূর্যমুখীর চরিত্রে এই রাজলক্ষ্মী দেবীর অনেক প্রভাব পড়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্র প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—'একটি দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধ্বী, স্নেহশালিনী, পতিপরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন।'

এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের সম্বন্ধেও অক্ষরে অক্ষরে খাটে। বঙ্কিমচন্দ্র

সাহিত্যিক শ্রীশ মজুমদারের কাছেও তাই একবার বলেছিলেন—'স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণ স্বরূপা।'

বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তিনটি কন্যা ছিলেন। এঁরা হলেন—শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী ও উৎপলকুমারী। বঙ্কিমচন্দ্র প্রচুর খরচ করে যথাসময়ে তিন কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। বড় জামাতা ছিলেন হালিশহরের রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় জামাতা উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার বংশের সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠ জামাতা কলকাতার বাঁশতলা গলির মতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ জামাতাকে 'গৃহ জামাতা' করে কন্যা শরৎকুমারী ও রাখালকে নিজের কাছে রেখে ছিলেন। শরৎকুমারীর পুত্রদের নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবী শেষ জীবনে আনন্দে কাটাতেন।

কেবল এক সময় কনিষ্ঠা কন্যা উৎপলকুমারীর, স্বামীগৃহে অস্বাভাবিক ও অকালমৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবী দারুণ শোক পেয়ে ছিলেন।

আগে বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির যে তালিকা দিয়েছি, তাতে এক জায়গায় আছে—১৮৮৭র ডিসেম্বরে বঙ্কিমচন্দ্র ছ মাসের 'এক্সট্রা অর্ডিনারী লীভ' নিয়েও ছুটির শেষের দিকের কিছু বাতিল করে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। উৎপলকুমারীর মৃত্যুর ঘটনা ঐ সময়কারই। এ সম্পর্কে আমার 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে ৯৯-১০৭ পাতায় বিস্তৃতভাবে লিখেছি।

বিচারক-জীবনের কিছু কাহিনী

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আমি 'বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প' নামে একটি বই লিখে ছিলাম। বইটি তখন প্রকাশিত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তারপর বইটির আর পুনর্মুদ্রণ হয় নি। এখন সেই বই থেকেই কিছু কাহিনী এখানে দিচ্ছি। তার আগে, তখন ঐ বইয়ের যে ভূমিকা লিখেছিলাম, সেই ভূমিকার কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

বঙ্কিমচন্দ্র অতন্ত ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, নিরপেক্ষ, দক্ষ ও দুঁদে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কখনো কাকেও ভয় করেন নি। কোনও কষ্ট স্বীকারে পরাঙ্মুখ হন নি বা কখনো কোন অন্যায়ের বশবর্তী হন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায় ও নিষ্ঠার সহিত দীর্ঘকাল সরকারী চাকরি করার জন্য, সরকার তাঁকে স্বেচ্ছায় রায় বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি দান করেছিলেন। এরূপ উপাধির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কোনদিনই কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে বলতেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট চাকরির সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু দিগম্বর বিশ্বাসের (বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন দিগম্বরবাবু সেখানে সাবজজ্ ছিলেন, ঐ সময় থেকেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়) পুত্র তারকনাথ বিশ্বাস তাঁর 'বঙ্কিমবাবুর জীবন-কথা' গ্রন্থে লিখেছেন—

'বিচার কার্যে তাঁহার প্রকৃত সুনাম ছিল। তিনি একজন তেজস্বী হাকিম ছিলেন। প্রমাণ প্রয়োগের অভাব না থাকিলে আসামী তাঁহার নিকট কঠোর শাস্তি পাইত।…সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হইবে যে, বঙ্কিমবাবুর নামে লোকে ভয় পাইত। শাসন কার্যে তেমন লোকেরই আবশ্যক।'

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুরের কর্মজীবনের কথা প্রসঙ্গে লেখেন—

'সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরের এলাকাবাসীগণ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পাইয়াছেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে

আমাদিগের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাস্পদ, বিচার বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাভাজন। ইনি চতুর্বিধ কার্য করেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি কালেকটর, দলিলের রেজিষ্ট্রার ও ষ্ট্যাম্পের সংগ্রহাধ্যক্ষ।··· বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্টবোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচার কার্য সম্পাদন করেন। কার্তিকী পূর্ণিমাতে বারুইপুরে যে রাসযাত্রা হয়, তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তি স্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ের তদন্ত করিয়াছেন। স্বকার্য বিষয়ণী কর্তব্যতা পক্ষেও ইঁহার নিকটে অনেক বিচারক পরাস্ত হন।·····অতএব বঙ্কিমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।'

ব্যাকৃল্যাণ্ড সাহেব তাঁর 'বেঙ্গল আণ্ডার দি লেফটানেণ্ট গবর্ণরস' নামক গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের অনেক প্রশংসা করে গেছেন।

এঁরা ছাড়া আরও অনেকেও বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা করেছেন।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-ইতিহাসের বহু-প্রশংসিত এই অধ্যায়টি একরূপ অজ্ঞাতই রয়েছে। অথচ তাঁর এই সুদীর্ঘ বিচারক জীবন কতই না রোমাঞ্চকর, চাঞ্চল্যময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীতে ভরা।

সুদীর্ঘকাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র অসংখ্য খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি, জাল-জুয়াচুরি, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা প্রভৃতি মামলার বিচার করেছেন। কবি নবীনচন্দ্র সেনের (নবীনচন্দ্রও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন) 'আমার জীবনের' মত বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর আত্মকথা লিখে যেতেন কিংবা কোন বঙ্কিম-গবেষক যদি বঙ্কিমচন্দ্রেব এই বিচারক-জীবনের কাহিনী সংগ্রহ করে যেতেন, তাহলে আজ আমরা তাঁর সেই সব বিচার করা কাহিনীর কথা জানতে পারতাম। সেই সব কাহিনী পড়ে একদিকে যেমন আমরা শিক্ষা ও আনন্দ পেতাম, অপর দিকে তেমনি বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিত বুদ্ধি, শানিত ধীশক্তি, অপূর্ব বিচার কৌশল প্রভৃতির পরিচয় পেয়েও মুগ্ধ হতাম। আর শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমরা জানতে পারতাম যে, কোথায় কোন্ দুদ্ধর্ষ ডাকাতের দলকে ধরতে গিয়ে তিনি কতখানি বিপদগ্রস্ত হয়ে ছিলেন, খুনী আসামীর তল্লাস করতে গিয়ে কিভাবে নিজের প্রাণরক্ষা করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন, প্রভাবশালী ধনী জমিদার আসামীর মামলার ন্যায় বিচার করে কিরূপে তার কোপে পড়ে ছিলেন, অথবা ন্যায়ের জন্য তাঁর উপরওয়ালা

সাহেবদের সঙ্গেও তিনি কিরূপে নির্ভীকভাবে লড়েছিলেন ইত্যাদি। বঙ্কিম-চন্দ্রের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে জানতে হ'লে এবং মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝতে হ'লে, তাঁর এই সুদীর্ঘ বিচারক-জীবনের ইতিহাস জানাও আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, এই বিরাট পুরুষের একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনী যেমন আজ পর্যন্তও রচিত হয়নি, তেমনি তাঁর এই দীর্ঘ কর্ম-জীবনের কাহিনীও সংগৃহীত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু-পুত্র তারকনাথ বিশ্বাস, ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এইরূপ কয়েকজন মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের কথা বা কাহিনী কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু সে অতি সামান্যই।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬৫ বৎসর পরে, আজ এই গ্রন্থ রচনার সময় তাঁর সেই বিচারক-জীবনের কাহিনী সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ, তিনি যে যে জায়গায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সে সব জায়গায় তাঁর বিচার করা নথীপত্র আজ আর নেই। ইংরাজ সরকারের নিয়ম ছিল এই যে, ফৌজদারী মামলার নথীপত্র বিচারের পর ৩০ বৎসর পর্যন্ত রেখে, তারপর সব পুড়িয়ে ফেলত। এরা কেবল নিজেদের প্রয়োজনেই হয়ত ক্ষুদিরাম, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি কয়েকজনের মামলার কাগজপত্র রেখেছিল। সেইগুলোই যা আজও রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে যে কোর্টে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সব কোর্টে তাঁর সময়কার উকিল-মোক্তারদের কাছ থেকেও যে কিছু সংগ্রহ করা যাবে, তারও আজ আর উপায় নেই। কিছুদিন আগে পর্যন্তও হয়ত তাঁদের কেহ কেহ বেঁচে ছিলেন, আজ আর তাঁদের কেউই জীবিত নেই।

কিন্তু তবুও পরিশ্রম করলে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের কাহিনী আজও যে একেবারেই কিছু সংগ্রহ করা যায় না, তা নয়। প্রথমত—বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে যেখানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সব স্থানের প্রবীণ অথচ শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে খোঁজ নেওয়া। দ্বিতীয়ত—তিনি যে যে কোর্টে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সব কোর্টের এখনকার প্রবীণ উকিল-মোক্তারদের কেহ কেহ হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব ও মজার বিচার-পদ্ধতি কিছু কিছু প্রবাদ বা গল্প হিসাবে তাঁদের পূর্ববর্তী উকিল-মোক্তারদের কাছ থেকেও শুনে থাকতে পারেন। এঁদের কাছেও এ সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া। তৃতীয়ত—বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছেন বা তাঁর সঙ্গে মিশেছেন ৮০, ৯০ বা ৯৫ বৎসরের এমন বৃদ্ধ আজও

কেহ কেহ আছেন। এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের সাধারণ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিচারক-জীবনের গল্পও হয়ত জানতে পারেন। এঁদের কাছেও সন্ধান করা। চতুর্থত—বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর, জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়দের কাছে খোঁজ নেওয়া।

এই হিসাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মস্থলের অনেক জায়গাতেই আমি গিয়েছি। গিয়ে শুধু সেখানকার উকিল মোক্তারদের সঙ্গেই নয়, ঐ সব অঞ্চলের বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গেও এ নিয়ে আলাপ করেছি। কাঁটালপাড়া ও তার আশপাশের শহর ও গ্রামগুলিতে, বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছেন, এমন যে সব বৃদ্ধ আজও রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও দেখা করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর, জ্ঞাতি এবং আত্মীয়দের কাছেও গিয়েছি। আমার এই শ্রম যে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে তা নয়। এঁদের কারও কারও কাছ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। ঐ সঙ্গে তাঁর বিচারক-জীবনের কাহিনীও কিছু পেয়েছি। যেমন—

বারাসত কোর্টের প্রবীণ ও খ্যাতনামা উকিল হেমচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে এই গ্রন্থের অন্তর্গত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কাঁটালচোর ধরা' গল্পটি পেয়েছি। হেমবাবু একজন বঙ্কিমভক্ত এবং একরূপ বঙ্কিম-গবেষক লোক। তিনি বহু পরিশ্রম করে বঙ্কিমচন্দ্রের বারাসত-জীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। হেমবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালচোর ধরার কাহিনীটি যার কাছে শোনেন, সেই লোকটি নিজে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ চোর ধরার সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুই প্রপৌত্র সুনন্দনবাবু ও সুনির্মলবাবুর কাছ থেকে এই বইয়ের 'ভৃত্যের বেশে আত্মরক্ষা' গল্পটি পেয়েছি।

'আখচোর ধরা' গল্পটি কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ একদিন আমায় বলেছিলেন। তিনি কোন প্রবীণ লোকের মুখে এই গল্পটি শুনেছিলেন।

এই সব গল্প ছাড়া পূর্বোক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ বিশ্বাস, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির বই থেকেও কিছু গল্প নিয়েছি।

এবার বঙ্কিমচন্দ্রেব বিচারক-জীবনের কিছু কাহিনী বলছি—

নীলকর সাহেব শায়েস্তা

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে

যান। খুলনা তখন যশো'রের অধীন একটি মহকুমা মাত্র, তখনও স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয় নি।

খুলনায় গিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র ঘোর অরাজকতার মধ্যে পড়েন। তখন সেখানে একদিকে যেমন প্রজাদের উপর নীলকর সাহেবদের প্রবল অত্যাচার চলছিল, অপর দিকে তেমনি দস্যু-তস্কর, বিশেষ করে জলদস্যুদেরও ভীষণ উপদ্রব ছিল। ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ছিল মাত্র ২২ বৎসর ৫ মাস। তরুণ বঙ্কিম-চন্দ্র অসাধারণ পরিশ্রম করে, এমন কি অনেক সময় নিজের জীবন বিপন্ন করেও অল্প দিনের মধ্যেই ঐ মহকুমায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং দস্যু-তস্করদের উপদ্রব দুইই দূর করে অক্ষুণ্ণ শান্তি এনে দিয়েছিলেন।

খুলনায় গিয়ে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের তিনি কিভাবে শায়েস্তা করেছিলেন, এখানে এখন তারই একটি কাহিনী বলছি—

খুলনায় তখন মরেল নামে একজন খুব নামজাদা নীলকর সাহেব ছিল। মরেল নিজের নীলের ব্যবসায় লাইটফুট নামে আর একজন সাহেবকেও অংশী-দার রেখেছিল। মরেল নিজের নামে একটা নগর বসিয়েছিল এবং সেই নগরের নাম দিয়েছিল 'মরেলগঞ্জ'। মরেল ঐ নগরের সর্বেসর্বা অর্থাৎ এক কথায় রাজা ছিল। মরেলের নিজের কোর্ট কাছারি ছিল এবং পাঁচ সাত শত লাঠিয়াল সৈন্যও ছিল। এই সৈন্যরা শুধু লাঠিই নয়, শড়কি এবং বন্দুকও ব্যবহার করত। মরেলের এই সৈন্যদলের কর্তা বা ক্যাপ্টেন ছিল ডেনিস্ হিলি। হিলি আগে সৈন্য বিভাগে কাজ করত, সেখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে মরেলেব সৈন্যদলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল।

মবেলগঞ্জ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের এলাকাভুক্ত। মরেল সাহেবের অন্যান্য বহু বিষয়-সম্পত্তিও ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের এলাকাধীন। মরেল সাহেব তার নিজ নামাঙ্কিত এই মবেলগঞ্জ শহরে এবং জমিদারীর অন্যত্রও, সর্বত্রই প্রজাদের উপর প্রবল অত্যাচার করত। এই নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রায়ই তার ঠোকাঠুকিও হ'ত। বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় যাওয়ার ঠিক এক বৎসর পরে মরেল সাহেবের প্রজাপীড়ন একবার এক গ্রামে চরম আকারে উঠেছিল। সে গ্রামটির নাম ছিল বড়খালি। এই বড়খালি গ্রামটিও ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের এলাকার অন্তর্গত।

বড়খালি গ্রামের জমিদার ছিল মরেল সাহেব। তাই মরেল গ্রামের প্রজাদের ক্রমশ খাজনা বৃদ্ধি করত এবং ধান চাষের বদলে বেশী জমিতে নীল চাষ করতে জুলুম করত। প্রজারা বৃদ্ধি খাজনা দিতে অসম্মত হওয়ায় এবং

বেশী জমিতে নীল চাষ করতে আপত্তি করায়, মরেল এই বিদ্রোহী প্রজাদের উপর তখন যারপর নাই অত্যাচার করেছিল।

মরেলের সৈন্যরা বড়খালির প্রজাদের শাস্তি দেবার জন্য সুযোগ পেলেই কোন কোন প্রজার মাঠের পাকা ধান নষ্ট করে দিয়ে আসত, কখন বা কারও গোলার ধান-চাল লুঠ করে আনত। বড়খালি গ্রামের প্রজারা সংখ্যায় ছিল অনেক এবং তারা ছিল একতাবদ্ধ। তাই তারাও একতাবদ্ধ হয়ে মরেলের সৈন্যদের আক্রমণ করত। তাতে উভয় পক্ষেরই কিছু করে লোক জখমও হ'ত। এই ভাবেই চলছিল। শেষে মরেল বড়খালির প্রজাদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেবার জন্য ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর তারিখে গভীর নিশীথে হিলি সাহেবের অধ্যক্ষতায় বার নৌকা বোঝাই সৈন্য, সংখ্যায় তিন শতাধিক হবে, বড়খালিতে পাঠিয়ে দিল।

মরেলের সৈন্যরা যখন বড়খালিতে গেল, তখনও সকাল হয় নি। গ্রামের লোকজন তখনও শয্যা ছাড়ে নি। এমনি ভাবে মরেলের সৈন্যরা গিয়ে অতর্কিতে বড়খালি আক্রমণ করল। তারা লুণ্ঠন এবং অগ্নি-সংযোগ একই সঙ্গে আরম্ভ করল।

বড়খালির লোকেরা এইভাবে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েও যথাসাধ্য বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একতাবদ্ধ হতে না পারায় তেমন সুবিধা কবতে পারে নি। তারা মরেলের সৈন্যদের অনেককে জখম করলেও, সংখ্যায় তারাই কিন্তু বেশী হতাহত হয়েছিল। বড়খালির রহিম উল্লা নামে একজন বলবান পাঠান, একাই লাঠির আঘাতে মরেলের কয়েকজন সৈন্যকে ধরাশায়ী করেছিল। এই রহিম উল্লাকে ডেনিস হিলি উপরি উপরি দু বার বন্দুক ছুঁড়ে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। এইভাবে বড়খালি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে মরেলের সৈন্যরা পুনরায় মরেলগঞ্জে ফিরে গেল। তারা যাবার সময় লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সঙ্গে রহিম উল্লার মৃতদেহটাও নিয়ে গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় যাওয়ার পর থেকেই মরেল সাহেবকে শায়েস্তা করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মরেল এমনি চতুর ছিল এবং প্রজাদের উপর তার অত্যাচার, উৎপীড়নের এমনি ব্যবস্থা ছিল যে, চেষ্টা করেও সহজে তার কোন সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া যেত না। এই বড়খালি আক্রমণের আগে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর পুলিশ যদিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিলি একটা দাঙ্গা করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ঠিক করতে পারেন নি যে, কোথায় দাঙ্গাটা বাধবে। কেননা,

সাহেবরা ভ্যান করেছিল, সুরুলিয়া গ্রাম আক্রান্ত হবে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে পুলিশ সুরুলিয়ার দিকেই নজর রেখেছিল।

যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র সকালেই যখন জানতে পারলেন যে, মরেলের সৈন্যরা ভোর রাত্রে গিয়ে বড়খালি আক্রমণ করে লুটপাট করেছে, তখনই তিনি পুলিশ নিয়ে বড়খালিতে তদন্তে গেলেন। তদন্ত সেরে সেখান থেকে আবার মরেল-গঞ্জে গেলেন। মরেলগঞ্জে গিয়ে দেখলেন, সাহেবরা সকলেই পলাতক। মরেল, লাইটফুট, হিলি সকলেই পালিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এরপর মরেলের সৈন্যদের খোঁজ করলেন। সৈন্যরাও বঙ্কিমচন্দ্রের আসার সংবাদ শুনেই যে যেদিকে পারে, পালাতে চেষ্টা করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই পলায়মান সৈন্যদের মধ্য থেকে ৩৫ জনকে ধরতে সক্ষম হলেন। এদের মধ্যে একজন ছিল, দলের নেতৃস্থানীয়। তার নাম ছিল দৌলত চৌকিদার।

বঙ্কিমচন্দ্র হিলি সাহেবের নামে ওয়ারেণ্ট বার করে ঐ ৩৫ জন আসামীকে বিচারের জন্য যশো'রে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে বিচার করলেন না। কেননা আইন অনুসারে তদন্তকারী বিচার করতে অসমর্থ।

যথাসময়ে দায়রার বিচারে দৌলত চৌকিদারের ফাঁসি এবং অপর ৩৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হ'ল।

মরেল, লাইটফুট ও হিলি পলাতক হয়েই বেড়াচ্ছিল। এই সময় তারা অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে, না হ'লে ভয় দেখিয়েও বঙ্কিমচন্দ্রকে নিজেদের পক্ষে আনবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। একদিন এক সাহেব এক হাতে একটি রিভল-বার, অপর হাতে এক লক্ষ টাকার একটি তোড়া নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখাও করেছিল। সেই সাহেব সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে তখন বলেছিল—হয় এই এক লক্ষ টাকা নিয়ে নীলকরদেয় বন্ধু হয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, না হ'লে এই রিভলবার দিয়ে আমি এখনই আপনাকে হত্যা করব।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় তাঁর বাসার বৈঠকখানায় একা বসেছিলেন। এই অবস্থায় পড়ে তিনি ক্ষণকাল মাত্র চিন্তা করেই সাহেবকে বলেছিলেন—আপনি একটু বসুন। টাকাটা এখনি নেব কিনা, পাশের ঘরেই আমার স্ত্রী আছেন, তাঁর সঙ্গে যুক্তি করে এসেই আপনাকে জানাচ্ছি।—এই বলে সাহেবকে বুঝিয়ে তিনি পাশের ঘরে চলে যান এবং ভৃত্যদের ডাকতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ডাক শুনেই সাহেব ভয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনার পর থেকেই খুলনায় রাষ্ট্র হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে মারবার ষড়যন্ত্র

হচ্ছে। এবং এ কথাও প্রচারিত হয়েছিল যে, যে বঙ্কিমচন্দ্রকে মারতে পারবে সে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। এই প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু আদৌ ভয় পেলেন না। তিনি তাঁর কর্তব্যে সমানে অটুট রইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ মারতে পারল না। ভগবান তাঁকে রক্ষা করলেন।

এদিকে মরেল ও লাইটফুট অনেকদিন নিরুদ্দিষ্ট থেকেও বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ে তাদের নিজেদের জমিদারী মরেলগঞ্জে ফিরে যেতে আর সাহস পেল না। বঙ্কিমচন্দ্র যে কিরূপ তেজস্বী, নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও ন্যায়-পরায়ণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি খুলনায় যাওয়ার পর থেকেই তারা তা টের পেয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে প্রজাপীড়ন যে সুবিধা হবে না, তারা তা জেনেছিল। আর বড়খালি আক্রমণের বিপদ যে তখনও তাদের কাটেনি, সেকথাও তারা বুঝেছিল। তাই তারা অবশেষে ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত ছেড়ে দিয়ে ১৮৬২র মাঝামাঝি সময় নাগাদ বিলাতে পালিয়ে গেল। হিলিও তার প্রভুদের মত অনেক দিন আত্মগোপন করে থাকার পর ছদ্মবেশে অন্য নাম নিয়ে যখন বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়ে বিলাত পালাবার চেষ্টা করছিল, সেই সময় পুলিশ তাকে ধরে এবং টেনে এনে হাজতে রাখে। হিলি অনেক দিন হাজতে থাকে। অবশেষে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হাইকোর্টের বিচারে সে মুক্তি পায়। হিলি খালাস পেয়েছিল এই জন্য যে, তাকে কেহ সনাক্ত করতে পারে নি। আর তাছাড়া রহিম উল্লার মৃতদেহটাও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

এই ভাবে মরেল সাহেবকে শায়েস্তা করায়, যশো'র জেলার অন্যত্র নীলকর সাহেবদের অত্যাচার চলতে থাকলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের এলাকা সমগ্র খুলনা মহকুমায় নীলকরদের অত্যাচার একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যশো'রের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের এই কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রশংসা করে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেছিলেন। ফলে ছোটলাট ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর চাকরিতে একটা প্রমোশন দিয়ে ১০০ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ন্যায়নিষ্ঠ

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক ছিলেন। বিচার ব্যাপারে তিনি

কখনও অন্যায় করেছেন বলে, কেহ কোন দিন শোনে নি। কোন লোক কখনো যদি তাঁর বাড়িতে গিয়ে মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে সুপারিশ হিসাবে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে যেতো, তাহলে তিনি তখনই তাকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতেন। এমন কি সে ব্যক্তি মামলার কথা পাড়বার আগেও যদি তিনি তার কথাবার্তার মধ্য থেকে তার আগমনের হেতু বুঝতে পারতেন, তাহলেও তখনই তাকে বিতাড়িত করতেন। কেননা, তিনি জানতেন এই শ্রেণীর লোকে বাড়িতে এসে প্রথমে এটা ওটা বাজে কথা বোলে বা কোনোও একটা ভূমিকা কোরে, তার পরে তাদের কাজের কথা পাড়ে। তাই তিনি তাদের কথার মধ্য থেকে তাদের আগমনের কারণ সম্বন্ধে কোনরূপ আভাস পাওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বিদায় করে দিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি পরিচিত, এমন কি আত্মীয়দের সঙ্গেও সমান ব্যবহার করতেন। আত্মীয় বলে তিনি ছেড়ে কথা বলতেন না। তাদেরও সমানভাবে অপমান করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহার কিছুটা রূঢ় হয়ে যেত সত্য, কিন্তু তিনি সামান্যতম অন্যায়কেও প্রশ্রয় দিতেন না বলেই এরূপ কঠোর হতেন।

এইরূপ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র একবার তাঁর এক আত্মীয়কে কিভাবে অপমান করেছিলেন, কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে সে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করে গেছেন! ঘটনাটি নবীনচন্দ্রের সমক্ষেই ঘটেছিল। সেদিন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কাঁটালপাড়া থেকেই গঙ্গা পার হয়ে অপর পারে হুগলীতে যাতায়াত করতেন।

এখন নবীনচন্দ্রের গ্রন্থ থেকে সেই কাহিনীটি উদ্ধৃত করছি—

'আমরা প্রাতে বসিয়া আছি, একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গঙ্গাস্নান করিয়া নামাবলি গায়ে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কি একটা চরের বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হাতে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। অমনি যেন শিমুল স্তূপে অগ্নি পড়িল। তিনি ফরশির নলটি মুখ হইতে নামাইয়া সক্রোধে বলিলেন —'বটে! তুমি এ জন্য আসিয়াছ? বের হও?'

ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ ও অপমানিত হইয়া আমার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া চলিয়া গেল। বঙ্কিমবাবু তখন তামাক খাইতে খাইতে আমাকে বলিলেন— দেখিলে তামাসা?

আমি বলিলাম—কাহার, আপনার না ব্রাহ্মণটির ?

তিনি বলিলেন—আমার কেন ? ভদ্রলোক আসিল, আত্মীয় বলিয়া আমি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। তারপর তার ব্যবহারটা দেখিলে ? সে কেন আফিসের কথা ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ?

আমি বলিলাম—তাহার জন্য তাঁহাকে এই অকথ্য অপমান না করিয়া মিষ্টভাবে বলিলেই হইত—আপনি আফিসে গিয়া তাহার খবর লইবেন।

তিনি বলিলেন—তুমি ছেলেমানুষ জান না, এরূপ লোকের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার না করিলে, বাড়ির কাছে হুগলীতে আমার কাজ করা চলিবে না।'

নিরপেক্ষ

রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে বঙ্কিমচন্দ্রের একজন জ্যাঠতুতো ভাই ছিলেন। হুগলী জেলার জিরেট-বলাগড়ে এই রাখালবাবুর এক আত্মীয় ছিলেন। সেই আত্মীয়টির নাম ছিল দ্বারিকাদাস চক্রবর্তী। দ্বারিকাদাস প্রায়ই কাঁটালপাড়ায় রাখালবাবুদের বাড়িতে আসতেন। সেই সূত্রে বঙ্কিম-চন্দ্রের সঙ্গেও দ্বারিকাদাসের ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি বাড়ি থেকে নৌকায় করে প্রত্যহ হুগলী যাতায়াত করতেন। দ্বারিকাদাস সেই সময় একবার কাঁটালপাড়ায় এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেন—বঙ্কিমবাবু, আজ আপনার নৌকায় আমিও আপনার সঙ্গে হুগলী যাব।

বঙ্কিমচন্দ্র খুশী হয়ে বললেন—বেশ তো যাবেন।

যথাসময়ে উভয়েই নৌকায় উঠলেন। তাঁরা দুজন ছাড়া আর অন্য কোন যাত্রী নৌকায় ছিল না। নৌকা যখন গঙ্গার মধ্য পথে তখন দ্বারিকাদাস একটি মোকদ্দমার গল্প করতে আরম্ভ করলেন। মোকদ্দমাটি ছিল ফৌজদারী এবং তার ঘটনা স্থল ছিল জিরেট। দ্বারিকাদাসের কোন বন্ধু ঐ মোকদ্দমায় লিপ্ত ছিলেন। গল্পটি শেষ হ'লে দ্বারিকাদাস বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন—বঙ্কিমবাবু, এই মোকদ্দমাটি আপনার হাতে। আসামীকে কিছু শাস্তি দিতে হবে।

দ্বারিকাদাসের এই কথা শুনেই বঙ্কিমচন্দ্র রাগে একেবারে জ্বলে উঠলেন। তিনি তখনি চীৎকার করে মাঝিকে বললেন—মাঝি, নৌকা ভিড়াও।

নিকটেই নদীর মধ্যে একটা চর ছিল। মাঝি তৎক্ষণাৎ সেখানে নৌকা লাগাল।

বঙ্কিমচন্দ্র আবার চীৎকার করে বললেন—লোকটাকে নৌকা থেকে ফেলে দে।

দ্বারিকাদাস নৌকা থেকে সেই চরে লাফিয়ে পড়লেন।

দ্বারিকাদাস নেমে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে নৌকা ছাড়তে বললেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে মাঝি আবার নৌকা ছেড়ে দিল।

এদিকে দ্বারিকাদাস এইভাবে চরে পরিত্যক্ত হয়ে, পরে চীৎকার ও ডাকা-ডাকির দ্বারা অন্য মাঝিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের সাহায্যেই তীরে উঠেছিলেন।

এই ঘটনার পর থেকে দ্বারিকাদাস শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেই নয়, কাঁটাল-পাড়ায় তাঁর আত্মীয়দের কাছেও আর দেখা দেন নি।

পুলিশের মোকদ্দমা বিচার

বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে পুলিশ চালানী কোন মোকদ্দমা এলে, তিনি পুলিশ গবর্ণমেণ্টের লোক হলেও তাদের কথাকে ধ্রুব সত্য বলে কখনই মেনে নিতেন না। পুলিশের অন্যায় দেখলে, তিনি বরং উল্টে অনেক ক্ষেত্রে পুলিশেরই শাস্তি দিতেন। ফলে পুলিশও বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে যাতে না তাঁদের মোকদ্দমা যায়, তার চেষ্টা করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাওড়ার সহকর্মী মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আমার দেখা লোক' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন—মোকদ্দমা যাহাতে উহার কাছে না হয়, এজন্য নাকি পুলিশের বিশেষ চেষ্টা ছিল।

মুকুন্দদেববাবু তাঁর গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের হাওড়ায় থাকাকালে একটি পুলিশের মোকদ্দমার বিচারের কথা লিখে গেছেন। এখানে সেই মোকদ্দমাটির কাহিনী দিলাম—

হাওড়ার রামরাজাতলায় তখন রামরাজার মেলা চলছে। সেই সময় একদিন রাত্রে ফৌজদারী আদালতের নাজির এবং ফৌজদারী আদালতের এক উকিল একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে করে মেলা দেখতে যাচ্ছিলেন।

গাড়ী চলছে, এমন সময় একজন কনষ্টেবল গাড়ীর পিছনে উঠে দাঁড়াল। ফৌজদারী আদালতের নাজির এবং উকিল গাড়ীতে থাকায় গাড়োয়ানের সাহস হয়েছিল। সে কনষ্টেবলকে নামতে বললে। কনষ্টেবল তো নামলই না, অধিকন্তু সে গাড়োয়ানকে গালাগালি দিতে লাগল।

গোলযোগ শুনে নাজিরবাবু গাড়ী থামাতে এবং কনষ্টেবলকে নামতে বললেন। কনষ্টেবল তবুও নামতে চাইল না। খুব উদ্ধত ভাব দেখাতে লাগল। তখন নাজিরবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে কনষ্টেবলকে এক ঘা মেরে বসলেন।

কনষ্টেবলটা এবার নেমে নাজিরবাবু এবং উকিলবাবু দুজনকেই ডাণ্ডা দিয়ে প্রহার করতে করতে জুড়িদারকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগল। দুজন কনষ্টেবল এসে পড়ল। তারা নাজির ও উকিলকে চিনতে পেরে কনষ্টেবলটাকে বললে —করেছিস কি? নাজির ও উকিলবাবুকে মেরে কপালে দাগ করে দিয়েছিস্?

এই শুনেই সেই কনষ্টেবলটা তাড়াতাড়ি গাড়ীর আলো দু'টা নিবিয়ে দিল এবং রাস্তা থেকে একটা খোয়া তুলে নিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করে বললে —বিনা আলোয় গাড়ী চলতেছিল, আটক করায় বাবুরা আমাকে মেরেছেন।

পরদিন কনষ্টেবলের মোকদ্দমা দায়ের হ'ল। এক দফা বাবুদের উপর সরকারী কার্যে বাধা দেওয়া, আর এক দফা গাড়োয়ানের বিনা আলোতে গাড়ি হাঁকানো।

তখন কাজেই বাবুদেরও মোকদ্দমা দায়ের করতে হ'ল।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর এই মোকদ্দমার বিচারের ভার পড়ল।

বঙ্কিমচন্দ্র বিচারে কনষ্টেবলকে তিন মাস কারাদণ্ড দিলেন।

পুলিশের লোক কনষ্টেবলের পক্ষে ছিল। তাঁরা তাকে দিয়ে জজ সাহেবের কাছে পুনরায় আপীল করালেন।

জজ সাহেব কনষ্টেবলকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বটে, তবে তার সাজা তিন মাস থেকে অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন।

ভৃত্যের বেশে আত্মরক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় তিনি একবার ঐ

মহকুমার এক প্রভাবশালী ধনী জমিদারের বিরুদ্ধে এক মামলায় রায় দিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছিলেন।

উক্ত জমিদারবাবুটি বড় অত্যাচারী ছিলেন। তিনি প্রজাদের উপর অনেক সময় অযথা ও অন্যায় ভাবে অত্যাচার করতেন। জমিদারবাবুটির ইয়ার বন্ধু ও মোসাহেবের অভাব ছিল না। তার উপর কিছু গুণ্ডাও তাঁর পোষা ছিল। খাজনা আদায়ের ব্যাপারে প্রজাদের উপর তাঁর অন্যায় জোর জুলুমের সীমা ছিল না। এমন কি তিনি গরীব প্রজাদের ধরে এনে মার-ধোর করতেন এবং অন্যান্য নানাবিধ শাস্তিও দিতেন।

একে জমিদার, তার উপর লোকবল ও অর্থবল প্রচুর থাকায়, প্রজারা অত্যাচারিত হয়েও ভয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা মামলা-মোকদ্দমা করতে সাহস পেত না। কিন্তু তাদের সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। জমিদারের অত্যাচার যখন তাদের কাছে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল, তখন কয়েক জনে মিলে জমিদারের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা দায়ের করল।

মোকদ্দমাটি হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রেরই এজলাসে।

মোকদ্দমা যাতে ডিস্‌মিস্‌ হয়ে যায় বা নিজের অনুকূলে রায় হয়, সেজন্য জমিদারবাবু তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের হাত দিয়ে মোকদ্দমা তদ্বির করবার জন্য অজস্র অর্থও ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু সেই চেলাচামুণ্ডাদের দল কোনদিনই অর্থ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রিসীমানায় যেতে সাহস করেনি। তাই বলে সে টাকাও তারা আর জমিদারবাবুকে ফেরৎ দেয়নি। সে টাকায় তারা নিজেদের পেট ভরিয়ে ছিল, আর সেই সঙ্গে জমিদারবাবুকে মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে ছিল।

মোকদ্দমার রায় দেবার দিন বিচারে জমিদারবাবু দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, তার দোষের গুরুত্ব অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে কিছুদিন জেলবাসের আদেশ দিলেন।

রায় ঘোষণা করে বঙ্কিমচন্দ্র নির্বিঘ্নেই বাড়ি ফিরলেন। এ নিয়ে যে, পরে কিছু গোলমাল হতে পারে, তিনি তখনও পর্যন্ত কিছু ভাবতেই পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্রের ঐদিন বারুইপুরে আসবার কথা ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কোর্ট থেকে সিধা বাসায় ফিরলেন।

পূর্ণচন্দ্র ঐদিন তাঁর সেজদা বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মস্থলে বেড়াতে আসেন।

ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকদিন যাবৎ সপরিবারে বারুইপুরে বাস করছিলেন না। তাঁর পরিবারবর্গ তখন কয়েক দিনের জন্য কাঁটালপাড়ায় গিয়েছিলেন।

সন্ধ্যার পর দু ভাইএ বাড়ির ভিতরে বসে কথা কইছিলেন। কাঁটাল-পাড়ার কথা, চাকরির কথা, মায় সাহিত্যের কথা সবই আলোচনা হচ্ছিল। কথা কইতে কইতে অনেকটা রাতও হয়েছিল। এমন সময় বাড়ির বাইরে তাঁরা একটা জনতার সোরগোল শুনতে পেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বেরিয়ে এসে দেখলেন—এক ক্রুদ্ধ জনতা, তাদের অনেকেরই হাতে লাঠিসোটা, কারও কারও হাতে জ্বলন্ত মশাল, তাঁরই বাড়ির সামনে এসে জটলা করছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে সেই জনতার মধ্য থেকে কয়েকজন চীৎকার করে বলে উঠল—হয় জমিদারবাবুর বিরুদ্ধের রায় বাতিল করুন, না হ'লে বাড়িশুদ্ধ আপনাকে পুড়িয়ে মারব।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাসা থেকে পুলিশের থানা তখন কিছুটা দূরেই ছিল। উক্ত ক্রুদ্ধ জনতা পথে চুপচাপ এসেছিল। তাছাড়া তারা থানার পাশ দিয়ে না এসে অন্য পথ ধরে এসেছিল। তাই পুলিশও এদের কথা কিছুই জানতে পারে নি।

লাঠিসোটা নিয়ে এতগুলো ক্রুদ্ধ লোক আক্রমণ করছে দেখে, বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রথমটা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন না, তা নয়। তবে তিনি বিপদে সাহস হারালেন না। সঙ্গে সঙ্গে একটা মতলবও ভেঁজে ফেললেন।

সেই ক্রুদ্ধ জনতার প্রতি তিনি ধীর ও শান্তভাবে বললেন—সাক্ষী-সাবুদে আমি যা পাব, তাই নিয়েই তো বিচার করব। আমিও তো চেয়েছিলাম, জমিদারবাবুকে নির্দোষ বলে ছেড়ে দিতে, কিন্তু তোমাদের সাক্ষীরা যদি গোলমাল করে, সে দোষ তো আর আমার নয়।

তারপর তিনি বললেন—আচ্ছা, তোমরা স্থির হয়ে এই বাইরের রকে একটু বোস। বললেই তো আর আমি রায় বদলাতে পারি না। একবার যে রায় দিয়েছি, তাকে কি আর বদলাতে পারি। তবে মোকদ্দমার কথা আমার মনে আছে এবং কাগজপত্রগুলোও এখনও আমার কাছেই আছে। আমি আর একবার পড়ে দেখি। আইনের একটা ফাঁক বা'র করে, একটা মতলব বলে দিচ্ছি, তার ফলে তোমরা আপীল করলেই জিতে যেতে পারবে। আশা করি, একটু তন্ন তন্ন করে দেখলে কিছু ফাঁক বার করতে পারবই। তোমরা এইভাবে যখন এসেছ, তখন যা হয় একটা তো করতেই হবে। রায় দেবার আগে যদি কেহ এসে দেখা করতে, তাহলে তো এসব ঝামেলাই হ'ত না। জমিদারবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাঁর প্রতি আমার সহানুভূতিই ছিল;

কিন্তু কি করি, সাক্ষীরা যা বলেছে, সেই অনুযায়ীই রায় দিয়েছি। আচ্ছা, তোমরা ততক্ষণ একটু অপেক্ষা কর, আমি কাগজগুলো একটু উল্টে দেখি। তাহলে যাবার সময় তোমরা জেনে নিশ্চিন্ত হয়েই বাড়ি যেতে পারবে।

ক্রুদ্ধ জনতাকে এই কথা বলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভৃত্যদের ডাকতে লাগলেন। ভৃত্যরা কাছেই ছিল। তারা এলে. তিনি তাদের বললেন—বাড়ীর ভিতর থেকে বড় শতরঞ্চিটা এনে এই রকে বিছিয়ে দে, বাবুরা বসবেন। আর কয়েক ছিলিম তামাক এনে দে। এই বলে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির ভিতরে গেলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারে আক্রমণকারীরা প্রীত হয়ে, তাঁর সকল কথাই বিশ্বাস করল। তারা বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে জমিদারবাবুর পক্ষে আপীলে জেতার সন্ধান জেনে যাবার জন্য সানন্দে অপেক্ষা করতে প্রস্তুত হ'ল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির ভিতরে এসে পূর্ণচন্দ্রকে সংক্ষেপে বিপদের কথা জানালেন। তারপর নিজে ভাল কাপড় জামা ছেড়ে, একটা পরিতক্ত আধ-ময়লা কাপড় পরলেন। তখন শীতকাল ছিল, তাই চাকরদের একটা ঐ ধরণের ময়লা চাদরও নিয়ে গায়ের উপর জড়ালেন। নিজে যেভাবে সাজলেন, ভাইকেও ঐ ভাবে সাজালেন।

ভৃত্যরা বাইরের রকে শতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়ে তামাক সাজবার জন্য পুনরায় বাড়ির ভিতরে এলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাদের সাবধান করে দিয়ে বললেন—ওরা যদি আমার খোঁজ নেয় তো বলবি, বাবু, খুব যত্ন করে কি সব মোকদ্দমার কাগজ-পত্র ঘেঁটে দেখছেন। এছাড়া আর কিছু বলবি না। এর পরে তোরাও আমাদের মত বাড়ির এই পিছনের দরজা দিয়ে চুপে চুপে চলে যাবি। আমি একটু আগেই যাচ্ছি। তোদের কোন ভয় নেই। ওরা এখন আর কিছু বলবে না।

এই বলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে পূর্ণচন্দ্রকে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে বার করে দিলেন। তারপর নিজে যেন খুব শীতার্ত হয়েছেন, এই ভাব দেখিয়ে চাদরের উপরিভাগটা নাকের নীচে পর্যন্ত তুলে, মুখটা চাপা দিয়ে, এক হাতে একটা বাজার করা ঝোলা, অপর হাতে একটা তেলের বোতল নিয়ে ভৃত্যের বেশে বাড়ির সেই পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পরে ভৃত্যরাও সেই পথ দিয়ে চলে গেল।

আক্রমণকারীরা এর কিছুই টের পেল না। তারা তখন ভাবী সাফল্যের

কথা চিন্তা করে আনন্দে অনেকটা মশগুল। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাসার পিছনের ঐ পথটা এমন ছিল যে, সামনে থেকে তার কিছুই দেখা যেত না।

বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা গিয়েই হাতের ঝোলা ও বোতল ফেলে দিয়ে, দ্রুত পা চালিয়ে থানার দিকে চললেন। থানায় গিয়ে দারোগাবাবুকে বলে তখনই কিছু সংখ্যক সশস্ত্র সেপাই নিয়ে পুনরায় বাড়ির দিকে পূর্ববৎ দ্রুত ফিরলেন। দারোগাবাবুও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এলেন।

আক্রমণকারীরা তখন নিশ্চিন্তভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির রকে ও তার সামনের রাস্তাটায় বসে জটলা করছিল। এমন সময় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এসে হঠাৎ তাদের ঘিরে ফেলল।

আক্রমণকারীরা এইভাবে হঠাৎ পুলিশকর্তৃক ঘেরাও হবে, এ তারা ভাবতেও পারে নি। তারা সহসা এই বিপদ দেখে হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তাই কিছু বলবার বা করবার আগেই পুলিশ তাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করে ফেলল। দু-একজন ছুটে পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পুলিশ তাদেরও সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলল। দারোগাবাবু আক্রমণকারী গুণ্ডাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেলেন এবং হাজতে পুরে রাখলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারবাবুর বিরুদ্ধে যে রায় দিয়েছিলেন, সে রায় তো বহাল ছিলই, অধিকন্তু পরে বিচারে আক্রমণকারীদেরও সকলেরই শাস্তি হয়েছিল।

কাজির পদ্ধতিতে বিচার

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারাসতে ছিলেন, সেই সময় একবার এক চুরির মামলায়, প্রকৃত চোর ঠিক করতে গিয়ে তাঁকে মহা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। শেষে এক মজার ব্যাপার করে সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। সে কাহিনীটি এই—

একদিন রাত্রে এক ব্রাহ্মণ পথিক রাত্রি যাপনের জন্য বারাসতের নিকটবর্তী কোন গ্রামের এক ভদ্র ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। গৃহস্বামী অত্যন্ত আদরের সহিতই ব্রাহ্মণকে গ্রহণ কোরে, আহার করিয়ে, পরে বাড়ির সংলগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে তার শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। ব্রাহ্মণ একা চণ্ডীমণ্ডপে শুয়ে আছে।

অপরিচিত জায়গার জন্যই হোক, অথবা মনের মধ্যে অন্য কোন চিন্তার কারণেই হোক, ব্রাহ্মণের চোখে তখনও ঘুম আসে নি। এমন সময় আকাশের তারার মিটমিটে আলোয় ব্রাহ্মণ দেখতে পেল, একটা লোক চারিদিকে তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে চণ্ডীমণ্ডপের উঠান পার হয়ে বাড়ির ভিতরের দিকে আগিয়ে যাচ্ছে। অত রাত্রে লোকটার ঐ ধরণের চলার ভাব দেখে, ব্রাহ্মণের মনে হ'ল, লোকটা নিশ্চয়ই একজন চোর।

এই দেখে ব্রাহ্মণ ভাবল, আমাকে যে আশ্রয় দিয়েছে, চোরে তার সর্বনাশ করবে, আর আমি পড়ে পড়ে তাই দেখব, তা কখনই হতে পারে না। তার চেয়ে আমি বাইরে গিয়ে 'চোর' 'চোর' বলে চীৎকার করে লোককে জাগাই।

ব্রাহ্মণ পরমুহূর্তেই আবার ভাবল, যাকৃগে, গোলমালে কাজ নেই। চুপ করে পড়ে থাকাই ভাল। শেষে কি চোরের হাতে প্রাণটা খোয়াব।

ব্রাহ্মণ আবার চিন্তা করে ঠিক করল—নাঃ, চীৎকার করে সকলকে জাগানোই উচিত। তা না হলে, চোর চুরি করে চলে গেলে, পরে সকলে আমাকেই চোর অথবা চোরের লোক মনে করতে পারে। এই স্থির করে, ব্রাহ্মণ উঠে চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে দাঁড়িয়ে 'চোর' 'চোর' বলে চীৎকার করতে লাগল।

ব্রাহ্মণ যতক্ষণ কি করা উচিত ভাবছিল, চোরটা ততক্ষণে বাড়ির ভিতরে ঢুকে চুরি করতে আরম্ভ করেছিল। সে এখন চীৎকার শুনে একটা বাক্স মাথায় নিয়েই বাইরে পালিয়ে এল।

বাইরে এসে চোরটা বাক্স মাথায় নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের উঠানের এক পাশ দিয়ে ছুটে পালাবে কি, ব্রাহ্মণও ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল।

চোরটা নিজেকে ছাড়াবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

ব্রাহ্মণের গায়ে বেশ জোর ছিল। সে চোরকে জাপটে ধরে রইল, কিছুতেই ছাড়ল না। ব্রাহ্মণ একদিকে যেমন চোরটাকে ধরে রইল, তেমনি সে সমানে চীৎকার করতেও লাগল।

এদিকে চোর যখন শত চেষ্টা করেও ব্রাহ্মণের হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারল না, তখন সে একটা চালাকি করল। বাক্সটা সামনে ফেলে রেখে, সেও ব্রাহ্মণকে জড়িয়ে ধরে 'চোর' 'চোর' বলে চীৎকার আরম্ভ করল।

এদের দু জনের যুগপৎ চীৎকারে গৃহস্বামী জেগে উঠে আলো হাতে নিয়ে বাইরে এলেন। এসে দেখেন, সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ এবং সরকারী পোষাক

পরিহিত একজন কনষ্টেবল পরস্পরকে সবলে ধরে রেখে উভয়েই 'চোর' 'চোর' বলে চীৎকার করছে।

সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের বাড়ির লোকজনও লণ্ঠন জ্বেলে সেখানে এসে উপস্থিত হল।

গৃহস্বামী ব্রাহ্মণটির দিকে তাকিয়ে বললেন—একি!

ব্রাহ্মণ তখন বলতে আরম্ভ করল—মশাই··

ব্রাহ্মণ কথা বলতে যাবে কি, কনষ্টেবল অমনি মহা চীৎকার করে বাধা দিয়ে বললে—চোপরাও! মশাই, আমি পথে পাহারা দিচ্ছিলাম, দেখি এই লোকটা একটা বাক্স বগলে করে এখানে এসে দাঁড়াল। আমি হাঁকলাম—কোন্ হায় রে? কথাই কয় না। মনে ভারি সন্দেহ হ'ল। এসে ধরলাম একে। আমাকে বলে—ছেড়ে দাও, তোমাকে অর্ধেক ভাগ দেব। এই বলে পুলিশ কর্মচারিটি ব্রাহ্মণের গালে একটা চড় মারল।

কনষ্টেবল এইভাবে প্রবল বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমে সমস্ত কথাই ব্যক্ত করল।

পরে পুলিশের লোকজন এসে উভয়কেই থানায় নিয়ে গেল। গৃহস্বামী এবং তাঁর প্রতিবেশীরাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল।

এই বিচারের ভার পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণের এবং কনষ্টেবলের এজাহার নিয়ে বিষম সমস্যায় পড়লেন। কে দোষী, আর কে নির্দোষ স্থির করতে পারলেন না।

কনষ্টেবল বললে—আমি পাহারা দিচ্ছিলাম। ঐ লোকটা কোমর বেঁধে বাক্স নিয়ে পালাচ্ছিল। গ্রেপ্তার করাতে, ও এখন আমাকেই চোর বলছে।

ব্রাহ্মণও যা ঘটেছিল তাই বললে।

কনষ্টেবলের পক্ষ থেকে পুলিশ ভালরূপ তদ্বির করতে লাগল। তার পক্ষ থেকে কয়েকজন সাফাইয়ের সাক্ষীও দেওয়া হ'ল। তারা ঐ কনষ্টেবলটির সচ্চরিত্রতার সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ দিল।

ব্রাহ্মণের পক্ষ থেকে কোন তদ্বিরই হ'ল না। সে শুধু নিরুপায়ের একমাত্র উপায় ঈশ্বরকেই ডাকতে লাগল।

বঙ্কিমচন্দ্র অতিরিক্ত প্রমাণ প্রয়োজন বোধ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েক ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণ করলেন।

সাক্ষ্য প্রমাণাদি নেওয়া সমাপ্ত হলে, শেষে মামলার রায় দেবার দিন এল। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু তখনও কিছু ঠিক করতে পারলেন না। কনষ্টেবলের উকিল সাক্ষ্য প্রমাণাদি দিয়ে নানা ভাবে তাঁর মক্কেলকে নির্দোষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মন কিন্তু এতে সায় দিচ্ছিল না। আর তিনি একদিকে যেমন কনষ্টেবলের উকিলের যুক্তি খণ্ডন করতে পারছিলেন না। অপর দিকে তেমনি ব্রাহ্মণের পক্ষ থেকেও কোন সবল প্রমাণ পাচ্ছিলেন না। এই সমস্যায় পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এক মতলব স্থির করলেন। তাঁর কোর্টে ব্রজলাল নামে একজন আমলা স্থানীয় সখের যাত্রার দলে ভাল অভিনয় করত। বঙ্কিমচন্দ্র সে খবর জানতেন। তিনি ব্রজলালকে ডেকে মামলার রায় দেবার দিন, তাকে মড়া সাজিয়ে এক অভিনয় করালেন।

রায় দেবার দিন একটু সকাল সকালই বঙ্কিমচন্দ্র এজলাসে এসে বসলেন। সেদিন দর্শকেও আদালত গৃহ একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

উকিল মোক্তাররা যে যার জায়গায় বসে আছেন। আসামী দু জন করজোড়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। চার পাঁচ জন পুলিশের লোক জনতাকে স্থির রাখবার জন্য যথাসাধ্য কাজ করছে।

ঠিক এমনি সময়ে একজন পেয়াদা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে বললে—হুজুর! আমাদের কাছারির আমলা ব্রজবাবুকে কে খুন করেছে!

বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন—বলিস্ কি রে! কোথায়?

পেয়াদা—ধর্মাবতার! গ্রামের বাইরে বসিরহাট যাওয়ার রাস্তায় পোলের নীচে তার মৃত দেহ পড়ে আছে। স্থানে স্থানে আঘাতের চিহ্ন, কাপড়ে রক্তের দাগ। হুজুর যদি অনুমতি করেন, তাহলে পুলিশকে বলে লাস চালান দেওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র—পুলিশে নিয়ে যাওয়ার আগে, কি রকম অবস্থায় আছে, একবার দেখা দরকার। শীঘ্র এখানে সে লাস আনা।

পেয়াদা—হুজুর! এত শীঘ্র আনবার লোক কোথায় পাব? ডোমেদের ডেকে জোগাড় করতে বিস্তর বিলম্ব হবার সম্ভবনা।

বঙ্কিমচন্দ্র একটু চিন্তা করে কাঠগড়ায় আসামীদের দেখিয়ে বললেন—এই আসামী দুটাকেই নিয়ে যা। এরা বয়ে নিয়ে আসবে। আর দারোগা সাহেবকে বলে দে, সঙ্গে গিয়ে কেহ যেন গোলমাল না করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ মত পেয়াদা, ব্রাহ্মণ ও কনষ্টেবলকে সঙ্গে করে কাছারির

চৌকিদারের কাছ থেকে, তার বিস্তর আপত্তি সত্ত্বেও, তার খাটিয়া নিয়ে আমলা ব্রজলালের মৃতদেহ আনতে গেল।

মৃতদেহ খাটিয়ার উপর তুলে, চাদর ঢাকা দিয়ে কাঁধের উপর তুললে, তাদের সাবধানে ধীরে ধীরে আনতে বলে, পেয়াদা দ্রুত পদে অনেক আগে আগে আসতে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে এইরূপই আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ মৃতদেহ কাঁধে করে কয়েক পা গিয়েই কেঁদে ফেলল। সে কাঁদতে কাঁদতে কনষ্টেবলকে বললে—ভাই! তোমাকে ধরে আমি কি দুষ্কর্মই না করেছি! আমার মান গেল, সম্ভ্রম গেল, জাত গেল, শারীরিক কষ্টে প্রাণ যাবারও যো হয়েছে! আরও কপালে কি আছে জানি না!

কনষ্টেবল চারিদিক চেয়ে দেখল যে, নিকটে কেহ নেই। তখন সে নাক মুখ কুঁচকে বললে—কেমন বামুন, যেমন আমায় ধরেছিলি, তেমনি জব্দ! এখন দেখ মজা! আমরা পুলিশের লোক, আমাদের কিছুই হবে না, তোকেই জেলে পচে মরতে হবে।

ব্রাহ্মণ—তাই তো ভাই, দুষ্কর্ম করেছি। তোমাকে না ধরলেও তো সবাই আমাকে সকাল বেলা চোর বলে সন্দেহ করত। এখন তো আর কোন উপায় নেই। কি করি? কি করে অব্যাহতি পাই?

কনষ্টেবল—এখন আর উপায় কি? উপায় শ্রীঘর! তখন উপায় ছিল। আমি চুরি করে চলে গেলে, তুইও ভোর ভোর পালাতে পারতিস্। তোকে লোকে সন্দেহ করত, কিন্তু ধরতে পারত না।

এইভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে লোকালয়ের কাছে এলে কনষ্টেবল চুপ করল। সুতরাং ব্রাহ্মণও নীরব হ'ল।

আমলা ব্রজলালের বস্ত্রাবৃত দেহ খাটিয়া সমেত কাছারির বৃহৎ হলের মধ্যে আনা হ'ল। কোর্টের লোক যারা চুরির মামলা দেখতে এসেছিল, তারা এখন আবার এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের অবতারণা দেখে অবাক্ হয়ে গেল।

বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসের সামনে উকিল মোক্তারদের স্থান কিছুটা পরিষ্কার করে ব্রজলালের খাটিয়া নামান হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়ার ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।

এমন সময় সহসা সেই 'মৃত' আমলা আচ্ছাদিত আবরণ ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিকটের উকিল মোক্তাররা ভয়ে ছিটকে পালালেন এবং মৃতদেহ প্রেতগ্রস্ত হয়েছে বলে চীৎকার করতে লাগলেন।

এদিকে সেই 'মৃত' আমলা কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য না করে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্বোধন করে বলতে লাগল—ধর্মাবতার! ব্রাহ্মণের কোন দোষ নাই, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। কনষ্টেবল আপন মুখে সমস্ত দোষ স্বীকার করেছে। আমি বরাবর ওদের কথোপকথন শুনতে শুনতে এসেছি।—এই বলে পথিমধ্যে যা শুনেছিল, সমস্তই সে যথাযথ বর্ণনা করল।

কোর্টের সকলেই এবার পরিষ্কার বুঝতে পারল, বঙ্কিমচন্দ্র সমস্যা সমাধানের জন্য এবং প্রকৃত সাক্ষ্য গ্রহণের জন্যই আমলা ব্রজলালকে মড়া সাজিয়েছিলেন।

ব্রজলালের কথার বিরুদ্ধে কনষ্টেবল আর একটা কথাও বলতে পারল না। শেষে নিজের অপরাধ স্বীকার করল।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিয়ে কনষ্টেবলকে দু'বছর কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

কাঁঠাল চোর ধরা

বারাসতে থাকার সময় একবার এক অভিনব উপায়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটি কাঁঠাল চোরকে ধরেছিলেন। সে কাহিনীটি হ'ল এই—

একদিন সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে বৈঠকখানার সামনে ফাঁকা জায়গাটায় পায়চারি করছিলেন, এমন সময় একটি যুবক সামনে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। যুবকটি বেশ চালাক ও নির্ভীক ছিল। সে হাত জোড় করে বললে—হুজুর! আপনার রাজত্বেও একটু শান্তিতে বাস করতে পারব না?

বঙ্কিমচন্দ্র যুবকটির এই ধরণের কথা শুনে একটু কৌতুক বোধ করলেন। বললেন—কেন? কি হ'ল?

যুবকটি বললে—হুজুর! আমি একজন চাষী, চাষ করেই খাই। তবে নিজেও যেমন চাষ-আবাদ করি, তেমনি আবার লোকজন দিয়েও চাষ করাই। ধান চাষ এবং তরিতরকারীর চাষ ছাড়া, গ্রামে আমার একটা আম-কাঁঠালের বাগানও আছে। এ বছর কাঁঠালও হয়েছিল প্রচুর; তা হুজুর, পাকা কাঁঠাল একটিও যদি বাড়িতে আনতে পারতাম। যে কাঁঠালটি পাকছে, সেইটিই চোরে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। আজ ক'দিনই উপরি উপরি বাগানের কাঁঠাল

চুরি যাচ্ছে। হুজুর! কত চেষ্টা করছি, বাগানে পাহারা দিচ্ছি, কিন্তু চোর আর কিছুতেই ধরতে পারছি না।

বঙ্কিমচন্দ্র—তা আমাকে এখন কি করতে হবে শুনি?

যুবক—হুজুর! আপনাকে আমার কাঁঠাল চোর ধরে দিতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র—তোমরা পাহারা দিয়েও চোর ধরতে পারছ না। আর আমি এখান থেকে গিয়ে কিভাবে চোর ধরে দোব?

যুবক—তা জানি না। আপনাকে চোর ধরে দিতেই হবে। চোর যদি না ধরা পড়ে, অন্তত আমার বাগানের কাঁঠাল চুরি বন্ধ করে দিতে হবে। হুজুর, আপনার রাজত্বে শান্তিতে বাস করতে পারব না; এ কথাই হতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র—তোমার বাড়ি কোথায়?

যুবক—এই তো বারাসতের পাশেই আমার গ্রাম হুজুর! এখান থেকে বড় জোর মাইল দেড়েক।

বঙ্কিমচন্দ্র—আচ্ছা, চল, তোমার সঙ্গে যাই, দেখি কি করতে পারি।

এই বলে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির ভিতরে গিয়ে জামা কাপড় বদলে যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে তার গ্রামে গেলেন। গ্রামে গিয়ে দেখলেন, গ্রামটি একটি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামটি চাষী প্রধান এবং গ্রামের লোকজনও খুবই দরিদ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র যুবকটির গ্রামে গেলে, ঐ গ্রামের চৌকিদার হুজুর এসেছেন শুনে সঙ্গে সঙ্গেই এসে হুজুরকে সেলাম দিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে যখন তার গ্রামে পৌছান, তখনও বেশী বেলা হয় নি। তাই গ্রামের দু একজন কাজে বেরিয়ে গেলেও, গ্রামের অধিকাংশ লোকই তখনও বাড়িতে ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চৌকিদারকে দেখেই গ্রামের সকল পুরুষকেই ডেকে আনতে বললেন।

চৌকিদার হুজুরের আদেশে গ্রামের লোকদের ডাকতে গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুবকটির বাড়িতে গিয়েছিলেন, তার ফাঁকা খামারে একটা চেয়ারে বসেছিলেন।

ক্রমে গ্রামের লোকজন সেখানে আসতে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্র যুবকটিকে বললেন—মাদুর, চট, থলে যা আছে, পেতে এদের বসতে দাও।

যুবকটি তার নিজের বাড়িতে যা ছিল, তাছাড়া আশপাশের বাড়ি থেকেও কিছু চেয়ে এনে খামারে পেতে দিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে গ্রামের লোকজন সেই সবে বসে গেল। যারা বসবার জায়গা পেল না, তাদের কেহ কেহ মাটিতেই যে যার গামছা পেতে বসল, আবার কেহ বা ধূলাতেই বসে পড়ল।

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রামের প্রধান বা মোড়ল কারা, জেনে নিয়ে কেবল নিজের কাছে বসালেন।

এমন সময় চৌকিদার জোড় হাত করে বঙ্কিমচন্দ্রকে বললে—হুজুর, গ্রামের লোকজন যারা বাড়িতে ছিল, তারা সকলেই এসে গেছে। আর কেহ আসতে বাকি নেই।

এবার বঙ্কিমচন্দ্র গ্রামের প্রধানদের তথা সমবেত গ্রামবাসীকেই সম্বোধন করে বললেন—আমি আপনাদের এখানে কেন ডেকেছি এবার শুনুন। আপনাদের গ্রামের এই যার বাড়িতে আমি আজ এসেছি, এর বাগানে রোজই কাঁঠাল চুরি যাচ্ছে। আপনাদের গ্রাম তো দেখছি, খুবই ছোট গ্রাম। আর এর আশে পাশেও কোন গ্রাম নেই। এ একটা সম্পূর্ণ পৃথক গ্রাম। দূরের কোন গ্রামের লোক এসে রোজই এখান থেকে কাঁঠাল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, বলে তো মনে হয় না। আপনাদের গ্রামেরই কেউ না কেউ চুরি করছে। গ্রামের সকল পুরুষকেই আমি ডাকিয়েছি। যে চোর সেও এর মধ্যে রয়েছে। সে যদি স্বীকার করে, তাহলে তাকে কোন শাস্তি না দিয়েই আমি ছেড়ে দোব। শুধু সাবধান করে দিয়ে যাব, আর যেন কোন দিন সে চুরি না করে। এখন সে তার চুরির কথা স্বীকার করুক।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শুনে সকলেই নীরব। কেউ কোন কথা বলল না। একবার এ ওর মুখের দিকে, একবার বঙ্কিমচন্দ্রের মুখের দিকে শুধু তাকাতে লাগল।

বঙ্কিমচন্দ্র আবার বললেন—যে চুরি করেছ, স্বীকার করছ না কেন? কোন ভয় নেই, আমি অভয় দিচ্ছি।

সকলে পূর্ববৎ নীরব রইল।

বঙ্কিমচন্দ্র আবার বললেন—স্বীকার কর, আমি বলছি, কোন ভয় নেই।

সকলে তেমনি নীরব।

বঙ্কিমচন্দ্র এবার সমবেত সকলের দিকে চেয়ে বললেন—যে চোর সে

স্বীকার করছে না বটে, আমি কিন্তু এই সকলের মধ্যেই কাঁঠাল চোরকে ঠিক টের পেয়েছি। চুরির চিহ্ন তার শরীরে এখনও রয়েছে। আমি বলে দিলেই আপনারাও তাকে চিনতে পারবেন। যে কাল কাঁঠাল চুরি করে নিয়ে গেছে, দেখুন, তার মাথায় এখনও কাঁঠালের আটা লেগে রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত প্রায় সকলেই যে যার গলা বাড়িয়ে আশপাশের লোকদের মাথার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

প্রায় সকলেই যখন এইরূপ করতে আরম্ভ করল, তখন কেবল একটি মাত্র লোক, সে তার মাথায় হাত দিয়ে তার চুল পরীক্ষা করতে লাগল। ভাবটা এই যে, সত্যিই তার মাথায় কাঁঠালের আটা লেগে নেই তো?

বঙ্কিমচন্দ্র এই দেখে, সকলকে ছেড়ে দিয়ে ঐ লোকটিকে নিকটে ডাকলেন।

লোকটি ভয়ে ভয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এল। বঙ্কিমচন্দ্র এবার তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে স্বীকার করল যে, সে-ই কাঁঠাল চোর।

উপস্থিত গ্রামবাসীরা এবার কাঁঠাল চোরটির মাথার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। কিন্তু তারা তার মাথায় কাঁঠালের আটার কোন নাম গন্ধই দেখতে পেল না। এখন তারা বুঝল যে, হুজুর কেন তখন আটার কথা বলে ছিলেন। তারা হুজুরের চোর ধরার কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। আর যে যুবকটির কাঁঠাল চুরি যাচ্ছিল, তার তো কথাই নেই! সে এমনি বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল যে, কি বলবে যেন খুঁজেই পাচ্ছিল না। সে হাত জোড় করে বিস্মিতনেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে দাঁড়িয়ে শুধু বললে--হুজুর!

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সঙ্গে চোরকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য চৌকিদারকে আদেশ করলেন।

তারপর তিনি সকলকে বিদায় দিয়ে বারাসতের দিকে রওনা হলেন। চৌকিদারও চোরকে নিয়ে হুজুরের পিছু পিছু চলল।

পরে বিচারে ঐ কাঁঠাল চোরের যথাযথ শাস্তি হয়েছিল।

আখ চোর ধরা

বঙ্কিমচন্দ্র তখন বারাসতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই সময় একদিন সকালে তিনি সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে বৈঠকখানার বাইরের দিককার

বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় একজন চাষী কেঁদে এসে তাঁর পায়ের উপর পড়ল।

বঙ্কিমচন্দ্র চাষীটিকে তুলে কি হয়েছে, জিজ্ঞাসা করলে, চাষীটি কাঁদতে কাঁদতে বললে—হুজুর! আমার এক বিঘা ক্ষেতের সমস্ত আখ রাত্রের মধ্যে কারা কেটে নিয়ে গেছে। কাল সন্ধ্যার সময় আমি ক্ষেত ভর্তি আখ দেখে গেছি. আজ সকালে এসে দেখি একগাছিও নেই।

শুনে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—ক্ষেতের সমস্ত আখই কেটে নিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ হুজুর! একটি আখও পড়ে নেই।

—কারা কেটেছে কিছু জান?

—না হুজুর, তা দেখিনি। তবে···

—তবে কি?

—ক'দিন আগে হুজুর, আমার একটা জমির আল নিয়ে ক'জনের সঙ্গে একটু ঝগড়া হয়েছিল। তারা আমার জমির বাঁধা আলকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তারাই আমার এই সর্বনাশটা করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এবার চাষীটিকে প্রশ্ন করলেন—যাদের সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছিল, তারা কারা? তারা কি তোমার গ্রামের লোক?

চাষীটি বললে—তারা আমাদের একই গ্রামের লোক। তবে অন্য পাড়ার। তারাও আমারই মত চাষী।

—তোমার গ্রাম এখান থেকে কতদূর?

—কাছেই হুজুর, এক মাইলও হবে না।

—আর তোমার আখের জমি?

—বাড়ির কাছেই।

বঙ্কিমচন্দ্র সব শুনে, বারান্দায় যে বেঞ্চি পাতা ছিল, চাষীটিকে তাতে একটু বসতে বলে বাড়ির ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে, চল, বলে চাষীটিকে সঙ্গে নিয়ে, তার গ্রামের দিকে রওনা হলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চাষীকে সঙ্গে নিয়ে তার গ্রামে যাওয়ার সময় তার আখের ক্ষেতটিও একবার দেখে নিলেন। ক্ষেতে গিয়ে আখের গোড়া দেখে বুঝলেন, সত্যই টাটকা কাটা বটে। তারপর তাকে নিয়ে সিধা তার বাড়িতে গেলেন।

হুজুর এসেছেন শুনে গ্রামের চৌকিদার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে ছুটে এসে হুজুরকে সেলাম দিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চাষীকে সঙ্গে নিয়ে যখন তার বাড়িতে যান, গ্রামের অধিকাংশ লোকজনই তখনও যে যার ক্ষেতে-খামারে কাজে বেরিয়ে যায় নি। তারা কাজে বেরোবার জন্য সেই প্রস্তুত হচ্ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চাষীটিকে বললেন—আখ কেটেছে বলে যাদের উপর তোমার সন্দেহ হচ্ছে, তাদের নাম বল।

চাষীটি নাম বললে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই সব লোককে ডেকে আনবার জন্য চৌকিদারকে বললেন। তিনি চৌকিদারকে আরও বলে দিলেন, তাদের যে যার কাস্তে সহ নিয়ে আসবে।

চৌকিদার হুজুরের আদেশে তাদের ডাকতে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চৌকিদার যে যার কাস্তেসহ লোকগুলিকে এনে হাজির করল।

লোকগুলি এলে বঙ্কিমচন্দ্র কাস্তেগুলোকে একধারে রাখতে বলে তাদের অন্য একটা জায়গায় সকলকে বসতে বললেন।

তারা যথাযথ আদেশ পালন করল।

বঙ্কিমচন্দ্র এবার চৌকিদারকে বললেন—গ্রামের প্রধানদের অর্থাৎ মোড়ল-দের ডেকে নিয়ে এস।

চৌকিদার আবার প্রধানদের ডাকতে গেল।

রাত্রে আখ কেটেছে কিনা, বঙ্কিমচন্দ্র লোকগুলিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা সকলেই একবাক্যে বললে—হুজুর, আমরা আখ কাটিনি। আমরা ওর আখের কথা কিছুই জানি না।

বঙ্কিমচন্দ্র, লোকগুলি আগের দিনে কে কি কাজ করেছে, তারও খোঁজ নিলেন।

তারা প্রত্যেকেই তাদের আগের দিনের যে যার কাজের হিসাব দিল। তারা নিজ নিজ কাজের যে হিসাব দিল. তাতে কিন্তু আগের দিন কেহ কোথাও আখ কেটেছে, এ কথা বলল না।

কিছুক্ষণ পরে গ্রামের প্রধানরাও এসে গেল।

প্রধানরা সকলে এলে চৌকিদার হাত জোড় করে বঙ্কিমচন্দ্রকে বললে—হুজুর, প্রধানরা সকলেই এসে গেছেন, আর কেহ বাকি নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র এবার প্রধানদের বললেন—আপনাদের কেন ডেকেছি শুনুন। যে চাষীটির বাড়িতে আমি এসেছি, এর ক্ষেতের আখ কারা আজ রাত্রে কেটে

নিয়ে গেছে। আমি আসবার সময় এর ক্ষেতে কাটা আখের গোড়াগুলো দেখে এসেছি। সত্যই রাত্রেরই কাটা। আপনাদের গ্রামেরই কয়েক জনের উপর এই চাষীটির সন্দেহ হয়েছে। এই তাদেরও ডাকিয়ে এনেছি। এদের সকলকেই আপনারা নিশ্চয়ই চেনেন। আখ চুরি করেছে কিনা এদের জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে এরা বললে—আখের খবর এরা কিছুই জানে না। তারপর এরা কাল কে কি কাজ করেছে, জিজ্ঞাসা করলাম। সকলেই যে যার কাজের ফিরিস্তি দিল, কিন্তু কেহ যে এদের নিজেদেরও আখ কেটেছে, তাও বললে না। এদের আমি যে যার কাস্তে সহ ডাকিয়ে আনাই। এরা এলে এদের কাস্তে-গুলো ঐ একধারে রাখতে বলি। এরা তাই রাখে। এরা যতই বলুক, আখ চুরি করিনি। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এরাই আখ চুরি করেছে। এরা রাত্রে আখ কেটে, সেই কাস্তেই অমনি রেখে দিয়েছিল। সেই কাস্তের এখনও অন্য কাজ করবার এরা সুযোগ পায় নি। তাই এই কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ দেখুন, কাস্তেগুলোয় পিঁপড়ে ধরেছে। এরা যদি রাত্রে আখ না কাটবে তো এদের কাস্তেয় পিঁপড়ে ধরবে কেন? আপনারা কি বলেন? আপনাদের মত কি?

প্রধানরা আর বলবে কি? কাস্তে আনিয়ে এই ভাবে হুজুরের চোর ধরবার কৌশল দেখে তারা তো প্রথমে বিস্ময়ে হকবাক্ হয়ে গেল। তারপর তারা সকলেই একবাক্যে হুজুরের সঙ্গে একমত হ'ল।

পরে আখ চোরেরাও তাদের অপরাধ স্বীকার করল।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে সেই আখ চোরদের বারাসতে নিয়ে এলেন।

পরে বিচারে তাদের সকলেরই শাস্তি হয়েছিল।

বাকি খাজনার নিষ্পত্তির বিচার

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এজলাসের কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ব্যাপারে নিরপেক্ষ-ভাবে নিজে যা ভাল বুঝতেন, তাই করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর উপরওয়ালা-দের নির্দেশে তিনি কখনো চালিত হতেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা কমিশনার সাহেব তাঁকে কোন নির্দেশ দিলে, তিনি যদি বুঝতেন যে, ঐ

নির্দেশ যুক্তিযুক্ত বা ন্যায়সঙ্গত নয়, তাহলে তিনি নিঃসঙ্কোচেই সে কথায় আদৌ কান দিতেন না। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত কাজ করতেন।

বহরমপুরে থাকাকালে একবার তিনি কমিশনার সাহেবের নির্দেশ লঙ্ঘন করে কিভাবে কয়েকটি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেছিলেন, এখন সেই কাহিনীটি বলছি—

কতকগুলি বাকি খাজনার নিষ্পত্তির বিচারের ভার পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর। এই মোকদ্দমাগুলি অনেকদিন থেকেই পড়ে ছিল। মোকদ্দমাগুলির বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষই ধনী ব্যক্তি ছিলেন। এঁদের একপক্ষে উকিল ছিলেন, বহরমপুরের বিখ্যাত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, আর অপর পক্ষে ছিলেন স্বনামধন্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাসবাবু তখন বহরমপুর কোর্টে ওকালতি করতেন এবং ওখানকার ল কলেজে অধ্যাপনাও করতেন।

মোকদ্দমার দিনে মোকদ্দমাগুলি মিটমাটের অভিপ্রায়ে উভয় পক্ষের উকিলই মোকদ্দমা মুলতুবী রাখবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আবেদন করলেন এবং আর একটা দিন চাইলেন।

মোকদ্দমাগুলির একটা মিটমাট হয়ে যাক, বঙ্কিমচন্দ্র এইটাই চাইছিলেন।

মিটমাটের ব্যাপারে উভয় পক্ষের উকিলেরই যথেষ্ট আগ্রহ আছে, দেখে, বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করলেন।

মোকদ্দমার দিন আবার এসে গেল।

ইতিমধ্যে কিন্তু মিটমাট হয়ে উঠল না। তবে মিটমাট না হলেও মিটমাটের জন্য উভয় পক্ষের আগ্রহ কিন্তু সমানই ছিল। তাই এবারেও উভয় পক্ষের উকিলই আবার সময় চাইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, মোকদ্দমাগুলির মিটমাট হয়নি বটে, তবে মিটমাটের জন্য তাঁদের আগ্রহ যথেষ্টই রয়েছে।

তিনি উকিলদের এবাবের আবেদন পত্র পেয়ে বললেন—আপনাদের সময় দিতে আমার আদৌ আপত্তি নেই। কিন্তু কমিশনার সাহেবের ভীষণ আপত্তি। আগের বারেই আপনাদের সময় দেওয়াতে আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে গেছেন। এমন কি আমাকে ভয়ও দেখিয়েছেন। তা যাকৃগে, যতই ভয় দেখান, ওতে আমি ভয় করি না। এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিচারের ভার যখন আমার উপর, তখন আমি যা ভাল বুঝব, তাই করব। আমি আপনাদের আবার সময় দিলাম।—এই বলে তিনি তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করলেন।

আবগারী মোকদ্দমার বিচার

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় বার আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আসেন। ঐ সময় আলিপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন বেকার সাহেব। বেকার সাহেব তখন যুবক।

আলিপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে একদিন একটি মোকদ্দমা হয়। সামান্য আবগারী কেসের মোকদ্দমা। মোকদ্দমা আবগারী বিভাগ থেকেই প্রেরিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষ্য প্রমাণে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। অর্থদণ্ড সামান্য হয়েছিল। বোধ হয় কুড়ি পঁচিশ টাকা হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই মোকদ্দমার রায় দেবার কিছু পরেই ম্যাজিষ্ট্রেট বেকার সাহেব এসে কাগজপত্র দেখতে চাইলেন। কেননা, বেকার সাহেব চেয়েছিলেন, আসামীর যেন ভাল রকম শাস্তি হয়। রায় দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, জরিমানার টাকা কম হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেটকে বললেন—দণ্ড ঠিক হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। আসামী অত্যন্ত দরিদ্র। এই টাকা দিতেই ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বললেন—অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড হওয়া উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন উত্তরে বললেন—সে আমি জানি এবং জেনেই বিচার করেছি। আপনি আমাকে বলবেন কি? স্যার, আমি যখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরিতে ঢুকি, তখন আপনি দোলনায় দোল খেতেন।

বেকার সাহেব অত্যন্ত উদার হৃদয় মানুষ ছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা শুনে কোনরূপ রাগ না করে হো হো করে হেসে উঠলেন এবং হাত তালি দিতে দিতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

জনপ্রিয় বিচারক

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু নিরপেক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ বিচারকই ছিলেন না, একজন সুদক্ষ বিচারকও ছিলেন। তাঁর এই সব গুণের জন্য গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছায় তাঁকে রায় বাহাদুর এবং সি. আই. ই. উপাধি দিয়েছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ছাড়াও,

তিনি যখনই যেখানে গেছেন, সেখানকার উকিল-মোক্তার, আমলা এবং জনসাধারণের কাছ থেকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা পেয়েছেন। এমন কি, তাঁর উপর-ওয়ালা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার এবং জজেরা পর্যন্তও তাঁকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই জনপ্রিয়তার উদাহরণ হিসাবে তাঁর বহরমপুরে থাকার সময়কার দু একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি—

একদিন শীতের অপরাহ্নে কোর্টের ছুটির পর বঙ্কিমচন্দ্র পাল্কীতে করে বাসায় ফিরছেন। তাঁর বাসা থেকে কোর্টে যাওয়ার যেটা আসল পথ, সেই পথে গেলে একটু দূর হয় বলে, গোরা ব্যারাকের মাঠের সামনের পথটা দিয়েই তিনি যাতায়াত করতেন। দূরত্ব সংক্ষেপ করবার জন্য সাধারণেও ঐ পথেই যাতায়াত করত।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন গোরা ব্যারাকের মাঠের সামনে দিয়ে ফিরছিলেন, সেই সময় কয়েকজন গোরা সেই মাঠে ক্রিকেট খেলছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পাল্কীর একদিকের দরজা খোলা ছিল, আর একদিকের দরজা বন্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আসছেন, এমন সময় ঐ সেনাদলের অধ্যক্ষ কর্ণেল ডফিন, কার পাল্কী কিছু না জেনেই, পাল্কার বন্ধ দরজায় জোরে করাঘাত করতে লাগলেন। শব্দ শুনেই বঙ্কিমচন্দ্র দরজা খুলে পাল্কী থেকে লাফিয়ে নীচে নামলেন। নেমে সামনেই ডফিনকে দেখে রাগে ইংরাজিতে—কে রে তুই বর্বর—বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

ডফিন কোন উত্তর না দিয়ে সবলে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে তাঁকে সরিয়ে দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন মাঠের দিকে এগিয়ে ক্রীড়ারত সাহেবদের কাছে গেলেন। গিয়ে একজনকে ইংরাজিতে প্রশ্ন করলেন—ঐ লোকটা আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলে দেখলেন ?

গোরা সাহেব উত্তরে বললে—বাবু, আমি চোখে একটু কম দেখি, তাই কিছু দেখতে পাই নি।

বঙ্কিমচন্দ্র অন্যদের জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন ?

গোরারা কেহই বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনত না, তাই সকলেই বললে—না, আমরা কেহই কিছুই দেখি নি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাদের তখন শুধু বললেন—আচ্ছা, কোর্টে গিয়ে এই কথাই বলবেন।—এই বলে তিনি সেখান থেকে চলে এলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আত্ম-সম্মান বোধ ছিল অত্যন্ত তীব্র। সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল

ডফিন তাঁর প্রতি যে অসম্মানজনক ব্যবহার করেছেন, তার প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি পরদিনই কোর্টে গিয়ে কর্ণেল ডফিনের নামে এক মানহানির মামলা রুজু করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মামলা রুজু করলে, বহরমপুর কোর্টের তখনকার প্রায় দেড়শ' উকিল-মোক্তার সকলেই স্বেচ্ছায় বঙ্কিমচন্দ্রের ওকালতনামায় দস্তখত করলেন।

ডফিন মামলা চালাতে গিয়ে কোনও উকিল-মোক্তার পেলেন না। তিনি যাঁর কাছে যান, তিনিই বলেন—আমি বঙ্কিমবাবুর পক্ষে দাঁড়িয়েছি।

ডফিনের অবস্থা দেখে কমিশনার সাহেব ছুটে এলেন। তিনি মামলা মিটিয়ে দেবার জন্য ডিস্ট্রিক্ট জজ ব্রেন্‌ব্রিজ সাহেবকে অনুরোধ করলেন। ব্রেন্-ব্রিজ সাহেব কমিশনারকে বললেন—ডফিন যদি তাঁর কৃতকর্মের জন্য বঙ্কিম-বাবুর কাছে ক্ষমা চান, তাহলে আমি মধ্যস্থতা করতে পারি।

ডফিন ক্ষমা চাইতে রাজী হলেন। তখন প্রকাশ্য আদালতে ডফিন বঙ্কিম-চন্দ্রের হাত ধরে ক্ষমা চাইলেন। সেদিন এই দৃশ্য দেখবার জন্য কোর্টে লোক ভেঙ্গে পড়েছিল। ডফিন বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে সেদিন বলেছিলেন—বঙ্কিম-বাবু, আপনার যে হাত ধরে আপনাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম, আপনার সেই হাত ধরে আমি ক্ষমা চাইছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র ডফিনকে ক্ষমা করে মামলা মিটিয়ে নিয়ে ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় চার বছর বহরমপুরে ছিলেন। বহরমপুরের জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। তাই অন্যত্র বদলি হতে চাইছিলেন। একথা শুনেই, বহরমপুর যাতে তিনি না ছাড়েন, সেজন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় দেড়শ' অনুরোধ পত্র এল। ম্যাজিস্ট্রেট এবং কমিশনার সাহেবও বঙ্কিম-চন্দ্রকে ছাড়তে রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন—তুমি স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য যতদিন ইচ্ছা ছুটি নাও, কিন্তু বহরমপুর থেকে অন্যত্র বদলি হতে পারবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র, অবশেষে ছোটলাটের অফিসের সেক্রেটারী ডামপেয়ার সাহেবের কাছে বদলি হওয়ার জন্য দরখাস্ত করে, দরখাস্ত মঞ্জুর করালেন।

কমিশনার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং বহরমপুরের জনসাধারণ যখন বঙ্কিম-চন্দ্রকে আর আটকাতে পারলেন না, তখন তাঁরা মহা আড়ম্বর করে বঙ্কিম-চন্দ্রকে এক বিদায় সম্বর্ধনা দিলেন। এজন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা তুলেছিলেন এবং সাতদিন ধরে কাঙ্গালী ভোজন, বাজী পোড়ান ইত্যাদি করে এই বিদায় সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান করেছিলেন।

সাহিত্য-সাধনা

যতদূর জানা গেছে, তাতে দেখা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত একটি কবিতাই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন ১৩ বৎসর ৮ মাস।

কবিতাটি ১৮৫২র ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হলেও অনুমান হয়, এই কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার অন্তত দু এক মাস আগেই তিনি এটি রচনা করেছিলেন। তা না হয়ে, যদি লিখে সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলেও এটা অনুমান করা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র এর অন্তত কয়েক মাস আগে থেকেই লিখতে শুরু করেছিলেন। অতএব দাঁড়াচ্ছে এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ১৩ বছর বয়সের আরম্ভ থেকেই সাহিত্য-সাধনা শুরু করেছিলেন।

৫৫ বৎসর ৯ মাস বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর এক মাস আগে ১৮৯৪ এর মার্চ মাসে তিনি ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে 'Vedic Literature' নামে একটা ইংরাজি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ ঐ ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটেই ফেব্রুয়ারি মাসে পাঠ করেন।

দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সময় সীমা ছিল প্রায় ৪২½ বছর। এই সময়ের মধ্যে অবশ্য তিনি কখন একটানা, কখন বা সাময়িক ছেদ দিয়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন।

এখন এই দীর্ঘ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ সময়ে কি রচনা করেছেন, কিছু কিছু প্রসঙ্গ কথাসহ তার একটা তালিকা দেবার চেষ্টা করছি—

বাল্য-রচনা—

২৫. ২. ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি ছিল স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের মধ্যে প্রশ্নোত্তর মূলক একটি কবিতা। স্ত্রী প্রশ্ন করছে, স্বামী উত্তর দিচ্ছে। যেমন—ঐ কবিতার কিছু উদ্ধৃত করছি—

স্ত্রীং। কহ না কি হেতু কান্ত, শশী অস্তে চলে॥
পুং। তব মুখে মূক হোয়ে, চলে অস্তাচলে॥
স্ত্রীং। দশদিগ্ কেন প্রাণ, প্রকাশিত হয়।
পুং। তব মুখ আলোকেতে, হয় প্রভাময়॥
স্ত্রীং। কি হেতু কোকিলকুল, কুহু কুহু করে।
পুং। তোমার মধুর স্বর, পাইবার তরে॥

কবিতাটি 'সংবাদ প্রভাকরে' পাঠিয়ে লেখক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র কবিতার নীচে নাম দিয়েছিলেন—শ্রী ব. চ. চ.।

ঈশ্বর গুপ্ত কবিতাটি ছাপবার সময় কবিতার মাথায় লিখে দিয়েছিলেন—'হুগলী কালেজস্থ ছাত্রের লিখিত পদ্য অবিকল নিম্নভাগে প্রকটিত হইল।' আর কবিতার শেষে মন্তব্য হিসাবে লিখেছিলেন—'উক্ত ছাত্রের বয়স অত্যল্প, কিন্তু এই পদ্য অতি প্রবীণ কবির রচনার ন্যায় উত্তমরূপে রচিত হয়েছে। এজন্য সকলেই তাঁকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন। প্রং সম্পাদক।'

সংবাদ প্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্রের এই কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার তিন দিন পরে, অর্থাৎ ২৮-২-১৮৫২ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিরলে বাস' নামে আব একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি ছাপার সময় কয়েকটি মারাত্মক মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ভুলগুলি দেখিয়ে কবিতাটি সংশোধিত আকারে পুনরায় ছাপবার জন্য সমাচার দর্পণ সম্পাদককে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু সম্পাদক ভুল সংশোধন করে আর না ছাপায়, বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কবিতাটির ভুলগুলি সংশোধন করে 'সংবাদ-প্রভাকরে' একটি চিঠি দেন। সেটি ১০-৩-১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মুদ্রিত চিঠি সমূহের মধ্যে এই চিঠিটিই প্রথম। এটিকে এক দিক থেকে তাঁর লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্যও বলা যেতে পারে। সেই চিঠিটি এই—

শ্রীযুত প্রভাকর-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মেতৎ অত্র অকিঞ্চন মূঢ়তা প্রযুক্ত তল্লিখিত পত্রে প্রেরিত পত্রাদি অপ্রকাশ বিষয়ে কিঞ্চিৎ রূঢ়ভাষা প্রয়োগ হইয়াছিল, এইক্ষণে কৃতাপরাধী দয়াবীর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। পত্র প্রকাশেই সন্তুষ্ট থাকিবেক।

সংপ্রতি সমাচার দর্পণ সম্পাদক মহাশয় আমার বিস্তর হানি করিয়াছেন।

মহাশয়ের আশ্রয়ে তদ্বিপক্ষে লেখনী ধারণ করিতেছি, অনুকম্পা সম্পাদনে আশ্রয় প্রদান করিবেন, অর্থাৎ নিম্নলিখিত বিষয় প্রভাকরে প্রকটনে পরম বাধিত করিবেন।

দর্পণ।

'দর্পণ পারা-হারা হইলে'

কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সুন্দররূপে দৃষ্ট হয় না।

'শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'*

(* My own name.)

অস্মন্নাম ইত্যাঙ্কিত মৎকরণক অনুবাদিত বিষয় ৪৪ সংখ্যক দর্পণে প্রকটিত হইয়াছিল। সম্পাদক সাহেবের সংশোধনের গুণেই হউক বা মুদ্রাঙ্কণের দোষেই হউক, সেই অনুবাদের উল্টা শ্রী হইয়াছে, তাহা পাঠ মাত্র দন্তে কপাট লাগিবেক, আর অন্য পাঠ থাকিবেক না।

দর্পণের ৩৫২ পৃষ্ঠায় চতুর্থ স্তম্ভে তাহার প্রথম চরণ নিম্ন প্রকার প্রকাশ হইয়াছে।

বিষয়ে রিক্ত হয়া, স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে।

সম্পাদক মহাশয় আপনী ও পাঠকগণ সুপণ্ডিত বটেন, ইহার অর্থ কি বলিতে পারি না, আপনারা কহিবেন যে ইহা প্রকৃত nonsense. আরো ত্রয়োদশ অক্ষরে পয়ার কখন শুনিয়াছেন? আমি প্রথম চরণে লিখিয়াছিলাম—

বিষয়ে বিরক্ত হয়ে, স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে।

কিসে কি হইয়াছে 'দেব গঠিতে বানর হইয়াছে।' অপিচ নবম পংক্তিতে।

অভিমানেতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়।

ত্রয়োদশাক্ষরে পয়ার। আরো honour অর্থ কি অভিমান। এবং অভিমানে কি প্রশংসা জন্মায়? আমি লিখিয়াছিলাম।

তুচ্ছমান হতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়।

ভাল। ভাল।

অন্যান্য সামান্য দোষের তালিকা ৪ পংক্তিতে 'মহাপ্রেম' পরিবর্তে 'নিত্যপ্রেম' হইবেক।

১০ পংক্তিতে 'মলয়াতে' 'মলয়জে' হইবেক। ১১ পংক্তিতে 'পুষ্প' পরিবর্তে 'পুষ্পে' হইবেক। ..

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিঠিটি ২৮শে ফাল্গুন ১২৫৮ (১০ই মার্চ ১৮৫২) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করে ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করেন।

চিঠিটি আজও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এই চিঠিটি থেকেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা গদ্য রচনার একটা নমুনা পাওয়া যায়।

এরপর দু বছর ধরে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকরে' এবং তাঁর 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় আরও অনেকগুলি কবিতা (কবিতায় দুটি নাটকসহ) এবং কয়েকটি গদ্য রচনা প্রকাশ করেন। কবিতা-গুলির বেশ কয়েকটি ঋতুবর্ণনা ও প্রশ্নোত্তরমূলক।

শচীশ চট্টোপাধ্যায়ই সর্ব প্রথম তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাল্য-রচনার কিছু সংগ্রহ করে দিয়ে যান। এর অনেক পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, শচীশবাবুর ঐ সংগ্রহ-গুলি সহ বঙ্কিমচন্দ্রের আরও যত বাল্য-রচনা সংগ্রহ করতে পেরেছেন, সমস্ত একত্র করে তাঁদের সম্পাদিত বঙ্কিম-রচনাবলীর বিবিধ খণ্ডে 'বাল্য-রচনা' অংশে দিয়ে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাল্য-রচনাগুলির মধ্যে কবিতাগুলি পাঠোপযোগী হলেও তাঁর তখনকার গদ্য রচনাগুলি মোটেই পাঠোপযোগী ছিল না। তার সেই গদ্য যে কিরূপ বিষম ও দুর্বোধ্য ছিল, এখানে তার একটু নমুনা দিচ্ছি—

বর্ষাঋতু

স্বনাথ শশধর বিরহিণী বিঘোর তমসাম্বরাবৃতা গভীরা নিশীথিনী সঙ্কাশ নিবিড় জলধারমাল গগন মণ্ডলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি। মন্মথোন্মথিত জনরাজী হৃদয় বিদারক ঘোরঘন নির্ঘোষ নিনাদ শ্রবণে চমকিতচিত্ত চাপল্য প্রাপ্ত হইতেছে।...

এই রচনাটি ১০ই জুলাই ১৮৫২ তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখার সঙ্গে লেখক হিসাবে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাম এবং ঐ সঙ্গে ঠিকানা হিসাবে হুগলী কলেজও ছিল।

দেখা যাচ্ছে, হুগলী কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-রচনার সূত্রপাত। তাই এই প্রসঙ্গে হুগলী কলেজ কর্তৃপক্ষেরও তখন বাংলা ভাষার প্রতি কিরূপ মনোভাব ছিল, সেটাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

হুগলী কলেজের পত্তনের (১৮৩৬) সময় থেকেই কলেজ কর্তৃপক্ষ শুধু ইংরাজির উপরেই নয়, ছাত্ররা যাতে ইংরাজি প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাদের মাতৃভাষা বাংলাও ভালভাবে শিখতে পারে, সেদিকেও নজর রেখে ছিলেন। এজন্য তাঁরা কলেজে ভাল ভাল পণ্ডিতও নিয়োগ করেছিলেন। পণ্ডিত মশায়রা ছাত্রদের বাংলা পড়াতেন, বাংলা রচনাও লেখাতেন।

হুগলী কলেজের ছাত্র হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র একবার ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে পুরস্কার লাভ করলে, কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জে. কার সাহেব অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। তিনি এত খুশী হয়েছিলেন যে, এই বিষয়টা শিক্ষা বিভাগের ঊর্দ্ধতন মহলেও চিঠি লিখে জানিয়ে ছিলেন। তাঁর সেই চিঠিটা এই—

To the Secy, to the Council of Education, Fort William.

Hooghly, the 20th Feb. 1854

Sir,

I have the honour to report for the information of the Council of Education that I have received twenty rupees to be awarded to Bankim Chunder Chatterjee, a pupil of the first class of the Senior School, for some good poetical compositions in Bengalee. The poetical compositions appeared in the Provakur Newspaper. The prize of twenty rupees was awarded by Baboos Romonymohun Roy and Kally churn Roy Chowdhury Zemindars of Rungpore and was sent through Baboo Isser Chunder Goopto the Editor of the abovementioned Journal.

J. Kerr
Principal

সংবাদ প্রভাকরের যে কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগদান করে বঙ্কিমচন্দ্র এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন, সেই প্রতিযোগিতার কথা এখন এখানে কিছু বলছি—

কবিতা প্রতিযোগিতায় কবিতা রচনার জন্য সম্পাদক কোন বিষয় নির্দিষ্ট

করে দিতেন না। যে যার ইচ্ছামত বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করতে পারতেন। প্রতিযোগীদের কবিতা প্রভাকরে ছাপার পর সম্পাদক পাঠকদের মতামত আহ্বান করতেন।

এবারের কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন, হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র (পরবর্তীকালের বিখ্যাত নাট্যকার), কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী (এই শক্তিমান কবির কাব্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই অকালে মৃত্যু ঘটে) এবং বঙ্কিমচন্দ্র।

দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা 'দম্পতি প্রণয়' ১২৬৯ সালের ২রা ও ৩রা চৈত্রের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হ'ল। ৭ঠা ও ৫ই চৈত্র প্রকাশিত হল দ্বারকানাথ অধিকারীর কবিতা 'সত্যবতীর সহিত পাপিণীর দ্বন্দ্ব'। আর ৬ই চৈত্র প্রকাশিত হল বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা—'কামিনীর প্রতি উক্তি'—তোমাতে লো ষড়রিপু।

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশ করে ঐ ৬ তারিখেই ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সংবাদ প্রভাকরে এই আবেদনটি প্রকাশ করেন—

'হিন্দু ও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রের রচনা পূর্বে প্রকাশ হইয়াছে। অদ্য হুগলী কলেজের ছাত্রের লেখা সর্বসাধারণের দৃষ্টি পথে অর্পণ করিলাম। আমারদিগের সহযোগীগণ এবং পাঠক মহাশয়েরা যথাযোগ্য মনোযোগ পূর্বক পাঠ করত আপন'পন স্বরূপাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কবি ভ্রাতাদিগের কবিত্ব ও রচনা ঘটিত পরিশ্রম এবং গুণের পারিতোষিক প্রদান করুন। আমরা এ বিষয়ে অগ্রে কোন কথা উল্লেখ করিব না, তাহা পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং এইক্ষণেও করিতেছি। বিদ্যানুরাগী দেশহিতাথি বিজ্ঞজনেরা যেরূপ অভিমত ব্যক্ত করিবেন, আমরা তদনুসারে আনন্দ প্রকাশ করিব।'

বঙ্কিমচন্দ্রের পুরস্কার পাওয়া 'কামিনীর প্রতি উক্তি' কবিতাটি একটু দীর্ঘ। তাই এখানে আর উদ্ধৃত করলাম না। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্কিম-রচনাবলীর বিবিধ খণ্ডে এবং যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত বঙ্কিম-রচনাবলীর ২য় খণ্ড থেকে পড়ে নিতে পারেন।

ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পত্রিকায় শুধু কবিতার প্রতিযোগিতাই নয়; দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন কলেজের ছাত্র-কবির মধ্যে কবিতার লড়াই

বা কবিতার যুদ্ধও লাগাতেন। এঁদের এই কবিতা যুদ্ধ সেকালে 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' নামে খ্যাত হয়েছিল।

এক্ষেত্রেও সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা যুদ্ধের জন্য কবিতা লেখা নিয়ে কোন বিষয় ঠিক করে দিতেন না। কবিরা নিজ নিজ ইচ্ছা মত বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করে সেই কবিতার মাধ্যমেই আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চালাতেন।

এই তিন কবির পরস্পরের মধ্যে তখন সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। কবিতার মধ্য দিয়েই একে অপরকে চিনতেন।

এবার সেই কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ কেমন ছিল, তার উদাহরণ দিচ্ছি—

১২৬০ সালের ২৪শে বৈশাখ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দ্বারকানাথ অধিকারীব 'অদ্ভুত স্বপ্ন' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ঐ কবিতার ভূমিকায় দ্বারকানাথ লিখেছিলেন—

'আমি এক দিবস কোন বিখ্যাত নব্য কবিদ্বয়ের বিরচিত কাব্যের অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষতা নির্বাচন করিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহার দিগের প্রণীত দুইটি প্রবন্ধ সাদরে লইয়া পাঠ করিতেছিলাম। কিন্তু কে কোন্ বিষয়ে উত্তম কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবিলম্বেই নিদ্রাদেবীর আশ্রয় লইলাম। কিয়ৎপরে স্বপ্নাদেবী এক সুরূপসী নারী আমাকে মোহিত করিয়া তাহার সঙ্গে লইয়া চলিল। আমি বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হওত একটা সরোবরের সমীপস্থ কতকগুলিন বেনা বনের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছিলাম। ইত্যবসরে এক অদ্ভুত ব্যাপার আমার নয়ন গোচর হইল।'

এক সরোবর তীরে ছদ্মবেশী সরস্বতীর সঙ্গে মিত্র কবি ও কবি বঙ্কিমেব সাক্ষাৎ হয়। দ্বারকানাথ লিখছেন—

* * * *

তাঁদের বিনয়ে দেবী হরিষ অন্তর।
উপদেশ করি শেষ, দেন এই বর ॥
আদি কবি আদি রসে অদ্বিতীয় হবে।
সতত তাহার ভাব, বঙ্কিমেতে রবে ॥
দ্বিতীয় সরল ভাষ করি ব্যবহার।
নিজগুণে হইবেক মিত্র সবাকার ॥
এত বলি বাগদেবী গেলেন ভবনে।
অভিমান পরবশে কহিলাম মনে ॥

বর পেয়ে উভয়ের পূর্ণ হ'ল আশ
আমার কপালে মাত্র বেনাবনে বাস ।।

পরবর্তী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দীনবন্ধু মিত্র 'সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয় এবং কবিতা পরিমাণের দোষ' কবিতায় দ্বারকানাথের অদ্ভুত স্বপ্নের উত্তর দিলেন। তিনি লিখলেন—

ব্যানা বনে বাস তব, বুনো কবি নাম।
বিলাতী তালের গাছ, ভাব দেখে থাম ।।
আঁখি মূদে ভাব গিয়ে, আপনার স্থানে।
কেন চেয়ে কানা হও, বিভাকর পানে ।।

এরপর ঐ বছরই ১১ই শ্রাবণের 'সংবাদ প্রভাকরে' দ্বারকানাথের আর একটি কবিতা প্রকাশিত হল। তাতে তিনি লেখেন, সরস্বতী পুনর্বার সরোবর তীরে এসেছেন। এসে দ্বারকানাথকে জিজ্ঞাসা করছেন—

জান জান কোথা থাকে মিত্র কবিবর ।।
বুনো কবি বলে তাহা জানিব কেমনে।
থাকেন শহরে তিনি, আমি বেনাবনে ।।

২৬শে শ্রাবণের 'সংবাদ প্রভাকরে' দীনবন্ধু 'চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিই' কবিতায় দ্বারকানাথের ঐ কবিতার উত্তর দেন।

বঙ্কিম, দ্বারকানাথের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও এতদিন কোন উত্তর দেন নি। শেষে ১২ই আশ্বিন (১২৬০) তারিখে সংবাদ প্রভাকরে 'বিষম বিচিত্র নাটক' নামে একটি কবিতা লিখে দ্বারকানাথের আক্রমণের উত্তর দেন।

বঙ্কিম এই কবিতা রচনার ভূমিকা বা কৈফিয়ৎ হিসাবে কবিতার প্রথমে লিখেছিলেন—

শুনিতে পাই প্রভাকরে নাকি দুটো বীর আসিয়া বড় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। একটি নাকি আবার আশে পাশে কামড় মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেশ আমিও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম ঠুকিয়া যাই, কিন্তু নীজে বীর নহি, যুদ্ধ করিব না, চড়টা চাপড়টা মারামারিই ভাল।

বঙ্কিম তাঁর এই কবিতায় বেশ চড়া ভাবেই দ্বারকানাথকে আক্রমণ করেন। কবিতাটি খুবই দীর্ঘ। পাঠক-পাঠিকারা বঙ্কিম-রচনাবলী থেকে পড়ে নেবেন।

বঙ্কিমের কবিতা প্রকাশিত হলে দ্বারকানাথ এবার একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশ করে, তাতে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব কামনা করলেন।

দ্বারকানাথকে সমর্থন করেই দীনবন্ধু আর একটি কবিতা প্রকাশ করলেন। বঙ্কিম আর এধারে এলেন না।

শেষে ১৯শে মাঘ (১২৬০) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে দ্বারকানাথ 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের সন্ধিপাত্র' লিখে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। তিনি লিখলেন—

'আমি রাগান্ধ হইয়া প্রথমত পবিত্র মিত্রদ্বয়ের সহিত বাক্‌বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি। এই ঘৃণিত বিবাদের সূত্রপাত আমা হইতেই হয়, এজন্য আমি ইহাতে সম্পূর্ণ দোষী, তাহা স্বীকার করিয়া উক্ত কবি ভ্রাতা-দ্বয়ের বিশেষত মিত্রমিত্রের নিকট মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি। আমরা কবিতা বিষয়ে তিনজনে একজনের শিষ্য। ইহাতে পরস্পরে কলহ করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যাহা হউক আমি আপনাদিগের মিত্রতা লাভের নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইয়া এই সন্ধিপত্র প্রেরণ করিতেছি, মহাশয়েরা কৃপা বিতরণ পূর্বক এ দীন অপরাধীর দোষ সকল মার্জনা করত প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইয়া পরম বাধিত করিবেন।'

সংবাদ প্রভাকরে এইখানেই কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের শেষ।

ঈশ্বর গুপ্ত ঐ তিন কবিকে কবিতা যুদ্ধে যেমন উৎসাহ দিতেন, তেমনি তখনকার সাহিত্যিক মহল এবং পাঠক মহলও প্রবল আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সহ-কারে এতে প্রচুর মজা উপভোগ করতেন।

হুগলী কলেজে পড়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্র কবিতা ও গদ্য রচনা ছাড়া গানও রচনা করতেন। তাঁর একটি গান রচনা সম্বন্ধে তাঁর ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—১৪।১৫ বছর বয়সের সময় বঙ্কিমচন্দ্ররা চার ভাই মিলে একবার দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন নৌকায় করে ফরাসডাঙ্গায় বিসর্জন দেখতে গিয়ে ছিলেন। ফেরার সময় গঙ্গার পূর্ব তীরে এক শ্মশানে একটি জ্বলন্ত চিতার পাশে এক সদ্য বিধবাকে দেখে বঙ্কিমচন্দ্রদের সকলেরই চোখে জল আসে; বঙ্কিমচন্দ্র তখন সঙ্গে সঙ্গে একটি গান রচনা করে পূর্ণচন্দ্রকে শুনিয়ে ছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র লিখছেন—'কিছুদিন ঐ গানটি মল্লার রাগিনীতে প্রচলিত ছিল, পরে লুপ্ত হইয়া যায়। গানটির প্রথমাংশ আমার মনে আছে। আর নাই। যথা—'হারালে পর পায় কি ফিরে মণি—কি ফণিনী কি রমণী?'

এই হুগলী কলেজের ছাত্র-জীবনেই বঙ্কিমচন্দ্র 'ললিতা' এবং 'মানস' নামে

দুটি দীর্ঘ কবিতা লিখে সেই দুটিকে একত্র করে একটি বই করেছিলেন। সেই বইয়ের নাম দিয়েছিলেন—'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস।'

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪১। তিনি এটি ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বছর হুগলী কলেজ ছেড়ে দেন। এইটিই বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। এই বইয়ের বিজ্ঞাপনে বা ভূমিকায় তিনি তখন লিখেছিলেন—'...তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন।...এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণসমীপবর্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল।'

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দেও কিরূপ গদ্য লিখতেন, এই 'ভূমিকা'টি থেকেও তার পরিচয় পাওয়া গেল।

অজ্ঞাত (?) রচনা—

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—১৮৫৬র পর তিন বছর বঙ্কিমচন্দ্র আর কিছু লেখেন নি। মাঝে কেবল ক্যাপ্টেন ডি. এল, রিচার্ডসন সম্পাদিত 'লিটারারি গেজেটে' কয়েকটি ইংরাজি কবিতা ও একটি গল্প লিখেছিলেন।

হেমেন্দ্রবাবু লিখেছেন—বঙ্কিম তাঁর আঠার বছর বয়সে (১৮৫৬য়) একটি গল্প লিখেছিলেন। বঙ্কিম তাঁর স্ব-রচিত জীবন-টীকায় অর্থাৎ আত্ম-জীবনীতে এই গল্পের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—গল্পটির নাম মনে নেই, পাণ্ডুলিপিও হারিয়ে গেছে।

হেমেন্দ্রবাবু আরও লিখেছেন—১৮৫৭।৫৮য় কলকাতায় কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ দু একজন বাঙ্গালী মিলে একটি সমিতি গঠন করে ছিলেন। এঁরা এই সমিতি থেকে বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলেন, কেউ বাংলায় মৌলিক উপন্যাস লিখে তাঁদের কাছে পাঠালে, তাঁরা লেখককে পুরস্কার দেবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখে পাঠালে, সেটি না-মঞ্জুর হয়। সমিতির সম্পাদক আর একটি চেয়ে পাঠান। বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি পাঠান, সেটিও না-মঞ্জুর হয়।

১৮৫৬য় এবং তার পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজি ও বাংলায় রচিত এত কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের হদিস্ হেমেন্দ্রবাবু কোথায় যে পেলেন, সে সম্বন্ধে

তিনি কিছুই বলেন নি। কেবল ১৮ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত একটি গল্পের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরচিত জীবন-টীকা বা আত্ম-জীবনীতে ঐ গল্পের কথা আছে।

হেমেন্দ্রবাবুর বইয়ে সত্য কাহিনীর সঙ্গে অসংখ্য অসত্য কাহিনীও রয়েছে। তাই তাঁর এই নজীরহীন কথাকে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'আত্ম-জীবনী'র কথা—

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র যিনি 'বঙ্কিম-জীবনী' লিখেছেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্যন্তও কাকার স্নেহ লাভ করেছিলেন। বঙ্কিমের মৃত্যুর সময় শচীশের বয়স ছিল প্রায় ৩০।৩২। কাকার মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর জীবনী লেখার সময় শচীশ কাকীমার (বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীর) কাছ থেকেও অনেক তথ্য এবং ঘটনাও জেনেছিলেন।

বঙ্কিম যদি সত্যই তাঁর আত্ম-জীবনী লিখতেন, কি আত্ম-জীবনীর সামান্য একটুও লিখে যেতেন, তাহলে শচীশ সে কথা নিশ্চয়ই জানতেন। আর জানলে. তিনি তাঁর গ্রন্থে অন্তত সে কথার উল্লেখও করে যেতেন।

বঙ্কিম যে আত্ম-জীবনী লিখেছিলেন, একথা প্রথম জানা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখা থেকে। দিব্যেন্দুসুন্দর ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

দিব্যেন্দুসুন্দরের ঐ লেখা প্রকাশিত হয় নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের আষাঢ়, ১৩১৮ সংখ্যায়। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন শ্রীশ মজুমদারের ভাই শৈলেশ মজুমদার।

দিব্যেন্দুবাবু লেখেন—'মাতামহদেব স্বর্গারোহণের সময় বলিয়া গিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ বৎসরের পূর্বে যেন কেহ তাঁহার জীবন-চরিত না লেখেন। ঠিক দ্বাদশ বৎসরের পরেই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। দেশের লোক তখন হইতে সেই সাহিত্য-সম্রাটকে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি জ্ঞানে অধিকতর ভক্তিভরে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।... আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবন-চরিত প্রকাশ করি, ইহাও বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল।... তাঁহার স্বরচিত আত্ম-চরিত অবলম্বনে আমাদের তত্ত্বাবধানে তাঁহার যে বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিত হইতেছে, তাহা প্রকাশে বিলম্ব আছে।'

দিব্যেন্দুবাবু এরপর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এক-

ভাই ব্রজেন্দ্রসুন্দরও বহুকাল জীবিত ছিলেন। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবুর কথিত তাঁদের তত্ত্বাবধানে বঙ্কিম-জীবনী আর প্রকাশিত হল না।

আমার ধারণা, বঙ্কিম আত্ম-জীবনী লিখেছিলেন, একথা ঠিক নয়। সজনী-কান্ত দাসও তাঁর বঙ্কিম-সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে (আষাঢ়, ১৩৪৫) এ সম্পর্কে লিখেছেন—'আমাদের বিশ্বাস নিজের জীবন-স্মৃতি তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) কখনও লেখেনও নাই—মুখে কাহাকেও কখনও বলেনও নাই।'

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে দিব্যেন্দুবাবু একথা বললেন কেন ?

শচীশের বঙ্কিম-জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালে। আমার মনে হয়, শচীশের বইয়ের কথা জেনেই, দিব্যেন্দুবাবু নিজেকেও শচীশের চেয়ে কম নয় ভেবে. ঠিক ঐ সময়েই একথা প্রকাশ করেছিলেন। এবং নিজের লেখাকে জোরদার ও প্রামাণ্য প্রমাণ করবার জন্য বঙ্কিমের স্ব-রচিত আত্ম-চরিতের কথাও যুক্ত করেছিলেন।

তা না হলে, বঙ্কিম যদি বলেই থাকেন—তাঁর মৃত্যুর ১২ বছর পরে, তাঁর জীবনী লেখা হবে, বঙ্কিমের তো মৃত্যু হয়েছিল ১৩০০ সালে, আত্ম-জীবনী যদি হাতের কাছেই থাকতে, তাহলে ১৩১২।১৩ সালেই তো দিব্যেন্দু-বাবু বঙ্কিম-জীবনী প্রকাশ করতে পারতেন।

অতএব হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত বর্ণিত বঙ্কিমের 'স্ব-রচিত জীবনটীকা' এবং তাতে লেখা বঙ্কিমের গল্পের কথাও বিশ্বাস করা গেল না। হেমেন্দ্রবাবুর কথামত রিচার্ডসনের সেই সময়কার পত্রিকায় বঙ্কিমের কোন ইংরাজি রচনাও দেখা গেল না। আর বঙ্কিমের উপন্যাসের দু দুটা পাণ্ডুলিপি কি হল ? গল্পের পাণ্ডুলিপিটা না হয় হারাল, দুটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও হারিয়ে গেল ?

Rajmohan's wife—

১৮৫৬য় ললিতা ও মানস প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েক বছর বাদ দিয়ে একেবারে ১৮৬৪তে আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মুদ্রিত রচনা পাই। সেটি কিশোরী-চাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক একটি ইংরাজি সাপ্তাহিকে ধারা-বাহিক ভাবে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজি উপন্যাস Rajmohan's wife.

শচীশচন্দ্র তাঁর বঙ্কিম-জীবনীতে লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় Adventures of a young Hindu নামেও একটি ইংরাজি উপন্যাস লিখেছিলেন।

এ কথা সত্য কিনা বলা যায় না। কারণ, সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি কেউ দেখেন নি। আর তার কিছুও মুদ্রিত তো হয়ই নি।

একটা কথা প্রচলিত আছে, ঈশ্বর গুপ্তই নাকি বঙ্কিমচন্দ্রকে কবিতা রচনা ছেড়ে গদ্য রচনায় মন দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

আবার এও দেখছি—ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের তখনকার গদ্য সম্বন্ধে লিখছেন —'(বঙ্কিম) রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলিকে প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিমভাষা ব্যবহার না করেন।'

ঈশ্বর গুপ্তের এই সমালোচনায় বা সতর্কিকরণের ফলেই কি বঙ্কিম তখন বাংলা গদ্য রচনা ছেড়ে ইংরাজি রচনায় হাত দিয়েছিলেন?

বঙ্কিম শৈশবে মেদিনীপুরে থাকার সময় কয়েক বছর দুটি ইংরাজ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে ছিলেন। পরে হুগলী কলেজে পড়ার সময়ও ইংরাজি ভালভাবেই পড়তে হয়েছিল। তাই ইংরাজি ভাষার উপর তাঁর বেশ দখল ছিল।

বঙ্কিম ইংরাজিতে Rajmohan's wife উপন্যাস লিখলেও, কি ভেবে আবার ইংরাজিতে উপন্যাস রচনা ছেড়ে দিলেন। এবং নিজেই Rajmohan's wife এর বাংলা অনুবাদ করতে শুরু করলেন। কিন্তু মাত্র সাত অধ্যায় অনুবাদ করার পর ছেড়ে দিলেন। পরে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বারিবাহিনী' গ্রন্থের প্রথম নয় অধ্যায়ে বঙ্কিমের এই অনুবাদটা দিয়েছিলেন। এখন 'বঙ্কিম-রচনাবলী'তে বঙ্কিমের ঐ অনুবাদ পাওয়া যায়।

অনুবাদ ছেড়ে, এবার বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষাতেই উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সেই উপন্যাস হ'ল—'দুর্গেশনন্দিনী'।

বঙ্কিমের রচনা সম্বন্ধে হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের নজীরহীন কথা এবং শচীশচন্দ্রেরও 'এডভেন্চার অব এ ইয়ং হিন্দু'র কথা বাদ দিলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৩র পর থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত দশ বছর একরূপ কিছুই লেখেন নি। অন্তত ঐ সময়কার লেখার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের বঙ্কিম-জীবনীতে লিখেছেন—১৮৬০ এর নভেম্বর থেকে ১৮৬৪র মার্চ পর্যন্ত বঙ্কিম খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি 'এডুকেশন গেজেটে' কিছু কিছু লিখতেন।

বঙ্কিমের এ লেখারও কোন অস্তিত্ব বা প্রমাণ নেই। ১৮৫৩র পর ১০

বছরে বঙ্কিম অল্প কিছু লিখে থাকলেও এই সময়ে তাঁর বেশী না লেখার হেতু—১৮৫৪ থেকে পর পর জুনিয়র স্কলারসিপ ও সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষা দেওয়া, আবার এনট্রান্স ও বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া, দায়িত্বপূর্ণ নতুন চাকরি নেওয়া ইত্যাদি।

খুলনায় চাকরি নিয়ে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে তো ঘোর অরাজকতার মধ্যেই পড়তে হয়েছিল। সেই অরাজকতা দমন করে, একটু সুস্থির হয়ে বঙ্কিম আবার পুরাদমে সাহিত্য সাধনা শুরু করেছিলেন। এবং এই সাধনা নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাঁর জীবনের শেষ সময় পর্যন্তই চলেছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমের প্রথম দিকের গদ্য রচনার ভাষাকে 'বঙ্কিম ভাষা' বলেছিলেন।

দুর্গেশনন্দিনী রচনার আগে বঙ্কিম Rajmohan's wife এর যে কিছুটা বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, তাতে দেখা যায়—তিনি অনেকটা স্বচ্ছ, সুন্দর ও সাবলীল বাংলা লিখেছেন।

ইতিপূর্বে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিম সে গ্রন্থ পড়েছেন। তিনি পরে এই বই সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

'আলালের ঘরের দুলালে'র দ্বারা বাংলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাংলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই। এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ।...উহাতেই প্রথম এ বাংলা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাংলা সর্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়। ...এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাংলা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাংলা ভাষার এক সীমায় তারাশংকরের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল।' ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাংলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।' (বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান)।

'আলালের ঘরের দুলাল' পড়ার পর বঙ্কিম তাঁর Rajmohan's wife এর অনুবাদ যে-বাংলায় লিখেছিলেন, তার কিছুটা নমুনা দিচ্ছি—

মধুমতী নদীতীরে রাধাগঞ্জ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। প্রভূত ধন-সম্পন্ন ভূস্বামীদিগের বসতিস্থান বলিয়া এই গ্রাম গণ্ডগ্রামস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। একদা চৈত্রের অপরাহ্ণে দিনমণির তীক্ষ্ণ কিরণমালা ম্লান হইয়া আসিলে দুঃসহ নৈদাঘ উত্তাপ ক্রমে শীতল হইতেছিল; মন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল; তাহার মৃদু হিল্লোলে ক্ষেত্রমধ্যে কৃষকের ঘর্মাক্ত ললাটে স্বেদবিন্দু বিশুষ্ক করিতে লাগিল, এবং সদ্যশয্যোত্থিতা গ্রাম্য রমণীদিগের স্বেদ-বিজড়িত অলকপাশ বিধূত করিতে লাগিল।

দুর্গেশনন্দিনী—

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা থেকে বারুইপুরে বদলি হয়ে আসেন। খুলনায় থাকার সময়ে শেষ দিকে তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। তারপর বারুইপুরে এসে এই উপন্যাস লিখে শেষ করেন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বই আকারে প্রকাশ করেন।

বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখার প্রসঙ্গে বারুইপুর রেজিস্ট্রি অফিসের হেড ক্লার্ক, বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত কালীনাথ দত্ত তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন—

'এই সময়ের পূর্ব হইতে তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিতে ছিলেন। এই সময়ে সর্বদা তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার study room-এ প্রস্থান করিতেন, চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না।'

বঙ্কিমচন্দ্র যে কিরূপ দক্ষ ও সুবিচারক ছিলেন, এই বইয়ে আগে তার কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছি। একজন সৎ ও নিরপেক্ষ বিচারক সাক্ষীর এজাহার শুনতে শুনতে কখনই এরূপ করতে পারেন না। তাই কালীনাথবাবুর লেখায় কিছুটা অতিরঞ্জন আছে বলেই মনে হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' কলকাতায় ৫৮।৫ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের 'বিদ্যারত্ন যন্ত্রে' মদ্রিত হয়েছিল। দাম ছিল—এক টাকা। বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল—৩০৭

বঙ্কিমচন্দ্র এই বইটি তাঁর বড়দা শ্যামাচরণবাবুকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন—

জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীযুক্তবাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
শ্রীচরণে এই গ্রন্থ উপহারস্বরূপ অর্পণ করিলাম।

দুর্গেশনন্দিনী ছাপাখানায় দেবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন কাঁটালপাড়ার বাড়িতে ভাটপাড়ার কয়েকজন পণ্ডিত মশায়কে ডেকে এনে তাঁদের, দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনিয়েছিলেন। ভাষায় ব্যাকরণ দোষ আছে কিনা, বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিত মশায়দের জিজ্ঞাসা করলে মধুসূদন স্মৃতিরত্ন বলেছিলেন--গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হয়েছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি অন্য দিকে মন নিবিষ্ট করি।

চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলেছিলেন—আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ দোষ লক্ষ্য করেছি, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হয়েছে।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হলে ১২৭২ সালের ৩রা বৈশাখ (১৮৬৫র ১৭ই এপ্রিল) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বইটি সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা হয়েছিল—'...ইংরাজিতে যেমন উত্তম ২ উপন্যাস আছে, বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ নাই; এই নিমিত্ত আমরা এই উৎকৃষ্ট ও প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাসকে গৌরবস্থানীয় করিলাম। বাস্তবিক বাঙ্কমবাবু এই পুস্তকে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাসকার (first novelist) উপাধির অধিকারী হইয়াছেন।'

পাইকহাটী পরগণার ১৪ জন যুবক এবং চাঙ্গড়িপোতা নিবাসী সীতানাথ বসু দুর্গেশনন্দিনী পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে তখন ২৭শে ভাদ্রের (১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে এক চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। সেই অভিনন্দন পত্রটি ছিল এইরূপ—

হে! দেশহিতৈষী মহাত্মন্। আপনি স্বদেশের একটি মহান্ উপকার সাধন করিলেন। আমরা সর্বান্তঃকরণে আপনাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গদেশ আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলেন। আমরা জন্মাবধি এ দেশীয় মাতৃভাষাপ্রিয় পণ্ডিতগণের সুকোমল হস্ত হইতে যদিও অনুবাদ-লতার মধুর ফল আস্বাদন করিয়া আসিতেছি, তথাপি আপনি এক্ষণে আমাদিগকে নবপল্লবিত অক্ষয় বৃক্ষের অমৃত ফলের রসাস্বাদন করাইলেন। দুর্গেশনন্দিনী আমাদিগকে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নব নব আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের স্বদেশীয় ভাষা সংস্কারকগণ যদি আপনার অনুকরণ করিতে যত্ন-

শীল হন, বঙ্গদেশ অপরিসীম উপকার প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। আপনি যথার্থই এক্ষণে অভিনব আদর্শস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে লিখেছেন—

'দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম, তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এমন অদ্ভুত চিত্রণ-শক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।…'

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ কালের কথায় রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন—

'যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল।…বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যে দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় পুস্তক পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই। সেরূপ মৌলিকতা, সেরূপ কল্পনার কমনীয় লীলা, সেরূপ সৌন্দর্য ও লাবণ্যচ্ছটা, সেরূপ মধুময়ী রচনা ও গল্পের চাতুর্য বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যে পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই।'—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—শ্রাবণ ১৩০২।

১৮৬৫র ২৪শে এপ্রিল তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'দুর্গেশনন্দিনী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

'…এ দেশের লোকের এক বিষয় লইয়া অধিক বর্ণন করিবার যে একটি রোগ আছে, গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কয়েকটি স্থানে অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পতৎপ্রকর্ষতা দোষ ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষের বিন্দুপাত হইয়াছে। ভাষাটিও সর্বজন হৃদয় গ্রাহিনী হয় নাই।

যাহা হউক, যদি কেহ তুলা যানে দুর্গেশনন্দিনীর গুণদোষের পরিমাণ করেন, গুণভার গুরু হইবে সন্দেহ নাই।…'

দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে সোমপ্রকাশের এই সমালোচনাটিও যে ভুল হয় নি, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তা বুঝেছিলেন। তাই তিনি এই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণ গুলিতে অনেক পরিবর্তন করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে দুর্গেশনন্দিনীর ১৩টি সংস্করণ হয়। প্রত্যেক সংস্করণেই তিনি এই বইয়ের কিছু না কিছু সংশোধন করেন। যেখানে 'অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষের বিন্দুপাত ছিল' সেগুলো তো বাদ দিয়ে ছিলেনই, বহু স্থানে ভাষা বদল করেছিলেন এবং অনেক অতিবর্ণনও বাদ দিয়েছিলেন। তবে তিলোত্তমা, বিমলা, আসমানী প্রভৃতির দীর্ঘ দীর্ঘ রূপের বর্ণনাগুলি রেখেই দেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণ দুর্গেশনন্দিনীতে শেষ পর্যন্ত কত যে পরিবর্তন করেছিলেন, তার একটা বিস্তৃত 'পাঠভেদ' তালিকা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাঁদের সম্পাদিত দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থের শেষে দিয়েছেন।

দুর্গেশনন্দিনীতে একটা ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই একটু গরমিল বা অসামঞ্জস্য থেকে গেছে বলে আমার ধারণা। সেটা এই—

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে লিখেছেন—উড়িষ্যার পাঠান শাসনকর্তা কতলু খাঁ মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা করবার জন্য গড় মান্দারণ দুর্গের অধীশ্বর বীরেন্দ্র সিংহের সাহায্য চেয়ে লিখেছিলেন—এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠান শিবিরে পাঠিয়ে দাও।

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, বীরেন্দ্র সিংহের নিজের অন্তত দু-চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিলই। আর এও অনুমান করা যেতে পারে যে, গড় মান্দারণ দুর্গে তথা বীরেন্দ্র সিংহের বাসস্থানে বেশ কিছু সৈন্য অন্তত নৈশ প্রহরী হিসাবে নিযুক্ত থাকতোই।

কিন্তু বইয়ে দেখছি, মান্দারণ দুর্গে বীরেন্দ্র সিংহ পাঠান সেনাদের সঙ্গে একা যুদ্ধ করে তাদের হাতে বন্দী হলেন। জগৎসিংহও তাই করলেন।

পাঠান সেনারা মান্দারণ দুর্গ জয় করার সময় 'আল্লা-ল্লা-হো' ধ্বনি, জয়ধ্বনি ও কত কোলাহল করল—তবুও তখন মান্দারণ দুর্গে বীরেন্দ্র সিংহের সৈন্যদের দেখা গেল না।

বীরেন্দ্র সিংহের অত সৈন্য থাকা সত্ত্বেও, তাঁর ঐ বিপদের সময়ে তাঁর সৈন্যরা কি করল, না করল, তার একটু আভাসও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বইয়ে দেননি।

পাঠান সেনাগণ কর্তৃক মান্দারণ দুর্গ আক্রমণের পূর্বে, সেই রাত্রেই বিমলা দিগগজকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গ থেকে শৈলেশ্বরের মন্দিরে যাওয়ার পথে প্রথমে

একটা মুমূর্ষু 'সুসজ্জীভূত সৈনিক অশ্ব' এবং পরে প্রায় আধক্রোশ দূরে একটা 'সিপাহির পাগড়ি' দেখেছিল। ঐ দুটা দেখে সে বলেছিল—'যারই ঘোড়া তারই পাগড়ি? না, এ তো পদাতিকের পাগড়ি।'

বঙ্কিম বিমলার মুখে 'না, এ তো পদাতিকের পাগড়ি' বসিয়ে, এই পদাতিককে কি বীরেন্দ্র সিংহের কোন প্রহরী সিপাহি বোঝাতে চেয়েছেন?

যদি তাই হয়, তাহলে দূরে শৈলেশ্বরের মন্দিরের কাছে প্রহরী দেখা গেল, অথচ দুর্গের মধ্যে বা আশে পাশে বীরেন্দ্র সিংহের সৈন্যদের দেখা গেল না।

হতে পারে, বইয়ে পাঠান সেনাগণ কর্তৃক মান্দারণ দুর্গ জয় করে বীরেন্দ্র সিংহ, বিমলা, তিলোত্তমা ও জগৎসিংহকে বন্দী দেখানোটাই আসল উদ্দেশ্য, তবুও দুর্গ জয়টাই যখন একটা বড় ঘটনা, তখন বীরেন্দ্র সিংহের সৈন্যরা একেবারে উহ্য হয়ে যাবে কেন? এখানে মান্দারণ দুর্গের প্রহরীদেরও পাঠান সেনার মুখোমুখি না দেখানো (ভয়ে পলাতক হলেও) বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর একটু অসঙ্গতি বলেই আমি মনে করি।

গাছের উপরে লুকিয়ে থাকা যে পাঠান সেনাকে জগৎসিংহ বর্শা ছুঁড়ে নিহত করেছিল, তার কবচের মধ্যে কতলু খাঁর একটা চিঠি ছিল। তাতে লেখা ছিল—

কতলু খাঁর আজ্ঞানুবর্তিগণ এই লিপি দৃষ্টি মাত্র লিপি বাহকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

কতলু খাঁ।

এই চিঠি থেকে মনে হয়, ঐ নিহত পাঠান কতলুর বিশ্বাসী কোন উচ্চপদস্থ সৈনিক ছিল। আর এও অনুমান করা যেতে পারে, কতলু নিজে হয়তো গড় মান্দারণ দুর্গ জয়ে আসেন নি। নিজে সৈন্য নিয়ে এলে কি এরূপ চিঠির প্রয়োজন হ'ত?

দুর্গেশনন্দিনীতে দেখা যায়, একই রাত্রে বীরেন্দ্র সিংহ, জগৎ সিংহের আগে পাঠানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। আর ঐ রাত্রেই মান্দারণ দুর্গ পাঠানদের দ্বারা অধিকৃতও হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—আয়েষা জগৎসিংহকে একদিন বলেছিল জগৎ সিংহ চার দিন হ'ল কতলু খাঁর দুর্গে বন্দী হয়ে আছে। বীরেন্দ্র সিংহও বন্দী হয়ে আছেন, তবে ঐ দিনই তার বিচার হবে।

এর পরেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—মান্দারণ দুর্গ জয়ের দু দিন পরে কতলু নিজ দুর্গ মধ্যে বিচারে বসে বীরেন্দ্র সিংহের মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন।

পাঠান সেনারা মান্দারণ দুর্গ আক্রমণের সময় বীরেন্দ্র সিংহের কোন সৈন্যরই দেখা মিলল না। দুর্গাধিপতি বীরেন্দ্র সিংহও সঙ্গে সঙ্গেই বন্দী হলেন। এ থেকে বলা যেতে পারে, সেই রাত্রেই পাঠানরা মান্দারণ দুর্গ জয় ক'রে পরে একই সঙ্গে বন্দী বীরেন্দ্র সিংহ, জগৎ সিংহ প্রভৃতিকে কতলুর দুর্গে নিয়ে এসেছিল।

তাই কতলুর দুর্গে জগৎসিংহের চার দিন বন্দী দশা এবং মান্দারণ দুর্গ জয়ের দু দিন পরে বীরেন্দ্র সিংহের বিচার, এই দুটা তারিখেও একটু অসামঞ্জস্য হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

এখন এই দুটা তারিখে সামঞ্জস্য দেখাতে গেলে বলতে হয়, বীরেন্দ্র সিংহের বন্দী হওয়ার পর আরও দু দিন ধরে যুদ্ধ করে তবেই পাঠানরা মান্দারণ দুর্গ জয় করেছিল। কিন্তু বইয়ে আদৌ এরূপ কোন আভাসই নেই।

কপালকুণ্ডলা—

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার নেগুয়া মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পরবর্তীকালে এই নেগুয়ার মহকুমা কাছারি নেগুয়া থেকে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কাঁথী শহরে উঠে আসে এবং নেগুয়া মহকুমার নাম হয় কাঁথী মহকুমা।

বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়ায় থাকার সময় এক কাপালিক সন্ন্যাসী কয়েক দিন গভীর রাত্রে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। কাপালিক অদূরেই সমুদ্রতীরের জঙ্গলের মধ্যে সম্ভবত বাস করত।

এখানে থাকাকালেই বঙ্কিমচন্দ্র সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ি বা বালুকাস্তূপ, বিশাল রসুলপুর নদীর মোহনা এবং এই মোহনার নিকটে অবস্থিত দরিয়াপুর ও দৌলতপুর গ্রাম এবং সমুদ্রতীরের অরণ্যও দেখেছিলেন।

অনুমান হয়, এই সব দেখে, এ গুলিরই পটভূমিকায় একটা উপন্যাস রচনা করবার ইচ্ছা তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে উদিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—বঙ্কিম নেগুয়া থেকে খুলনায় বদলি হওয়ার কিছুদিন পরে দীনবন্ধু মিত্র একবার কয়েক দিনের জন্য কাঁটাল-

পাড়ার বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের অতিথি হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তখন বাড়িতেই ছিলেন। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র একদিন দীনবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—যদি একেবারে শৈশবকাল থেকেই কোন স্ত্রীলোক তার ষোল বছর বয়স পর্যন্ত সমাজ বহির্ভূ'তা হ'য়ে সমুদ্রতীরে বনের মধ্যে কোন কাপালিক দ্বারা পালিতা হয় এবং পরে তার বিবাহ হয়ে সমাজে আসে, তখন তার স্বভাব কি রকম হবে ?

দীনবন্ধু এই কথার কোন উত্তর দিলেন না। তবে সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রথমে রহস্য করে বললেন—যদি গরীবের ঘরে বিয়ে হয় তাহলে মেয়েটি চোর হবে। বনজঙ্গলে থাকার সময় ভাল খাদ্য খেতে পেত না। সমাজে এসে সে সব দেখে লোভ হবে। গরীবের ঘরে তো সে সব পাবে না, তাই অপরের ঘর থেকে চুরি করে খাবে।

এরপর রহস্য ত্যাগ করে বললেন—কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকবে। পরে ছেলেপুলে হ'লে সমাজের লোক হয়ে পড়বে। তখন আর সন্ন্যাসীর প্রভাব কিছুই থাকবে না।

পূর্ণবাবু লিখেছেন—এই উত্তর বঙ্কিমচন্দ্রের মনোমত হয় নি। এর কয়েক বছর পরেই 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয়।

পূর্ণবাবু আরও লিখেছেন—তাঁদের বাল্যকালে একদিন বঙ্কিমচন্দ্র ও তিনি বাড়ি থেকে গঙ্গা পার হয়ে হুগলী কলেজে পড়তে যাচ্ছিলেন। সেদিন অনেক বেলা পর্যন্ত খুব ঘন কুয়াশা ছিল ; ফলে মাঝি সেদিন দিগ্‌ভ্রম করে অন্য দিকে নৌকা নিয়ে গিয়েছিল। কপালকুণ্ডলার প্রথমে কুজ্‌ঝটিকায় দিগ্‌ভ্রমের যে দৃশ্য আছে, তা ঐ দিনকার ঘটনা থেকে নেওয়া। আর কপালকুণ্ডলায় যে মতিবিবির কথা আছে. তারও উৎস তাঁদের মেজঠাকুরদার মুখে শোনা এক কুলত্যাগিনীর কাহিনী।

খুব ঘন কুয়াশা প্রায় প্রতি বছরই একাধিক দিন ধরে দেখা যায়। আর বাল্যে শোনা কোন কুলত্যাগিনীর কথা ছাড়া, কপালকুণ্ডলা রচনা কাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র, বিশেষ করে বিচারক হওয়ার পর, নিশ্চয়ই কোন কুলত্যাগিনীর কথাও শুনেছিলেন। তাই পূর্ণবাবু বর্ণিত তাঁদের ছেলেবেলায় দেখা কুয়াশা এবং ছেলেবেলায় শোনা কুলত্যাগিনীর কথাই স্মরণ করে যে বঙ্কিমচন্দ্র কপাল-কুণ্ডলায় দিয়েছেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। দিতেও পারেন, আবার নাও দিতে পারেন।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার পর বারুইপুরে থাকাকালেই বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা রচনা শুরু করেছিলেন বলে মনে হয়।

কলকাতায় 'নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে' মুদ্রিত হয়ে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কপালকুণ্ডলা প্রথম প্রকাশিত হয়।

শচীশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী'তে কপালকুণ্ডলার প্রথম প্রকাশ কাল হিসাবে লিখেছেন—১৮৬৭। ব্রজেনবাবুরা তাঁদের সম্পাদিত কপালকুণ্ডলা গ্রন্থের শেষে লিখেছেন, তাঁরা কপালকুণ্ডলার ১ম সংস্করণ দেখেছেন। তাই তাঁরা লিখেছেন—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব ব্রজেনবাবুদের কথাটাই ঠিক হওয়া সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই বইটি মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ পত্রে লেখেন—

মদগ্রজ শ্রীযুক্তবাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে

এই গ্রন্থ উপহার প্রদান করিলাম।

কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছেন—এই উপন্যাস খানি প্রকাশিত হওয়া মাত্র বঙ্কিমবাবুর যশোরাশি চারিদিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়ল এবং ইতিপূর্বে যাঁরা বাংলা গ্রন্থকার বলে খ্যাত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলেরই যশোজ্যোতিঃ হীনপ্রভ হয়ে পড়ল।

কাপালকুণ্ডলা আজও বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য 'গদ্যকাব্য'।

কপালকুণ্ডলা রচনা করে এই বইয়ের ভাষা এবং ঘটনাগুলি পর পর সাজানো সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এমনই নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছিলেন যে, এই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণ গুলিতে তাঁকে তেমন কোন গুরুতর পরিবর্তন করতে হয় নি। তবে কিছু কিছু যে পরিবর্তন করেন নি, তাও নয়। এগুলির মধ্যে প্রথম সংস্করণের চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ এবং কয়েকটি পরিচ্ছেদের অংশ পরবর্তী সংস্করণে বাদ দেন। বই এর সব শেষে উপসংহার অংশ প্রথমে ছিল এইরূপ—

কাপালিক গঙ্গাতীরে শ্মশানভূমিতে যেখানে নিজের পূজা স্থান ঠিক করেছিল, সেখানে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে যায়। পরে তন্ত্র অনুসারে পূজা আরম্ভ করে নবকুমারকে বলে—কপালকুণ্ডলাকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে আন।

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আর ফিরল না দেখে কাপালিক নিজে উঠে গঙ্গাতীরে গেল। গিয়ে দেখল, গঙ্গায় একটি লোক ডুবে যাচ্ছে—ডুবছে আর ভাসছে।

এই দেখেই কাপালিক সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে জলে নামল এবং ডুবন্ত মানুষটিকে কূলে এনে দেখল, প্রায় অচৈতন্য নবকুমার।

কাপালিক ভাবল—কপালকুণ্ডলাও তাহলে জলমগ্না হয়েছে। এই ভেবে সে আবার জলে নেমে কপালকুণ্ডলাকে খুঁজল, কিন্তু পেল না।

তীরে ফিরে এসে কাপালিক নবকুমারের চৈতন্য আনার চেষ্টা করল। নবকুমারের জ্ঞান ফিরে এলে তার মুখ দিয়ে প্রথম কথা বেরুল—মৃন্ময়ি! মৃন্ময়ি!

কাপালিক জিজ্ঞাসা করল—মৃন্ময়ি কোথায়?

নবকুমার কাপালিকের কথার কোন উত্তর না দিয়ে আবার বলল—মৃন্ময়ি! মৃণ্ময়ি! মৃন্ময়ি!

বঙ্কিমচন্দ্র পরে কপালকুণ্ডলার এই উপসংহার অংশটা পরিবর্তন করেন। এই পরিচ্ছেদের ঠিক আগের পরিচ্ছেদেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—কাপালিক নবকুমারকে বলেছিল, তার দুটা হাতই ভাঙ্গা, তাতে শিশুর বলও নেই। শরীরের আর আর অঙ্গও ভাঙ্গা।

বঙ্কিমচন্দ্র পরে হয়ত ভেবেছিলেন, এ হেন ভগ্ন-শরীরের কাপালিকের পক্ষে লাফ দিয়ে জলে নামা এবং জল থেকে নবকুমারকে উদ্ধার করে এনে তার চৈতন্য আনার জন্য প্রক্রিয়া করা সম্ভব নয়। তাই তিনি এই অংশটা বদলে পরে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার দুজনকেই গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিয়েছেন।

মৃনালিণী—

শচীশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—'১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) ছয় মাসের ছুটি লইলেন। ছুটির কিয়দংশ গৃহে থাকিয়া আইন পুস্তক পাঠ ও মৃনালিণীর পাণ্ডুলিপি সংশোধনে অতিবাহিত করিলেন; এবং অবশেষে মৃনালিণী ছাপিতে দিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। তখনকার দিনে ছাপার কায তত দ্রুত অগ্রসর হইত না। মৃনালিণী মুদ্রিত হইতে এক বৎসরের উপর লাগিয়া ছিল।'

মৃনালিণী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে।

শচীশবাবু বলেছেন, মৃনালিণী ছাপাতে এক বছরের বেশী সময় লেগেছিল। তাঁর এই কথা অনুযায়ী তাহলে দাঁড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র অন্তত ১৮৬৮র সেপ্টেম্বর অক্টোবর নাগাদ এই বই ছাপার জন্য প্রেসে দিয়েছিলেন।

মৃনালিণীর ১ম সংস্করণ ছিল ডবল ক্রাউন কাগজের ১টায় ১৬ পৃষ্ঠা হিসাবে ২৭১ পৃষ্ঠার বই। এই বই ছাপতে তখন এক বৎসরের বেশী সময় লেগে ছিল, এ কথা বিশ্বাস হয় না। কারণ, তখনকার দিনে ছাপার কাজ, এখনকার মত দ্রুত না হলেও, মৃনালিণী ছাপাতে অত দেরি হয়েছিল, একথা ঠিক নয়। ছাপার কাজ কিছুটা দ্রুত না হলে তখন ঈশ্বর গুপ্তের দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর', সাপ্তাহিক 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত কি করে? আর মৃনালিণী উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিন পরে বঙ্কিমচন্দ্রের অত বড় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাই বা ঠিক মাসে মাসে বেরোত কি ভাবে? তাই আমার ধারণা, খুব বেশী সময় হলেও ৫।৬ মাসের মধ্যেই মৃনালিণী ছাপা শেষে হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬৯ এর মে-জুন মাস নাগাদ তিনি এ বই ছাপাতে প্রেসে দিয়ে ছিলেন।

আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত কাজে ৬ মাস ছুটি নিয়েছিলেন ১৮৬৮র জুনে। আর বি. এ, পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১৮৬৯ এর জানুয়ারিতে।

আমার ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ছ মাস ছুটির মধ্যেই, সম্ভবত পূজার ছুটির সময় অর্থাৎ ১৮৬৮র সেপ্টেম্বর অক্টোবর নাগাদ কোন এক সময়ে কাশীধামে গিয়েছিলেন। কাশী গিয়ে ঐ সময় তিনি প্রযাগ, মথুরাও বেড়িয়ে এসে ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃনালিণী উপন্যাসের প্রথমেই আমরা প্রয়াগ, এবং পরে মথুরার কথা পাচ্ছি।

অনুমান হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ঐখানে থাকাকালে অথবা মথুরা প্রয়াগ থেকে ফেরার পরেই মৃনালিণী লিখতে শুরু করেছিলেন। তাহলে আমার হিসাব অনুযায়ী দাঁড়ায় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৮র শেষ দিকে মৃনালিণী লিখতে শুরু করেন এবং ১৮৬৯র মে-জুন নাগাদ লেখা শেষ করেন।

আমার ধারণা, বঙ্কিম মৃনালিণী প্রেসে ছাপাতে দিয়ে কাশী যান নি। মৃনালিণী লেখার আগেই কাশী, প্রয়াগ ও মথুরা বেড়িয়ে এসেছিলেন। তাই বইয়ে প্রয়াগ, মথুরার কথা পাচ্ছি। যেমন আমরা দুর্গেশনন্দিনীতে পাই, তাঁর দেখার পরে লেখা গড়মান্দারণের কথা এবং কপালকুণ্ডলাতেও পাই তাঁর দেখার পরে লেখা কাপালিকের কথা। বইয়ের প্রথমে প্রয়াগের যে বর্ণনা আছে, তা অল্প হলেও, তবুও মনে হয়, তিনি প্রয়াগ দেখে এসেই ঐ কথা লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ মজুমদারের কাছে একবার বলে ছিলেন—'আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তা থেকে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি আশ্চর্য রকমের। কেমন করে তা হ'ল, জানলে লোকে আশ্চর্য হবে।' —বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুরে থাকার সময়কার কথায় তাঁর স্নেহভাজন সেখানকার রেজিস্ট্রি অফিসের হেড ক্লার্ক কালীনাথ দত্তও লিখেছেন—'·· বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত।' —বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

নাস্তিক বঙ্কিমচন্দ্র কবে কিভাবে যে নিজের হিন্দুধর্মে আশ্চর্য রকমের মতিগতি লাভ করেছিলেন, সে কথা বা সে ঘটনা আজ আর জানার কোন উপায় নেই। তবে দেখছি, তিনি যখন বারুইপুরে ছিলেন, তখনও নাস্তিক ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকার পর অল্প কিছুদিন সরকারী কর্মচারিদের বেতন নির্ধারণের কমিশনের কাজ করেন। তারপর আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন ১৮৬৭র আগষ্ট মাসে। এখান থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে যান ১৮৬৯ তে।

মৃনালিণীতে এক জায়গায় বঙ্কিম 'গঙ্গা' প্রসঙ্গে লিখেছেন—'ইহা জগদীশ্বর পাদপদ্মনিঃসৃত ইহা জগতে পবিত্র,—যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পূণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়-জটা-বিহারিণী।'

বঙ্কিম এই কথা মনোরমার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। এই কথা বঙ্কিম যার মুখেই বসান, এ লেখা পড়লেই মনে হবে, এ কথা নাস্তিকের নয়, কোন আস্তিক হিন্দুর কলম থেকেই এ লেখা বেরিয়েছে।

তাই অনুমান হচ্ছে, আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময়, মৃনালিণী রচনা কালেই, অথবা এর কিছু আগেই, যে কোন কারণেই হোক, নাস্তিক বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে হিন্দুধর্মের প্রতি মতিগতি হয়েছিল। আর নাস্তিকতা কেটে গিয়ে যেদিন আস্তিক্যভাব এল, সেদিন হিন্দুধর্মের উপর গভীর ভাবে আশ্চর্য রকমের মতিগতি হয়েছিল।

এই হিন্দুধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বা আস্থার জন্যই বোধ করি তখন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বাংলার হিন্দুরাজ ও হিন্দুরাজ্যের কথাও মনে হয়েছিল। তাই মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী মুসলমান সৈন্য হিন্দুরাজ্য বাংলাদেশ জয় করেছিল, এই প্রচলিত কাহিনীর অপবাদকে খণ্ডন করবার জন্যই তিনি মৃনালিণী উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাঁদের সম্পাদিত 'মৃনালিণী'র ভূমিকায় লিখেছেন—'বিষয় ও বর্ণন সামঞ্জস্যে কেহ কেহ মৃনালিণীকে দুর্গেশ-নন্দিনীর অব্যবহিত পরের রচনা বলিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা কাব্যাংশে এই দুই গ্রন্থের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়ার দরুণ এইরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব। আসলে 'মৃনালিণী'ও কাব্যাংশে অতি উৎকৃষ্ট। বিশেষ করিয়া গিরিজায়া ও মৃনালিণীর মুখে বঙ্কিমচন্দ্র যে সঙ্গীত ও ছড়া সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অদ্ভুত কাব্য-কল্পনা কুশলতার পরিচায়ক। ইন্দিরা ও আনন্দ মঠ ব্যতীত পরে আর কুত্রাপি বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসাধারণ ক্ষমতার প্রয়োগ দেখা যায় না।'

কপালকুণ্ডলা কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট, মৃনালিণীও কাব্যাংশে অতি উৎকৃষ্ট—ব্রজেনবাবুরা এ কথা বললেও এই দুই গ্রন্থের কাব্যাংশের উৎকৃষ্টতা কিন্তু এক নয়। মৃনালিণীতে সঙ্গীত ও ছড়া আছে; কিন্তু কপালকুণ্ডলায় এ সব না থাকলেও ভাষা ও বর্ণনাব গুণে এ বই একটি সুন্দর 'গদ্যকাব্য'। তাই দুই গ্রন্থের উৎকৃষ্টতা পৃথক পৃথক কারণে।

দুর্গেশনন্দিনী ও মৃনালিণীতে যে সামঞ্জস্য দেখা যায়, তার কয়েকটা এই—

১। দুর্গেশনন্দিনীতে যেমন আছে অভিরাম স্বামী, মৃনালিণীতে তেমনি আছে মাধবাচায। এঁরা উভয়েই জ্যোতিষ গণনা করেন।

২। দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমা কতলু খাঁর দুর্গে বন্দিনী, মৃনালিণীতে মৃনালিণীও হৃষিকেশ শর্মার গৃহে একরূপ বন্দিনীই ছিল।

৩। জগৎ সিংহ যেমন প্রথমে তিলোত্তমার চরিত্রে সন্দেহ করেছিল; হেমচন্দ্রও তেমনি প্রথমে মৃনালিণীর চরিত্রে সন্দেহ করে। উভয় গ্রন্থেই শেষে নায়ক-নায়িকার মিলনের দৃশ্য আছে।

এই রকম আরও কয়েকটা ছোট খাট সামঞ্জস্য রয়েছে।

মৃনালিণীতে দুর্গেশনন্দিনীর কিছু প্রভাব এসে যাওয়ার কারণ, আমার মনে হয় এই—

বঙ্কিমচন্দ্র মৃনালিণী উপন্যাস রচনার পূর্বে তাঁর দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসটি আবার ভাল করে পড়ে এর ৩য় সংস্করণের জন্য সংশোধন করছিলেন। দুর্গেশ-নন্দিনীর ৩য় সংস্করণ ও মৃনালিণী ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় একই বছরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ১ম সংস্করণ দুর্গেশনন্দিনীর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩০৭। ৩য় সংস্করণ দুর্গেশনন্দিনীর পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ২৯৮। এই বইয়ের ৩য়

সংস্করণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র বইটি বেশ ভালভাবে পড়ে বইয়ের অনেক শব্দ ও বাক্য পরিবর্তন ও পরিবর্জন করেছিলেন।

ঐ সময়েই মৃনালিণীও লিখতে থাকায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে হয়ত মৃনালিণীতে দুর্গেশনন্দিনীর কিছু ছাপ এসে গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই 'মৃনালিণী কে প্রথমে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে লিখে প্রকাশ করেছিলেন। এইভাবে দু সংস্করণ চলে। পরে তৃতীয় সংস্করণ থেকে বইয়ের প্রথমের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কথাটি তুলে দেন।

এই ইতিহাসের কথা স্মরণ করেই তিনি 'মৃনালিণী'র ৩য় সংস্করণ থেকে বইয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন বা পরিবর্তন করেন। সেটা হল—বইয়ের প্রথম দু সংস্করণে যেখানে যেখানে 'বঙ্গ' ও 'যবন' শব্দ ছিল, সেই সব জায়গায় সর্বত্রই 'গৌড়' ও 'তুরক' শব্দ করে দেন। অবশ্য 'যবন' শব্দ অনেক জায়গায় রেখেও দেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মৃনালিণীতে সব চেয়ে বড় সংশোধন করেন এর ৭ম সংস্করণে। এই সংস্করণে তিনি বইয়ের ১ম খণ্ডের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ একেবারে বাদ দিয়ে দেন। দিয়ে ৩য় পরিচ্ছেদের প্রথম পংক্তির প্রথম চারটি শব্দ 'ইহার কিছু দিন পরে' কে 'একদিন প্রয়াগতীর্থে' করে বই শুরু করেন। আর আগের সংস্করণ সমূহের ঐ ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদের দীর্ঘ লেখাটির বক্তব্যকে মাত্র ৮।৯ পংক্তিতে খাড়া করে ৩য় পরিচ্ছেদের ঐরূপ ৮।৯ পংক্তির একটি অন্য লেখার বদলে বসিয়ে দেন।

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের সম্পাদিত 'মৃনালিণী' গ্রন্থের শেষে 'বিভিন্ন সংস্করণে মৃনালিণীর পাঠভেদ' অধ্যায়ে লিখেছেন—'প্রথম খণ্ডের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বাদ পড়িয়াছে।'

কোন্ সংস্করণ থেকে বাদ পড়েছে, এঁরা তা বলেন নি। এটা বলেছেন—শচীশবাবু তাঁর বইয়ে।

ব্রজেনবাবুরা মৃনালিণীর পাঠভেদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন—'মৃনালিণী…তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) ৩১ বৎসর বয়সে রচিত। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত—পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতনকে গড়িয়া তুলিবার আয়োজন ভিতরে ভিতরে চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র স্বপ্ন দেখিতেছেন। ফলে মৃনালিণীর উপরে ধাক্কাটা একটু অধিক পড়িয়াছে। বস্তুতঃ এইটিই বঙ্কিমচ র পরবর্তীকালের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তিত রচনা।

১ম সংস্করণে ব্যবহৃত কঠিন সংস্কৃত মূলক সাধুভাষাকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া সহজ প্রাকৃত ভাষায় পরিবর্তিত করার পরীক্ষাগার রূপে বঙ্কিমচন্দ্র যেন মৃনালিণীকে ব্যবহার করিয়াছেন।'

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের বইয়ে মৃনালিণীর ১ম সংস্করণের সঙ্গে ১০ম সংস্করণের একটা তুলনামূলক পাঠভেদ দিয়েছেন। ঐ ১০ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর আগের বছর।

১ম ও ১০ম সংস্করণের পাঠভেদ পড়লে মনে হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র ১ম সংস্করণে ব্যবহৃত কঠিন সংস্কৃত শব্দগুলিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সহজ প্রাকৃত শব্দ করার পরীক্ষাগার করেছিলেন মৃনালিণীকে। এ সম্পর্কে দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

বইয়ে ৩য় খণ্ডের ৭ম পরিচ্ছেদে এক জায়গায় আগে ছিল—'শ্বেত রক্ত কুমুদমালা'। সেটাকে পরে পরিবর্তন করে করেছেন—'স্পন্দন রহিত কুসুম শ্রেণী'। ঐ ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে দু জায়গায় আগে ছিল 'ছুঁড়ী', পরে বদলে করেন 'মেয়ে'।

ভাষা পারবর্তনটা বড় নয়। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র পরে ১ম সংস্করণের কিছু কিছু অংশ বাদ দেন। আর কোথাও কোথাও একটু-আধটু পরিবর্তন করে অন্য কথা বসান।

মৃনালিণী রচনা কালের অন্তত বছর তিনেক পরে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। তাই মৃনালিণী লেখার সময় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের স্বপ্ন নাও দেখতে পারেন।

আর ঠিক পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুন গড়ার আয়োজনে নয়, পুরাতন প্রচলিত একটা কাহিনী—সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ জয়—এতে নিজের কল্পনা মিশিয়ে এই উপন্যাসটি রচনা করেন।

মৃনালিণী পড়লে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ঐ প্রচলিত কাহিনীটিকে একরূপ বিশ্বাসই করেছিলেন। তাই তিনি প্রথম দু সংস্করণে মৃনালিণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে লিখেছিলেন।

৩য় সংস্করণ থেকে তিনি বঙ্গ জয় বদলে সেখানে গৌড় জয় করেন। এবং প্রায় এই সময় থেকেই তিনি শেষ পর্যন্ত বরাবরই তাঁর বিভিন্ন লেখায় কেবল এই কথাই লিখেছেন যে, বখতিয়ার খিলজি সমগ্র বঙ্গ নয়, শুধু গৌড় বা মধ্য বঙ্গ জয় করেছিলেন।

কয়েকটি ইংরাজি প্রবন্ধ—

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি তারিখে বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স এসোসিয়েশানের এক সভায় বঙ্কিমচন্দ্র On the origin of Hindu Festivals নামে একটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন Hon'ble Mr. Justice Phear. বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ পাঠের পর সভায় প্রবন্ধটি নিয়ে একটি সুন্দর আলোচনা হয়। ঐ আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন—Rev. J. Long, Mr. Woodrow এবং Mr. Beverly.

প্রবন্ধটি পরে বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স এসোশিয়েশানের বিবরণী বইয়ে (১৮৬৯ এর ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬৭) ছাপা হয়েছিল।

এরপর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স এসোসিয়েশানের আর এক সভায় A popular literature for Bengal নামে একটি প্রবন্ধ লিখে পড়েছিলেন। সেদিন তাঁর প্রবন্ধ পড়ার পর সভায় প্যারীচাঁদ মিত্র ও ডাক্তার এস. জি. চক্রবর্তী প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

এই প্রবন্ধটিও এসোসিয়েশানের বিবরণী বইয়ে (১৮°০, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৮-৪৩) ছাপা হয়েছিল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি ইংরাজি প্রবন্ধ The Calcutta Review পত্রিকার ১০৪ ও ১০৬ সংখ্যায় বেনামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ দুটি কাগজে ছাপাতে দেবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র কোন সভায় পড়েছিলেন কিনা জানা যায় না। প্রবন্ধ দুটির নাম যথাক্রমে—Bengali literature ও Buddhism and the Sankhya Philosophy.

১৮৭২ এর ডিসেম্বর মাসে এবং ১৮৭৩ এর মে মাসে শম্ভূচন্দ্র মুখার্জীর Mookerjee's Magazine পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ দুটির নাম যথাক্রমে—The confessions of a young Bengal ও The study of Hindu Philosophy.

'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা—

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে বমিমচন্দ্র আলিপুর থেকে বদলি হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে যান। এখানে তিনি চার বছরেরও কিছু বেশী

সময় ছিলেন। এই বহরমপুরে থাকার সময়েই ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১২৭৯ সালের বৈশাখ) বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার করেন। তিনি নিজেই এই পত্রিকার সম্পাদক হন।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে থেকে লেখা সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ করলেও পত্রিকাটি ছাপা হ'ত কলকাতার ভবানীপুরে ১নং পিপুলপটী লেনের 'সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে'। এই প্রেসের মালিক ছিলেন ব্রজমাধব বসু নামে এক দেশীয় খ্রীষ্টান।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' চলেছিল পুরা চার বছর। প্রথম বছরের বঙ্গদর্শনই কেবল ব্রজমাধব বসুর প্রেসে ছাপা হয়েছিল।

এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়িতে একটি প্রেস স্থাপন করলে, দ্বিতীয় বছর থেকে 'বঙ্গদর্শন' সেই প্রেসেই ছাপা হতে থাকে।

প্রথম বছরের বঙ্গদর্শনে মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে ব্রজমাধব বসুর নাম এবং ঐ সঙ্গে তাঁর ছাপাখানারও নাম ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয় বছর থেকে ঐ জায়গায় ছাপা হয়—'বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত'। হারাণবাবু ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্রের প্রেসে বেতনভোগী কর্মী।

কাঁটালপাড়ার 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের আমলের বহু কাগজপত্রের মধ্যে একটি পুরাতন মুদ্রিত কাগজ আমি পাই। সেই কাগজে এই কথাগুলি ছাপা আছে—

শ্রীশ্রীরাধাবল্লব
শ্রীপাদপল্লবে
সন্‌জীবনী যন্ত্র সমর্পিতং
সাতুই মাঘ বারসর্ত্ত উনআসী সালাব্দে দিবা দুই প্রহর তিন ঘটিকা।
কাঁঠালপাড়া।
শ্রীযুক্তবাবু যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" সন্‌জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

,, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

,, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

,, যোতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

,, বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

,, নলিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

,, স্বরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

,, সচিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এতে দেখা যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্র বাড়ির প্রায় সকলের উপস্থিতিতে ১২৭৯ সালের ৭ই মাঘ তারিখে গৃহ দেবতা রাধাবল্লভের চরণে সমর্পণ করে যে প্রেস স্থাপন করে ছিলেন, সেই প্রেসের নাম দিয়ে ছিলেন—সন্‌জীবনী যন্ত্র। ১২৭৯ সালের ৭ই মাঘ ছিল—১৮৭৩ এর ১৯শে জানুয়ারি, রবিবার।

আমার মনে হয়, সঞ্জীবচন্দ্র নিজের প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপার আগে বঙ্কিম-চন্দ্রের অনুরোধে বা নিজেরাই যুক্তি করে প্রেসের নাম বদলে 'বঙ্গদর্শন যন্ত্র' বা বঙ্গদর্শন প্রেস করেছিলেন।

বঙ্গদর্শন প্রেসের ছাপার কাজ ও হিসাব পত্র সঞ্জীবচন্দ্রের অবসরপ্রাপ্ত পিতা যাদবচন্দ্র এবং সঞ্জীবচন্দ্রের তৎকালীন বেকার যুবক পুত্র জ্যোতিশও দেখাশুনা করতেন।

এই ছাপাখানার সঙ্গে পত্রিকা এবং বই বাঁধাই এর জন্য একটা ছোট আকারের বাঁধাইখানা বা দপ্তরীখানাও ছিল। সেটারও মালিক ছিলেন—সঞ্জীবচন্দ্রই।

বঙ্গদর্শনের আগে আমাদের এখানে যত সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে ছিল, সে সবের চেয়ে তো বটেই, তাছাড়া সেই সময়েও যে সব পত্রিকা চল-ছিল, সেগুলির চেয়েও বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন অনেক বেশী উচ্চমানের ছিল। নানাবিধ মূল্যবান রচনা সম্ভারে ও সুসম্পাদনায় বঙ্গদর্শন ছিল অতুলনীয়। এই পত্রিকার মাধ্যমেই বঙ্কিম দেশবাসীকে দেখালেন যে, লেখক শক্তিশালী হলে শুধু গল্প উপন্যাসই নয়, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, এমন কি চুট্‌কি হালকা রচনাও সবই এই বাংলা ভাষায় সম্ভব।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজে প্রচুর লিখতেন। সাহিত্যিক বন্ধুদের ভাল ভাল লেখা ছাপতেন। আর বঙ্গদর্শনের জন্য কয়েকজন লেখকও তৈরি করে নিয়ে ছিলেন।

বঙ্গদর্শন পড়ে পরে পরে অতটা উঁচু ধরণের না হলেও বাংলায় আরও অনেকগুলি পত্রিকা বঙ্গদর্শনকে আদর্শ করে প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' কিভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছিল, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজবদুন্নত-ধ্বনিঃ'। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিক পত্র কত সংবাদ পত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।'
—আধুনিক সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি সম্বন্ধে ভবতোষ দত্ত তাঁর 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

বঙ্কিমের মৃত্যুর পর চৈতন্য লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনা যে প্রবন্ধ পড়েন, তাতে তিনি বঙ্গদর্শনের প্রথম আবির্ভাবকে সম্রাটের প্রথম সমাগমের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

ভবতোষবাবু যে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরীতে প্রবন্ধ পড়ে ছিলেন, এ কথা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ পড়ে ছিলেন ষ্টার থিয়েটারে। সে সভার অবশ্য উদ্যোক্তা ছিল চৈতন্য লাইব্রেরী।

আর একটা কথা, রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে তো দেখা যাচ্ছে, তিনি বঙ্গ-দর্শনের প্রথম আবির্ভাবকে সম্রাটের প্রথম কেন, কোন সমাগমের সঙ্গেই তুলনা করেন নি। তুলনা করেছেন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার সঙ্গে। বর্ষার মুষল ধারায় নদী নির্ঝরিণী যেমন পরিপূর্ণ হয়, তেমনি বঙ্গদর্শনেরও মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনকে আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত বলেই, কালিদাসের ঋতুসংহার থেকে যে উদ্ধৃতিটুকু দিয়েছেন, সে তো বর্ষাকে বোঝাতেই। বর্ষা সেখানে 'রাজবদুন্নতধ্বনি'। ঐ শ্লোকে কবি বলেছেন—বর্ষার কালমেঘ, বিদ্যুৎ ও বজ্রনাদ, যথাক্রমে রাজার মত্ত মাতঙ্গ, বিজয় পতাকা ও আগমন ঘোষণার বাদ্য ধ্বনি।

এখানে বঙ্গদর্শন আষাঢ়ের বর্ষার মত, আর বর্ষা রাজবৎ বা রাজার মত।

বঙ্গদর্শন আষাঢ়ের বর্ষার মত, আবার আষাঢ়ের বর্ষাও রাজার মত; অতএব বঙ্গদর্শনই রাজা মত, এরূপ অর্থ করলে ঠিক হবে না এইজন্য যে, তাহলে রবীন্দ্রনাথ বর্ষার বারি বর্ষণের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের ভাব বর্ষণের যে সামঞ্জস্য দেখাতে চেয়েছেন, তা আর থাকে না। তাই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনকে 'সম্রাটের প্রথম সমাগমের সঙ্গে' নয়, আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার সঙ্গেই তুলনা করেছেন। এই আমার ধারণা।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন বন্ধ করে দিলে, তার এক বছর পর থেকে সঞ্জীবচন্দ্র আবার কয়েক বছর এই বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন। সে কথা আমি আমার 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে এবং 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য' বইয়েও বিস্তৃত ভাবে বলেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে যেমন প্রচুর লিখতেন, তেমনি সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনেও অনেক লিখেছিলেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত নিজের অধিকাংশ লেখাকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গ্রন্থভুক্ত করে গেছেন। পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাঁদের নিজেদের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী বঙ্গদর্শনের কিছু লেখকের-নামহীন-লেখাকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে তাঁদের সম্পাদিত বঙ্কিম-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করে যান।

তবুও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐরূপ স্বাক্ষরহীন কিছু লেখা এখনও বঙ্গদর্শনের পাতায় রয়ে গেছে বলে, আমার মনে হয়।

মনে হয়, বলার কারণ, তখন যেহেতু অধিকাংশ লেখার সঙ্গেই লেখকের নাম থাকত না, তাই আজ ঐ সব নামহীন বঙ্গদর্শনের অবশিষ্ট লেখাগুলির মধ্যে কোন্‌টি কার রচনা তা বলা খুবই মুস্কিল। এই নিয়ে এক একজন এক এক রকম মতও প্রকাশ করে যাচ্ছেন। যেমন—বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'পলাশির যুদ্ধ' ও 'বৃত্রসংহারে'র সমালোচনাকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে স্থির করে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত তাঁদের সম্পাদিত বঙ্কিম-রচনাবলীর বিবিধ খণ্ডে দিয়ে গেছেন।

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে ঐ রচনা দুটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে মনে করেন না। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

'বঙ্কিমের সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের মধ্যে আর একজন মহারথী সমালোচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ছিলেন, এক বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত তাহার

অন্য তুলনা নাই। ইনি বান্ধব-সম্পাদক পরলোকগত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়। সুনিপুণ গুণগ্রাহিতায় কালীপ্রসন্ন বঙ্কিম অপেক্ষা বড় ন্যূন ছিলেন না। পলাশীর যুদ্ধ, দশমহাবিদ্যা, বৃত্রসংহার প্রভৃতির সমালোচনা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু কোনও গ্রন্থের নিন্দা করিবার সময় বঙ্কিমের সমালোচনার ন্যায় তদীয় সমালোচনায় বিদ্রূপের বিষজ্বালা কদাপি উৎকট ভাব ধারণ করিত না।'

বিষবৃক্ষ—

'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা থেকেই অর্থাৎ ১২৭৯ সালের বৈশাখ (১৮৭২এর এপ্রিল-মে) থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি এই পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। একটানা ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ১১ মাস ধরে প্রকাশিত হয়।

পরে ১৮৭৩ এর ১লা জুন 'বিষবৃক্ষ' বই আকারে প্রকাশিত হয়। 'বিষবৃক্ষ' কাঁটালপাড়ায় বাড়ির বঙ্গদর্শন প্রেসেই ছাপা হয়েছিল। এই বইয়ের ১ম সংস্করণের আখ্যাপত্রে লেখা ছিল—কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। ১২৮০।

'বিষবৃক্ষ' ১ম সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল—২১৩।

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত তাঁদের 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' গ্রন্থে লিখেছেন—'১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৮০) কাঁটালপাড়ায় বঙ্গদর্শন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতা হইতে বঙ্গদর্শন কার্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত হয়।'

আমার এই বইয়ের ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত সঞ্জীবনী যন্ত্রালয় বা প্রেস সংক্রান্ত টুকরো কাগজটি ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অসংখ্য কাগজের মধ্যে আবিষ্কার করার আগে আমিও অনেকের মত আমার অন্য বইয়ে বঙ্গদর্শন প্রেস স্থাপনের তারিখের ব্যাপারে ব্রজেনবাবুদেরই অনুসরণ করেছি। কিন্তু এখন একাধিক কারণে দেখছি, এঁদের দেওয়া তারিখ ভুল। সঞ্জীবনী প্রেস সংক্রান্ত ঐ আবিষ্কৃত কাগজটি বড় প্রমাণ তো বটেই, তাছাড়াও আর একটা কথা—১২৮০ সালের ১লা বৈশাখেই যদি কাঁটালপাড়ায় বঙ্গদর্শন প্রেস স্থাপিত হয়, তাহলে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে ১লা জুনের

মধ্যে মাত্র দেড় মাসে একটা ছোট বা মাঝারি প্রেসে বঙ্গদর্শন পত্রিকা ছাপার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ২১৩ পাতার বইও ছাপা হতে পারে না।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষ' প্রায় হুবহুই ১ম সংস্করণ 'বিষবৃক্ষ' বই হয়ে বেরিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে এই বইয়ের ৮টি সংস্করণ হয়েছিল। ৮ম সংস্করণ হয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। ১ম সংস্করণের পর অন্য সংস্করণগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' বইটি উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর প্রিয় বন্ধু জগদীশনাথ রায়কে। উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন—

কাব্যপ্রিয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্তবাবু জগদীশনাথ রায় সুহৃদ্বরকে
এই গ্রন্থ বন্ধুত্ব ও স্নেহের চিহ্নস্বরূপ অর্পিত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর যাওয়ার আড়াই বছর পরে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। বহরমপুর যাওয়ার আগে ২ বছর ৩ মাসের মত সময় তিনি ছিলেন আলিপুরে। তার আগে মাস দুই কাজ করেছিলেন গবর্ণমেণ্ট আমলাদের বেতন নির্ধারণের কমিশনে। তারও আগে ছিলেন বারুইপুরে।

এই সব দেখে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' রচনার সূচনাও করেছিলেন বহরমপুরেই।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি একবার আগেকার বারুইপুর মহকুমার অন্তর্গত (বর্তমানে আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত) মজিলপুর গ্রামে গেলে ঐ গ্রামের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত আমাকে বলেছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র মজিলপুরে তাঁদের বৈঠকখানায় বসে বিষবৃক্ষ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এই বলে তিনি তাঁদের বৈঠকখানার দেওয়ালে পাথরে লিখে রাখা এই লেখাটা দেখিয়ে ছিলেন—

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কিছুদিন এই বাটীতে ছিলেন।
ঐসময় এখানে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিষবৃক্ষের প্রথমাংশ রচিত হয়।

আমার এই বই লেখার সময় আর একদিন মজিলপুরে গিয়েছিলাম। কালিদাসবাবুদের সম্পত্তি তাঁর জ্ঞাতিদের ও তাঁর পুত্রদের মধ্যে এখন ভাগ হয়ে যাওয়ায় ঐ পাথরটি বর্তমানে কালিদাসবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র অমল দত্তর বাড়িতে আছে।

কালিদাসবাবু সেদিন আরও বলেছিলেন—তাঁদের বংশেই নগেন্দ্রনাথ দত্ত নামে একজন গণ্যমান্য জমিদার ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে দেখেই বা তাঁর কথা স্মরণ করেই বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র দত্তর চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে মাঝে মাঝে যে মজিলপুরে যেতেন এবং গিয়ে সেখানকার দত্তদের বাড়িতেই থাকতেন, সেটা সত্য। কারণ, বারুইপুর রেজিষ্ট্রি অফিসের হেড ক্লার্ক, বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজ কালীনাথ দত্ত (এঁরও বাড়ি মজিলপুরেই) তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে লিখেছেন—একবার বঙ্কিমচন্দ্রের মজিলপুরে অবস্থিতিকালে, দীনবন্ধু মিত্র ও জগদীশনাথ রায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

কালীনাথবাবু আরও লিখেছেন—'বঙ্কিমবাবু কি অপর হাকিমেরা যখন মজিলপুরে আসিতেন, তখন মজিলপুরস্থ বাবু হরমোহন দত্তের বৈঠকখানা বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। সে সময় ৺ হরমোহন দত্তের এস্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে ছিল এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্রদ্বয় ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনে বাস করিতেছিলেন।' —বঙ্কিম প্রসঙ্গ।

হরমোহন দত্তর দুই নাবালক পুত্র হেমনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ পিতৃমাতৃহীন হয়ে তখনকার সরকারী নিয়ম অনুযায়ী সরকার পরিচালিত ওয়ার্ডস ইনিষ্টিটিউশনে থাকতেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারির কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র পূর্বোক্ত কালিদাস দত্ত।

তখনকার দিনে একটা মহকুমার অন্তর্গত ছোট ছোট শহরে বা বর্ধিষ্ণু গ্রামেও ক্যাম্প কোর্ট বসত। মহকুমা শাসক নির্দিষ্ট দিনে সেই ক্যাম্প কোর্টে গিয়ে স্থানীয় মামলা মোকদ্দমার বিচার করে আসতেন।

মজিলপুরের পাশে বিষ্ণুপুরে ক্যাম্প কোর্ট হত। সেই ক্যাম্প কোর্টের ডাক বাংলো আজও (১৯৮১খ্রীঃ) আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ক্যাম্প কোর্টে বিচারের জন্য মাঝে মাঝে বারুইপুর থেকে আসতেন। এসে ডাক বাংলোয় না থেকে ঐ দত্তদের বৈঠকখানা বাড়িতেই থাকতেন। তখন দত্ত বাড়ির কোন নগেন্দ্র দত্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও হয়ে থাকতে পারে।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম জীবনী' ১ম সংস্করণের ৪৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের অট্টালিকার বর্ণনা পড়িলে মজিলপুরের দত্তবাবুদের অট্টালিকা মনে পড়ে।...বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুরে ছিলেন, তখন

তিনি দত্তবাবুদের অট্টালিকা বহুবার দর্শন করিয়াছিলেন, বারুইপুর ত্যাগ করিবার কিছু পরে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ লিখিতে আরম্ভ করেন।'

এই লেখা থেকেও দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষে যেভাবেই হোক মজিলপুরের দত্ত বাড়ির কিছু প্রভাব রয়েছে। আর শচীশবাবুও বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর ত্যাগ করার কিছু পরে বিষবৃক্ষ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

বিষবৃক্ষ প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকারেরও একটা লেখা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বহরমপুরে থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন' বার করেন, তখন অক্ষয়বাবু সেখানে থেকে বহরমপুর কোর্টে ওকালতি করতেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই অক্ষয়বাবুরও লেখা বেরিয়েছিল। বঙ্গদর্শন প্রথম বেরোবার পর দেড় বছরেরও বেশী সময় অক্ষয়বাবু বহরমপুরে ছিলেন। তিনি লিখেছেন—

'নিজের লেখা নিজে নষ্ট করিতে প্রাণ ধরিয়া মানুষ যে সেরূপ পারে বঙ্কিমবাবুর সাধনা দেখিবার পূর্বে আমার জ্ঞান ছিল না। বিষবৃক্ষের এবং আনন্দমঠের সূতিকা-সমাচার আমি কিছু কিছু জানি। বিষবৃক্ষ বহরমপুরে হয়। প্রথম নাম হইয়াছিল, 'উভয়েরই দোষ'; নগেন্দ্র এবং দেবেন্দ্রে বিপুল একটা মোকদ্দমা হাইকোর্টে পর্যন্ত হইয়াছিল। আমার সাক্ষাতে সেই খণ্ড খণ্ডীকৃত হইয়া অতলে গিয়াছে। সমগ্র উভয়ের দোষ পাল্টাইয়া লেখা হইয়াছে 'বিষবৃক্ষ'। সমীচীন পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উভয়েরই দোষ সাব্যস্ত হইলে সূর্যমুখীর নিতান্তই দুর্দশা হইত। এখন যে ভাল হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সাধনার কথা ভাবিলে এখনও সন্ত্রস্ত হইতে হয়'।—বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহাব প্রথম গন্থ রচনা। —বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) ভাদ্র ১৩১৯।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা। প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম' বইয়ে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের 'নগেন্দ্রর তে-মহলা' বাড়ির কথায় পাদটীকায় লিখেছেন—'হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন, এই বর্ণনায় কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় পরিবারের গৃহদেবতা রাধাবল্লভজীর বাড়ির ছায়া রয়েছে।' —বঙ্কিমচন্দ্র, প্রথম ভাগ, ১৪-১৬ পৃঃ।'

প্রফুল্লবাবু এই কথা লিখে ভুল করেছেন। কারণ, বঙ্কিম নগেন্দ্রের বাড়ির 'বাহিরে তিন মহল, ভিতরে তিন মহল। এক একটি মহল, এক একটি বৃহৎ পুরী।' বলে যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে রাধাবল্লভজীর বাড়ির

বা মন্দিরের কেন, কোন বিখ্যাত ধনী পরিবারেরও গৃহ দেবতার বাড়ির তুলনা হতে পারে না। রাধাবল্লভজীর মন্দির চিরকালই একটি মাত্র ছোট্ট বাড়িতেই সীমাবদ্ধ। নগেন্দ্র দত্তর প্রথম মহলেরই একাংশ 'পূজার বাড়ি'র নাট-মন্দির, পূজারীদের থাকার ঘর, অতিথিশালা প্রভৃতির মত রাধাবল্লভজীর মন্দির কোন কালেই ছিল না।

প্রফুল্লবাবু হেমেন্দ্রবাবুর লেখা উদ্ধৃত করতে গিয়েও ভুল করেছেন। কারণ, হেমেন্দ্রবাবু শুধু রাধাবল্লভের মন্দির বলেন নি। তিনি বলেছেন—'রাধাবল্লভের মন্দির ও চাটুজ্যে বাড়িরই ছায়া।' অবশ্য হেমেন্দ্রবাবুও বিষবৃক্ষে বর্ণিত নগেন্দ্র দত্তর বিরাট বিরাট মহলের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রদের ক্ষুদ্র মহল ও ঠাকুর বাড়ির তুলনা করতে গিয়ে ঠিক করেন নি।

শচীশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখেছেন—বিষবৃক্ষে 'হরদেব ঘোষালের পত্র দুইখানি শুনিতে পাই স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায় কর্তৃক লিখিত।'—পৃষ্ঠা ২৭৩ ৩য় সংস্করণ।

১৩০১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় শ্রীশ মজুমদার তাঁর 'বঙ্কিম-বাবুর প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছেন—'আমি (বঙ্কিমচন্দ্রকে) বলিলাম—শুনেছি বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা ?

উত্তর—কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হইয়াছে।'

নবীন সেন তাঁর 'আমার জীবনে'ও লিখেছেন—'আমাকে অক্ষয়বাবু (নব-জীবন-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার) সত্যই বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে। তিনিই সূর্যমুখী।'

শ্রীশ মজুমদার ও নবীন সেন এঁরা এই কথা লিখে বঙ্কিমচন্দ্রের পতিভক্তি-পরায়ণা দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীর কথাই বলেছেন।

ইন্দিরা—

১২৭৯ সালের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ইন্দিরা প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর বঙ্গদর্শনের ঐ লেখাই ১২৮০ সালে 'ইন্দিরা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইন্দিরা কাঁটালপাড়ার বঙ্গদর্শন প্রেসেই ছাপা হয়েছিল।

১ম সংস্করণে এই বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৫ এবং বইয়ের দাম ছিল—চার আনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে এই বইয়ের ৫টি সংস্করণ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর এক বছর আগে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দিরাকে বাড়িয়ে ১৭৭ পৃষ্ঠার বই করেন। ইন্দিরাকে এই বড় আকারের করা সম্বন্ধে তখন ঐ ৫ম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—

' পাঠক বোধ হয়, ইন্দিরার কলেবর বৃদ্ধির কারণ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহা বুঝাইতে গেলে, আপনার পুস্তকের আপনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে অবিধেয় কার্যে আমার প্রবৃত্তি নাই। যিনি বোদ্ধা, তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃসংযোগ দিয়া পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তাহাতে কি কি দোষ ছিল এবং এক্ষণে তাহা কি প্রকারে সংশোধিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে, পুরাতন নামে এ একখানা নূতন গ্রন্থ।...'

১ম সংস্করণ ইন্দিরা ৮ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ ছিল, ৫ম সংস্করণে করা হয় ২১ পরিচ্ছেদ। ১ম সংস্করণে পরিচ্ছেদের সঙ্গে পরিচ্ছেদের নাম করণ ছিল না। ৫ম সংস্করণে প্রতিটি পরিচ্ছেদের সঙ্গে, পরিচ্ছেদের নামও দেওয়া হয়। যেমন —প্রথম পরিচ্ছেদ—আমি শ্বশুর বাড়ি যাইব। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শ্বশুরবাড়ি চলিলাম, ইত্যাদি।

ইন্দিরা উপন্যাসে গল্পের নায়িকা ইন্দিরা নিজের জবানীতে কাহিনীটি বলে গেছে। ইংরাজি সাহিত্যের অনুকরণে বঙ্কিমই প্রথম বাংলা সাহিত্যে এইরূপ উপন্যাসের একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে কাহিনী বলার রীতি প্রবর্তন করেন।

যুগলাঙ্গুরীয়—

১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'যুগলাঙ্গুরীয়' প্রথম প্রকাশিত হয়। বছর খানেক পরে ১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮৭৪ এর ২রা জুন) যুগলাঙ্গুরীয় বই আকারে বেরোয়। এই বইও কাঁটালপাড়ার বঙ্গদর্শন প্রেসে ছাপা হয়েছিল। প্রথম সংস্করণ যুগলাঙ্গুরীয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৬। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে যুগলাঙ্গুরীয়ের ৫টি সংস্করণ হয়েছিল। ৫ম সংস্করণ হয় ১৮৯৩য়ে। বঙ্কিমচন্দ্র ৫ম সংস্করণে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছিলেন। তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০।

যুগলাঙ্গুরীয়ের কাহিনীর উৎস সম্বন্ধে শচীশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখেছেন—

'তাম্রলিপ্তের ঘটনা লইয়া যুগলাঙ্গুরীয় রচিত। যুগলাঙ্গুরীয় রচিত হইবার প্রায় পনের বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র একবার তমলুকে আসিয়াছিলেন।··· তমলুকের দৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে গভীর অঙ্কপাত করিয়াছিল। পনর বৎসরেও তিনি তাহা ভোলেন নাই। পনের বৎসর পরে তিনি তমলুকের সেই চিত্র উঠাইয়া লইয়া যুগলাঙ্গুরীয়তে আঁকিয়া ছিলেন।'

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বড়দা শ্যামাচরণবাবু সেখানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন নেগুয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বড়দার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

লোক রহস্য—

'লোক রহস্য' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ পুস্তক। এই পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর অর্থাৎ ১২৮১র অগ্রহায়ণে। এই বইয়ের প্রথম সংস্করণে মোট ৮টি প্রবন্ধ ছিল। প্রবন্ধগুলি সবই প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল।

'লোক রহস্য' বঙ্গদর্শন প্রেসে ছাপা হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৯৯। বইয়ের আখ্যাপত্রে 'কৌতুক ও রহস্য' কথা লেখা ছিল। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বা ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'···বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, রহস্য মাত্র গালি, গালি ভিন্ন রহস্য নাই। সুতরাং তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এই সকল প্রবন্ধে যে কিছু ব্যঙ্গ আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষকে গালি দেওয়া মাত্র। এই শ্রেণীর পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে, তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পাঠ না করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। ব্যক্তি বিশেষের যে দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের কোন অধিকার নাই— কদাচিৎ অবস্থা বিশেষে অধিকার জন্মে; যথা—ভ্রান্ত রাজ-পুরুষের ভ্রান্তি-জনক কার্যের প্রতি, অথবা মূর্খ গ্রন্থকর্তার গ্রন্থের প্রতি রহস্য প্রযুক্ত। এ গ্রন্থের

সে সকল উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে শ্রেণী বিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।'

বর্ধিত আকারে 'লোক রহস্যের' ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। এবার পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ১৭৪। এই ২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে ছিলেন—'লোক রহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অর্ধেক পুরাতন ও অর্ধেক নূতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নূতন, আটটি পুরাতন, এবং একটি (রামায়ণের সমালোচন) পুরাতন হইলেও নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। সকলগুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত।'

১৮৮৪র জুলাই মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে 'প্রচার' পত্রিকা বার করেন। প্রচার বছর পাঁচেক চলেছিল।

বিজ্ঞান রহস্য—

প্রথম দু বছরের বঙ্গদর্শনে অর্থাৎ ১২৭৯ ও ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম-চন্দ্রের যে সব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি নিয়ে এবং সেগুলির সঙ্গে ১২৮১ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত আর একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়ে এই গ্রন্থটি রচিত হয়। ১ম সংস্করণ 'বিজ্ঞান রহস্য' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ এর ১৯শে এপ্রিল অর্থাৎ ১২৮২র বৈশাখে। তখন এই বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৭০ এবং বইয়ের দাম ছিল আট আনা। বই ছাপা হয়েছিল বাড়ির বঙ্গদর্শন প্রেসে।

১ম সংস্করণ বিজ্ঞান রহস্যের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত হইয়া এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধ-গুলি লেখকের সন্তোষজনক হয় নাই—কৃতবিদ্য পাঠকেরও হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনায় অনেক পুস্তকের সাহায্য প্রয়োজন করে; এ সকল প্রবন্ধ যেখানে লিখিত হইয়াছিল, সেখানে বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাওয়া কষ্টকর। অনেক কথা কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে—অথচ স্মৃতির ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনী কেহ নাই। লিখিত বিষয়ের যথার্থ নিরূপন জন্য অনেক সময় আবশ্যক, লেখক সময়াভাবে নিতান্ত কাতর। অতএব এই সকল প্রবন্ধে যে অনেক ভ্রান্তি আছে, ইহা নিতান্ত সম্ভব। যিনি যেখানে ভ্রম দেখিবেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা লেখককে জানাইবেন। ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করা যাইবে।...

লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা এবং আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী, বুঝিতে পারেন। কতদূর সে উদ্দেশ্য সফল হইবে, বলিতে পারি না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বইয়ের আর একটি সংস্করণ হয়েছিল। এই ২য় সংস্করণে ১ম সংস্করণের অন্তর্গত 'সর উইলিয়ম টমসন কৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা' প্রবন্ধটির পরিবর্তে ১২৮১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভ্রমর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'চন্দ্রলোক' প্রবন্ধটি দেওয়া হয়েছিল।

'ভ্রমর' সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত একটি মাসিক পত্রিকা। বঙ্কিম এই পত্রিকাতেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

চন্দ্রশেখর—

'চন্দ্রশেখর' প্রথমে ১২৮০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১২৮১র ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত, এই ১৪ মাস ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে বই হয়ে বেরোয় ১২৮২ সালে (১৮৭৫ এর ১লা জুন)। বই ছাপা হয়েছিল কাঁটালপাড়ার বঙ্গদর্শন প্রেসে। ১ম সংস্করণ চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৯৫।

১ম সংস্করণ চন্দ্রশেখরের 'বিজ্ঞাপনে' বা ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'চন্দ্রশেখর প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়াছে। অনেকাংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে এবং কোন কোন স্থান পুনর্বার লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সয়ের মতাক্ষরীণ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে; ঐতিহাসিক বিষয়ে কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ, ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রাঙ্কনের যোগ্য।'

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে এই বইয়ের আর দুটি সংস্করণ হয়েছিল। ২য় এবং ৩য় সংস্করণেও বঙ্কিমচন্দ্র সংশোধন ও পরিবর্তন করেছিলেন। ৩য় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল—২৩১।

দুর্গেশনন্দিনী ও মৃনালিণীতে যেমন জ্যোতিষের কথা আছে, এই বইয়েও তেমনি জ্যোতিষ গণনার কথা আছে। এতে আরও অতিরিক্ত আছে আধ্যাত্মিক যোগবলের কথা।

দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামী ও মৃনালিণীর মাধবাচার্যের ন্যায় চন্দ্রশেখরেও ঠিক ঐ ধরণেরই একটি চরিত্র হল রমানন্দ স্বামী।

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃনালিণীতে যেমন নায়িকাদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি করে পরে তার নিরসনের কথা আছে, চন্দ্রশেখরেও তাই করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই বইটি তাঁর ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন—

অনুজ শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে

এই গ্রন্থ স্নেহ-চিহ্ন স্বরূপ উপহার প্রদত্ত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসে লেখার মধ্যে দু এক জায়গায় একটু করে অসঙ্গতি থেকে গেছে বলে আমার মনে হয়। যেমন---

চন্দ্রশেখর পড়ে জানা যায়, মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে বেদগ্রামে চন্দ্রশেখর, প্রতাপ ও শৈবলিনী তিন জনেরই বাড়ি। আর এও জানা যায়, প্রতাপ গ্রামে চন্দ্রশেখরের প্রতিবেশী।

শৈবলিনীর বাড়ি বেদগ্রামে বইয়ে এ কথায় ঠিক উল্লেখ না থাকলেও, শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতি কন্যা, বাল্য ও কৈশোরে দুজনে একসঙ্গে মেলামেশা করে, গঙ্গার একই ঘাটে নেমে জলে সাঁতার দেয়—এ সব থেকে শৈবলিনীর বাড়িই শুধু বেদগ্রাম নয়, তাকে প্রতাপের প্রতিবেশিনী বলে মনে হয়।

বঙ্কিম লিখেছেন—চন্দ্রশেখর ডুবন্ত প্রতাপকে তাদের বাড়িতে নিয়ে এলে প্রতাপের মা চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে পড়ে তাকে আতিথ্য স্বীকার করাল।

চন্দ্রশেখর মহা উপকার করলেও বয়োজ্যেষ্ঠা প্রতাপের মা প্রতিবেশী বয়োকনিষ্ঠের পায়ে পড়েছিল, এ কি সম্ভব?

বঙ্কিম লিখেছেন—প্রতাপের মা চন্দ্রশেখরকে আতিথ্য স্বীকার করাল। চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানলেন না।

শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাকে দেখলেন —দেখে বিমুগ্ধ হলেন।

শৈবলিনীকে দেখে সংযমী চন্দ্রশেখরের ব্রত ভঙ্গ হল। ভেবে চিন্তে কিছু ইতস্তত করে অবশেষে চন্দ্রশেখর নিজেই ঘটক হয়ে শৈবলিনীকে বিয়ে করেন।

এখানে 'চন্দ্রশেখর ভিতরের কিছু জানলেন না' এই কথা থেকে একটা অর্থ হতে পারে—প্রতাপের মা চন্দ্রশেখরকে আতিথ্য স্বীকার করিয়ে ভিতরে ভিতরে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে ছিলেন।

কিন্তু বইয়ের, শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাল না লেখা থেকে তা মনে হয় না। কারণ, যে শৈবলিনী স্থির করেছিল প্রতাপকে মুখ দেখাবে না, সে সেইদিনেই আবার প্রতাপদের বাড়িতে এসেছিল?

আর একটা কথা, চন্দ্রশেখর যে সেদিন শৈবলিনীকে দেখে মুগ্ধ হল, সে কি গ্রামের বা পাড়ার মেয়ে শৈবলিনীকে আগে কোনদিন দেখেনি? না ঐ দিন বিশেষ করে দেখে ছিল?

চন্দ্রশেখরের ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বঙ্কিম লিখেছেন—প্রতাপ শৈবলিনীকে বললে—তোমার বিয়ের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করেছিলাম। আমি তোমার কি করেছি?

শৈবলিনী গর্জে উঠে বললে—তুমি কি করেছ? কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্তি নিয়ে আবার আমায় দেখা দিয়ে ছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপোর জ্যোতি কেন আমার সামনে জ্বেলে ছিলে? যা একবার ভুলে ছিলাম, আবার কেন তা উদ্দীপ্ত করেছিলে?···ইত্যাদি।

এখানে শৈবলিনী ঐ যে বলেছে—আবার কেন আমায় দেখা দিয়ে ছিলে? —সমগ্র বইয়ে শৈবলিনীর বিয়ের পর ঐ 'আবার' দেখা দেওয়ার কোন হদিস বা উল্লেখই নেই। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে চন্দ্রশেখর লিখছিলেন—তখন সেখানে ঐ আবার দেখা দেওয়ার একটা কথা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বঙ্গদর্শনে লিখেছিলেন—

'চন্দ্রশেখর প্রতাপের দুইটি উপকার করিলেন। প্রথম ঘটকালি করিয়া রূপসীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। দ্বিতীয় মুর্শিদাবাদে চাকরি করিয়া দিলেন।

চাকরি আরম্ভ করিয়া প্রতাপ দুই চারি বৎসরে প্রাধান্য লাভ করিলেন। সে সকল কালে দুই এক বৎসর চাকরি করিয়া লোকে জমিদার হইত। প্রতাপের দ্বারা পূর্বতন নবাব একদিন বিশেষ উপকৃত হইলেন। প্রত্যুপকার স্বরূপ তাঁহাকে একখানি জমিদারি দিলেন। প্রতাপ চাকরি ত্যাগ করিয়া জমিদারিতে বসিলেন।

শৈবলিনী প্রতাপকে না দেখিয়া ভুলিয়া গেল। রূপসীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইলে কোন গোল ছিল না। জমিদারিতে বসিয়া প্রতাপ মধ্যে মধ্যে শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেখিতে আসিতেন। শৈবলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনী দেখিল, তাহার সেই বাল্যসখা প্রতাপ মহেন্দ্র-নিন্দিত বীরকান্তি ধারণ করিয়াছে। শৈবলিনী সৌন্দর্যতৃষ্ণায় পুড়িতে লাগিল।'

বঙ্কিম বইয়ে এই লেখার শেষাংশটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। তাই বইয়ে ঐ 'আবার' দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি ছিন্ন হয়ে গেছে।

এই লেখার রূপসী ছিল চন্দ্রশেখরের ভগিনী সদৃশা প্রতিবেশিনী সুন্দরীর ছোট বোন। শৈবলিনী স্বামীর বাড়ি এলে তার সখী বা বান্ধবী হয়েছিল সুন্দরীই। সুন্দরী তার স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়িতেই থাকতো।

চন্দ্রশেখরে ৪র্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হবে জেনে 'জমিদার' ও 'দস্যু' প্রতাপ আহ্লাদিত হয়ে ভাবল—যার যেমন শক্তি তার কর্তব্য এই কাজে নবাবের সাহায্য করা। আমার সৈন্য নেই কেবল লাঠিয়াল আছে, দস্যু আছে। তাদের দ্বারা কোন্ কার্য হতে পারে? আর কিছু কাজ না হোক্ লুঠপাঠ হতে পারে।...ইত্যাদি।

কিন্তু এই বইয়েই ৬ষ্ঠ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদে দেখছি, বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী নবাবের পলায়ন-উদ্যত সেনাদের অনুগামী হয়ে অকস্মাৎ দেখল—সামনে একদল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা। রণমত্ত হয়ে দৃঢ় পর্বতরন্ধ্রপথে নির্গত হয়ে ইংরেজরণে সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। তাদের নায়ক অশ্বারোহী প্রতাপ।

এখানে প্রতাপের হিন্দুসেনা বলতে তার লাঠিয়াল দস্যু দল হওয়াই সম্ভব।

বঙ্কিম বইয়ে লিখেছেন—ইংরেজ কামান নিয়ে নবাবের তাঁবু আক্রমণ করেছিল।

প্রতাপের হিন্দুসেনারা কি লাঠি নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল, না এখানে 'অস্ত্র' বলতে বঙ্কিম লাঠি ছাড়া অন্য অস্ত্রের ইঙ্গিত করেছেন?

আর একটা কথা। বঙ্কিম লিখেছেন—প্রতাপ পর্বতরন্ধ্রপথে নির্গত হয়ে রণে যাচ্ছে।—এই প্রসঙ্গেই আরও লিখেছেন—প্রতাপ 'পর্বতমালামধ্যস্থ নির্গমন পথ সকল সবিশেষ অবগত ছিলেন।'

চন্দ্রশেখর পড়ে জানা যায়, ইংরেজ নবাবের মুর্শিদাবাদের তাঁবু আক্রমণ করেছিল। কারণ—বইয়ের ৬ষ্ঠ খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছে, বেদগ্রামে চন্দ্রশেখর

নিজের বাড়িতে রুগ্না স্ত্রীর যোগবলে চিকিৎসার সময় বাড়িতে উপস্থিত সকলকে বলেছিল—'এ নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, এই পাত্রস্থ ঔষধ খাওয়াইও। সম্প্রতি নবাবের সৈনিক আসিতেছে, কল্য শৈবলিনীকে লইয়া যাইব। তোমরা সঙ্গে যাইও।'

পরের দিন যথা সময়ে তাঁবুর মধ্যে নবাবের দরবারে শৈবলিনী হাজিরও হয়েছিল। আমরা জানি বেদগ্রাম মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে। তাই অনতি-দূরে মুর্শিদাবাদে সেদিন রুগ্ন শৈবলিনীর যাওয়াও সম্ভব হয়েছিল।

এ সব থেকে দেখা যাচ্ছে, সেদিন বৃহৎ তাঁবুতে নবাবের দরবার বসেছিল মুর্শিদাবাদের রাজধানীতেই, মুঙ্গেরে নয়।

অতএব বঙ্কিমের বর্ণনা মত ইংরেজের সঙ্গে নবাবের বা প্রতাপের যুদ্ধ হয়েছিল মুর্শিদাবাদে। তাই যদি হয়, তাহলে মুর্শিদাবাদে 'পর্বতমালা' আসে কোথা থেকে ? এখানে পর্বতের নাম গন্ধও নেই। আমার মনে হয়, এখানে প্রতাপের যুদ্ধে যাওয়ার কথা লিখতে গিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে অজ্ঞাতসারে হলদিঘাটার যুদ্ধের রাণা প্রতাপের কথাই মনে এসে গিয়েছিল।

চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্রের অসঙ্গতির কথা লিখতে গিয়ে সুধাকর চট্টো-পাধ্যায় তাঁর 'কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রুটি ও অসঙ্গতি বলে যা লিখেছেন, সেকথাও মনে পড়ছে। সুধাকরবাবু লিখেছেন—

'প্রতাপ সম্বন্ধে আমরা এক স্থলে শুনি—'চন্দ্রশেখর নবাবের দরবারে প্রতাপের চাকরি করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমিদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা এবং দেশ বিখ্যাত নাম'—(চন্দ্রঃ ২।৪)· ·

অন্যত্র নবাব যে তাঁকে জানেন না, এ কথাই আমরা শুনতে পাই। শৈবলিনীকে পরবর্তীকালে (চন্দ্রঃ ৩।২) মীরকাশিম প্রশ্ন করছেন—

'প্রতাপ কে ? তাহার বাড়ি কোথায় ?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল ?

শৈ। সরকারের চাকরি করিবেন বলিয়া।

প্রতাপ নবাব সরকারে চাকরি করে স্বীয়গুণে উন্নতি লাভ করে বর্তমানে জমিদার হয়েছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ), তিনি নূতন করে আবার

সরকারে চাকরির জন্য আসবেন, এ কথার অর্থ কি? এখানে দেখা যাচ্ছে নবাব তাঁকে জানেন না।'

সুধাকরবাবুর এই লেখাটি সম্বন্ধে প্রথমেই বলছি—এখানে বঙ্কিমের কোথাও অসঙ্গতি বা ত্রুটি নেই। তিনি ঠিকই লিখেছেন।

সুধাকরবাবু নিজেই না বুঝে বঙ্কিমের লেখায় ত্রুটি বলেছেন। আর নিজের সমর্থনে বঙ্কিমের লেখার মাঝখান থেকে নিজের পছন্দ মাফিক সামান্য একটু লেখা উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন। অথচ সুধাকরবাবুর এই উদ্ধৃতির আগের ও পরের কয়েকটা কথা দেখালেই একজন অতি সাধারণ পাঠকেও বুঝতে পারবেন যে, বঙ্কিম ঠিকই লিখে গেছেন। এখন সুধাকরবাবুর উদ্ধৃতির আগের ও পরের কথাগুলি সহ সবটাই উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

'নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন তাঁহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে জান?

শৈবলিনী এতক্ষণ সত্য বলিতেছিল, এখন মিথ্যা আরম্ভ করিল। বলিল—না।

ন। প্রতাপ কে? তাহার বাড়ি কোথায়?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?

শৈ। সরকারে চাকরি করিবেন বলিয়া।

ন। তোমার কে হয়?

শৈ। আমার স্বামী।

ন। তোমার নাম কি?

শৈ। রূপসী।

অনায়াসে শৈবলিনী এই উত্তর দিল।...'

প্রতাপ কে এবং তার বাড়ি কোথায়? —এই প্রশ্নের সত্য উত্তর ব্যতীত আর সকল কথাই যে শৈবলিনী মিথ্যা বলেছিল, সে তো বঙ্কিমচন্দ্র লিখেই দিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ ছাড়া মুঙ্গেরেও নবাবের রাজধানী ছিল। বঙ্কিম লিখেছেন—'মীর কাসেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন।' (১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ) তাই নবাব প্রতাপকে নাও চিনতে পারেন।

অতএব সুধাকরবাবু বঙ্কিমের লেখা থেকে নিজের ইচ্ছামত একটু উদ্ধৃত করে যে প্রশ্ন তুলেছেন—জমিদার প্রতাপের আবার নতুন করে চাকরি প্রার্থী হওয়ার অর্থ কি? বা নবাব প্রতাপকে তো চিনতেন না। —এ তাঁর নিজেরই ত্রুটি। বঙ্কিমের ত্রুটি নয়।

কমলাকান্তের দপ্তর—

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখেছেন—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রথম ছাপা হয়েছিল। এবং প্রথমবারে দু হাজার ছাপা হয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত তাঁদের সম্পাদিত 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বলেছেন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এ বই প্রথম ছাপা হয়েছিল।

ব্রজেনবাবুরা 'কমলাকান্তের দপ্তরের' প্রথম সংস্করণ দেখে যদি ঐ তারিখ লিখে থাকেন, তাহলে তাঁদের কথা ঠিক বলা যেতে পারে।

'কমলাকান্তের দপ্তর' ১ম সংস্করণের আখ্যাপত্রে ছিল—কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।'

বঙ্গদর্শন প্রেসের উপর পূর্ববৎ সঞ্জীবচন্দ্রেরই মালিকানা থাকলেও, এবার মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানে উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ সমূহ ছাপানো এবং বিক্রয় ব্যাপারে দেখাশুনা করতেন উমাচরণ। তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বেতনভুক্ কর্মী।

১ম সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল—১৬২।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' বইটি উৎসর্গ করেছিলেন বন্ধু বহরমপুরের রামদাস সেনকে। উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন—

পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্তবাবু রামদাস সেন মহাশয়কে

এই গ্রন্থ প্রণয়োপহার স্বরূপ অর্পিত হইল।

'কমলাকান্তের দপ্তর' এর ১ম সংস্করণে মোট ১১টি প্রবন্ধ ছিল। সবগুলিই আগে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'চন্দ্রালোকে', 'মশক' এবং 'স্ত্রীলোকের

রূপ' এই তিন সংখ্যা আমার প্রণীত নহে, এই জন্য ঐ তিন সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।

বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দপ্তর সমাপ্ত হয় নাই। এই জন্য এই গ্রন্থের নাম করণে 'প্রথম খণ্ড' লেখা হইল।'

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কমলাকান্তের দপ্তর পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। তখন এই বইয়ের নাম হয়—কমলাকান্ত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ২৫০।

'কমলাকান্ত' বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের পত্র' এবং 'কমলাকান্তের জোবান বন্দী' নামে দুটি নতুন অংশ যোজনা করেন। আর 'কমলাকান্তের দপ্তরে' আগের পরিত্যক্ত 'চন্দ্রালোকে' ও 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধ দুটিও দিয়ে দেন। অবশ্য এ দুটি রচনা যে যথ ক্রমে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা সে কথা ভূমিকাতে উল্লেখ করেন।

এই 'কমলাকান্ত' বইয়ের ২য় সংস্করণ বেরোয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই অর্থাৎ ১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসে।

এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বা ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'ঢেঁকি' শীর্ষক প্রবন্ধটি ভুল ক্রমে পূর্ব সংস্করণ ভুক্ত হয় নাই। উহাও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল।'

কমলাকান্তের অন্তর্গত এই 'ঢেঁকি' এবং 'কমলাকান্তের পত্র' ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী সবই প্রকাশিত হয়েছিল, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত, তাঁদের সম্পাদিত 'কমলাকান্ত' গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'কাকাতুয়া' নামে একটি প্রবন্ধ দিয়েছেন। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৯ সালের কার্তিক মাসের বঙ্গদর্শনে।

কমলাকান্তের 'পরিশিষ্টে' এই রচনাটি দিয়ে এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত তাঁদের বইএর ভূমিকায় লিখেছেন—

'কাকাতুয়া কাহার লেখা জোর করিয়া বলা যায় না। তথাপি যখন শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত বলিয়া বঙ্গদর্শনে উল্লেখ আছে এবং ঐ বৎসরেই প্রকাশিত 'শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত' 'ঢেঁকি' যখন 'কমলাকান্তে' স্থান পাইয়াছে এবং যখন 'চন্দ্রালোকে', 'স্ত্রী লোকের রূপ' ও 'মশকে'র মত অপর

কোন লেখকের উপর ইহার রচনা দায়িত্ব অর্পণ করা যাইতেছে না, তখন কমলাকান্তের সর্বশেষ রচনা বলিয়া 'কাকাতুয়া'র সম্মান হওয়া উচিত। এই বিবেচনায় এই বিস্মৃত রচনাটি 'পাঠভেদে'র পর পরিশিষ্টে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।'

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তর এই লেখাটি সম্বন্ধে এখন আমার কিছু বলার আছে—

'কাকাতুয়া' কার লেখা জোর করে বলা যায় না—ব্রজেনবাবুরা একথা বলেও অহেতুক তাঁদের সম্পাদিত 'কমলাকান্তে'র পরিশিষ্টে ঐ রচনাটি দিয়ে গেলেন। 'কাকাতুয়া' কমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত শেষ রচনা এটা সত্য। কিন্তু তাই বলে এ রচনা কমলাকান্ত নামধারী 'মশক' প্রভৃতির লেখকদের উপর বা বঙ্কিম ব্যতীত কমলাকান্ত নামধারী অপর কোন লেখকের উপর এর রচনা দায়িত্ব দেওয়া যাবে না কেন? কমলাকান্ত নাম নিয়ে অন্য লেখকেও লিখতেন যখন দেখা যাচ্ছে, তখন এ লেখা বঙ্কিম ছাড়া অন্য লেখকেরও তো হতে পারে?

'কাকাতুয়া' যে বঙ্কিমের লেখা নয় বা হতে পারে না, সে সম্বন্ধে আমার যুক্তিগুলি এই—

১। 'ঢেঁকি' প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে। আর 'কাকাতুয়া' প্রকাশিত হয় ঐ ১২৮৯ সালেরই কার্তিক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে।

বঙ্গদর্শন তখন নিয়মিত ঠিক সময়ে প্রকাশিত হত না, একথা মনে রেখেও বলা যেতে পারে যে, ঢেঁকি ও কাকাতুয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার অন্তত বছর দুয়েক পরে 'কমলাকান্ত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এরও ছ বছর পরে কমলাকান্তর যখন ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন পূর্ব সংস্করণে দিতে ভুল হয়েছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র এতে ঢেঁকি প্রবন্ধটি দেন।

কাকাতুয়া বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হলে কমলাকান্তের ১ম সংস্করণে না হলেও, ২য় সংস্করণেও ঐ ঢেঁকি প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত করার মত কাকাতুয়াও অন্তর্ভুক্ত করতেন।

তাই কাকাতুয়া বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নয় বলেই আমি মনে করি।

২। 'কাকাতুয়া' প্রবন্ধের প্রথমেই আছে—কমলাকান্ত সকালে স্নানাদি সেরে গুড় ছোলা খেয়ে তামাক টানছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তে' কোথাও কমলাকান্তকে গুড় ছোলা খেতে দেখা যায় না। তার খাওয়া বা ঐরূপ হালকা খাওয়া সম্বন্ধে সারা বইয়ে যা আছে,

সে কেবল প্রসন্নর দেওয়া দুধ, ছানা ইত্যাদির কথা। আর তাও স্নান সেরে সকালে খাওয়া নয়।

আরও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তে' কমলাকান্তকে কোথাও তামাক খেতে দেখা যায় না। কেবল 'বিড়াল' প্রবন্ধে আছে—আহার প্রস্তুত না হওয়ার জন্যই কমলাকান্ত হুঁকা হাতে ঝিমুতে ঝিমুতে (নিশ্চয় আফিং খেয়েই) চোখ বুজে ভাবছিল, সে নেপোলিয়ন হলে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে জিততে পারত কি না।

অতএব গুড় ছোলা খেয়ে তামাক টানা কমলাকান্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত নয় বলেই আমার দৃঢ় ধারণা।

কাকাতুয়ার লেখক কাকাতুয়ার মুখ দিয়ে বার বার Plateetud শব্দটা উচ্চারণ করিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র হলে একটা পাখীর মুখ দিয়ে এমন অর্থহীন অথচ কঠিন শব্দ উচ্চারণ করাতেন না, বলেই মনে করি।

৩। কাকাতুয়ার লেখক বলেছেন—কাকাতুয়া তাঁকে বলেছিল—Plantain শব্দ থেকে Plateetud শব্দটা হয়েছে।

বঙ্কিম হলে Plantain থেকে Plateetud হয়েছে, এমন অদ্ভুত কথাও বলতেন না বলেও মনে হয়।

৪। কাকাতুয়ার লেখক লিখেছেন—কাকাতুয়া তাঁকে বলেছিল—আমার নাম কাকাতুয়া অর্থাৎ তুয়াকাকা (তোমার কাকা)। তোমাদের uncleship (কাকাগিরি বা কাকাত্ব) শেখাবার জন্য আমার এদেশে আগমন।

এও বঙ্কিমের লেখা হতে পারে না।

৫। কাকাতুয়ায় দেখছি, প্রসন্ন বলছে—হোমানটি মটর শুঁটি।

বঙ্কিম তাঁর কমলাকান্তে কোথাও প্রসন্নকে দিয়ে বিকৃত করেও ইংরাজি শব্দ উচ্চারণ করাবার চেষ্টা করেন নি।

৬। কাকাতুয়ার লেখক কাকাতুয়ার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—কৃষ্ণসাগরের নিকটের অধিবাসী মানুষরা শূকর ধরে ধরে খেত।

কৃষ্ণসাগরের লাগোয়া দক্ষিণে তুরস্ক দেশ। তুরস্কের অধিবাসীদের তুর্কী বলে। তুর্কী মহম্মদ ঘোরী কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে লুঠপাট ও নানা অত্যাচার করেছিল এবং পরে ভারতে মুসলমান রাজত্বও স্থাপন করে। এর পরে আবার তুর্কী বখতিয়ার খিলজি গৌড় বঙ্গ আক্রমণ ও জয় করে এখানে মুসলমান শাসন প্রবর্তন করে।

আমার অনুমান তুর্কীদের ঐ ভারত ও বাংলা আক্রমণ এবং অত্যাচারের কথা মনে করেই কোন গোঁড়া হিন্দু নোংরামি করে তুরস্কবাসীদের সম্বন্ধে ঐ কথা লিখে ছিলেন।

ভারত ও বাংলা আক্রমণকারী তুর্কী মুসলমানদের সম্বন্ধে বঙ্কিমের ধারণা যাই থাক, এ রকম লেখা তাঁর কলম দিয়ে কখনই বেরোতে পারে না।

বঙ্কিম তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এক জায়গায় লিখেছেন—'পৃথিবীতে যত প্রকার মনুষ্য আছে, ইংরাজদিগের মুসলমান খানসামা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।'

শূকর মাংস ইংরাজদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য। অথচ মুসলমানদের কাছে শূকর একেবারেই অস্পৃশ্য। কিন্তু মুসলমানরা ইংরাজদের খানসামা হলে কি করে?

এইরূপ কোন অনুমানেই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজের মুসলমান খানসামা সম্বন্ধে ঐ কথা বলেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিম তাঁর 'চন্দ্রশেখরে' সাধারণভাবে মুসলমানদের সম্বন্ধে কোনও বিরূপ কথা বলেন নি। বরং ভাল কথাই বলেছেন এবং হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবের উদাহরণই দেখিয়েছেন।

তাই যে বঙ্কিমচন্দ্র, একরূপ মুসলমানদের পক্ষ নিয়েই ইংরাজের মুসলমান খানসামাদের প্রসঙ্গে ঐ কথা বলেছেন, তিনিই আবার কৃষ্ণসাগরের নিকটের অধিবাসীদের সম্বন্ধে এ কথা বলবেন, এ হতেই পারে না।

কাকাতুয়া রচনাটিতে মুসলমানের পোষা কাকাতুয়া বহু জন্ম আগে শূকর ছিল এবং কাকাতুয়াটি মুসলমানের স্ত্রীকে ঠোকরাতে চেষ্টা করছে ও বাড়ির ছোট ছেলের নেড় মাথা ঠোকরায়,—এই ধরণের আপত্তিকর লেখাও কখনই বঙ্কিমের নয়।

কাকাতুয়া কার লেখা জোর করে বলা যায় না, বলেও ব্রজেনবাবুরা তাঁদের সম্পাদিত 'কমলাকান্তের' পরিশিষ্টে 'কাকাতুয়া' রচনাটি দিয়ে যাওয়ায় একটা বিপদ হয়েছে এই যে, বঙ্কিম-গবেষক ও বঙ্কিম-প্রসঙ্গের লেখকরা ব্রজেনবাবুদের ঐ কার লেখা বলা যায় না, কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে এটাকে বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা বলে চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আলোচনাও করে চলেছেন।

যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত 'সাহিত্য সংসদ' থেকে প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনাবলীতে দেখছি, কোনরূপ মন্তব্য ছাড়াই এটাকে বঙ্কিমেরই রচনা বলে

কমলাকান্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু 'কাকাতুয়া'র মাথায় 'পরিশিষ্ট' কথাটা লিখে দেওয়া হয়েছে।

এই 'পরিশিষ্ট' যে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তর একটা মন্তব্য সহ 'পরিশিষ্ট', যোগেশ বাগলের বই থেকে তা আদৌ বোঝা যাবে না। এ বই পড়লে পাঠক-পাঠিকারা ভাববেন, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তাঁর মূল বইয়ে ঐ রকম করে গেছেন।

যোগেশ বাগলের ন্যায় ডঃ অশোক কুণ্ডুও তাঁর পি. এইচ. ডি. পাওয়া বই 'বঙ্কিম অভিধানে' কাকাতুয়া সম্বন্ধে ব্রজেনবাবুদের ঐ সন্দেহসূচক মন্তব্য পড়েও কাকাতুয়াকে বঙ্কিমেরই রচনা বলে গেছেন। অশোকবাবু লিখেছেন—

'বঙ্কিমচন্দ্র চেষ্টা করলে যে একজন সার্থক ছোট গল্পকার হতে পারতেন, 'কাকাতুয়া' রচনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ·কাকাতুয়াকে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন। ' ইত্যাদি।

'কাকাতুয়া' পড়ে বঙ্কিমকে, সার্থক ছোট গল্পকার হতে পারতেন বলে কল্পনা করা যে ঠিক নয়, ভুল তা আমি আগের আলোচনাতেই দেখিয়েছি। আর কাকাতুয়ার লেখক কাকাতুয়াকে ভারতের শাসক ইংরাজের প্রতীক হিসাবেই খাড়া করেন বলে আমার মনে হয়। কারণ, কাকাতুয়া বলছে—

১। সমুদ্র মধ্যস্থিত একটা গিরিগুহায় তারা আগে ছিল।

এটা কি সমুদ্র মধ্যস্থিত বা সমুদ্রবেষ্টিত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কথা?

২। সাদা সাদা ডানা বিস্তার করে সমুদ্র পার হয়ে কাকাতুয়ারা এদেশে ওদেশে যেতে লাগল।

এটা কি বৃটিশদের বাণিজ্য-যাত্রা ও বিভিন্ন দেশ জয় নয়?

৩। কাকাতুয়ার বর্ণ লাল, আগে সে সিংহ ছিল।

এতেও কি ইংরাজদের গাত্রবর্ণ এবং 'বৃটিশ সিংহের' কথা মনে হয় না?

৪। কাকাতুয়ার বাড়ি অনেক পশ্চিমে।

ইংরাজরাও তো পাশ্চাত্যদেশীয়।

৫। কাকাতুয়া বলছে যে, এ দেশের যথা সর্বস্ব লুঠ করে তারা, এদেশের লোকদের uncleship শেখাতে তার আগমন।

এও ভারতের শাসক ইংরাজদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

৬। কাকাতুয়ার লেখক যাদের 'বঙ্গজ' বলেছেন, সেই বঙ্গজ বা বাঙ্গালীরা শাসক ইংরাজের কাছে চাকরি প্রার্থী ও কৃপাপ্রার্থী ছিল। আর লেখার মধ্যে বড় বড় মাথার বঙ্গজদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, সেও সত্য।

একদিক থেকে দেখলে, সাহেবদের বেশী সেলাম না করলেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও একজন ঐ বড় মাথার বজ্জ ছিলেন।

কাকাতুয়ায় যে ঝেঁটিয়ে বজ্জগুলোকে ফেলে দেবার জন্য প্রসন্নময়িকে বলা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র এই লেখার লেখক হলে কি তা বলতেন ?

এই সঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে, কাকাতুয়ার লেখক প্রসন্নকে প্রসন্নময়ি বলেছেন ; বঙ্কিম প্রসন্নকে কোথাও প্রসন্নময়ি বলেন নি।

যাই হোক, এই সব নানা কারণে আমার সিদ্ধান্ত যে 'কাকাতুয়া' বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনা নয়। তাই যতক্ষণ না এই লেখাকে কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে সঠিক ভাবে প্রমাণ করতে পারছেন, এ লেখা বঙ্কিম-রচনাবলী থেকে বাদ দেওয়া উচিত।

মুসলমানরা একেই তো বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ক্ষুব্ধ, তার উপর সঠিক না জেনে অকারণে এই লেখা বঙ্কিম-রচনাবলীর মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমের উপর মুসলমানদের আরও ক্ষোভ ও রাগ বাড়ানো কখনই উচিত নয়।

'কমলাকান্ত' বঙ্কিমচন্দ্রের এক অপূর্ব রচনা। এই বইয়ে এমন কয়েকটি লেখা আছে যে, সেগুলির মত লেখা আজও কোন বাঙ্গালী লেখকই লিখতে পারলেন না।

কমলাকান্তের কোন কোন লেখায় হাসি, ব্যঙ্গ ও দেশাত্মবোধ একই সঙ্গে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে তাতে কিছু কিছু বাস্তবেরও ছোঁয়াচ রয়েছে। যেমন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

বঙ্কিমচন্দ্র 'বড় বাজার' প্রবন্ধে লিখেছেন—কমলাকান্ত বিদ্যার বাজারে ঢুকে প্রথমে তসর গরদ পরা নামাবলি গায়ে ফোঁটাকাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণদের ঝুনা নারিকেলের দোকানে গেল। গিয়ে তাদের সঙ্গে নানা কথাবার্তার পর তাদের নমস্কার করে পাশের দোকানে গেল। গিয়ে দেখল, কমলাকান্তের জবানীতেই বলছি—

'দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেণ্টেল সায়েন্সেয় দোকান। কতক-গুলি সাহেব দোকানদার ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে—

Messrs Brown Jones and
Robinson

nut suppliers

established 1757

on the field of Plassey......

দোকানদার ডাকিতেছে—আয় কালা বালক, Experimental Science খাবি আয়। আমি এই সকল দেখিতে শুনিতে ছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা লাঠি হাতে দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, সাহেবেরা সেই সকল নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ কি হইল?—সাহেবেরা বলিলেন, ইহাকে বলে Asiatic Researches.'

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। এখানে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে এশিয়াটিক সোসাইটির কথাই কিছুটা বলেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির ঘরেও এর প্রতিষ্ঠাতা আরবি, পারসী ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্সের নাম পিতলের অক্ষরে লেখা আছে।

এখানে সাহেবদের দোকান পলাশীর মাঠে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত বলে বঙ্কিমচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়া ও বাংলায় ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথাই বলেছেন।

বিবিধ সমালোচন—

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেছিলেন ১৮৭২, এপ্রিল থেকে ১৮৭৬, মার্চ পর্যন্ত। এই চার বছরের বঙ্গদর্শনে তিনি বিভিন্ন সময়ে যে সব গ্রন্থকারের গ্রন্থ সমালোচনা করেছিলেন, সেই লেখাগুলিরই অধিকাংশ নিয়ে, কিছু কিছু পরিবর্তন করে এই বিবিধ সমালোচন গ্রন্থটি করেন। এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ এর ১৬ই জুলাই।

এই বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র তখন লিখেছিলেন—'বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুলি প্রায়ই পরিত্যাগ করা

গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্য-বিষয়ক মূল কথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।'

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী—

দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর পুত্রদের ভ্রাতুষ্পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি সর্বদা দীনবন্ধুর পুত্রদের সংবাদ নিতেন এবং আবশ্যক হলে সৎ পরামর্শও দিতেন। তিনিই দীনবন্ধুর রচনাগুলি একত্র করে গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করবার জন্য দীনবন্ধুর পুত্রদেব পবামর্শ দেন এবং ঐ সময় দীনবন্ধুব একটি ছোট জীবনীও লিখে দেন।

এই জীবনীটি দীনবন্ধুব বচনাবলীব ১ম সংস্করণে ১২৮৩ সালে (১৮৭৭ এর এপ্রিল) সর্ব প্রথম মুদ্রিত হয়।

পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ জীবনীটিকে পৃথক পুস্তকাকারে ছাপাবাব জন্য দীনবন্ধুর পুত্রদের বলেন এবং গ্রন্থের উপসত্বও প্রথম থেকেই তাদের দান করেন।

আরও কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'দীনবন্ধু মিত্রেব কবিত্ব' নামে অপর একটি প্রবন্ধ লিখেও দীনবন্ধুর পুত্রদেব দিয়েছিলেন। তাঁবা সেটিও পরে দীনবন্ধুর রচনাবলীব অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

রজনী—

'রজনী' প্রথম ধাবাবাহিক ভাবে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। ১২৮১ সালের আশ্বিন থেকে চৈত্র এবং ১২৮২ সালের বৈশাখ ও ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যার বঙ্গদর্শনে বেরোয়। 'রজনী' বই হয়ে বেরোয় ১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (২রা জুন ১৮৭৭)। বই করার সময় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রজনীর বহু পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করেন। এ সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে বই সম্পর্কেও ১ম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন—

'রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, এক্ষণে পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে এই গ্রন্থে এত পরিবর্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল

প্রথম খণ্ড পূর্ববৎ আছে ; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিছু স্থানান্তরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে।

প্রথম লর্ড লিটন প্রণীত 'Last Days of Pompeii' নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি 'কানা ফুলওয়ালী' আছে ; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে সকল মানসিক ও নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে।

উপন্যাসের অংশ বিশেষ, নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইলকি কলিন্স কৃত 'Woman in White' নামক গ্রন্থ প্রনয়ণে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে আমাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় নাই।'

উপকথা -

১২৮২ সালের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়।

১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৭৭ এর ২৪শে নভেম্বর) বঙ্কিমচন্দ্র 'উপকথা' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি তাঁর পূর্ব প্রকাশিত 'ইন্দিরা' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' গল্প দুটির সঙ্গে 'রাধারাণী'ও দিয়ে ঐ নামকরণ করেছিলেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই 'উপকথা' বইয়ের ২য় মুদ্রণ হয়। এরপর 'উপকথা' বইয়ের আর ৩য় মুদ্রণ হয় নি।

কবিতা পুস্তক—

বঙ্কিমচন্দ্র, কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে ঈশ্বর গুপ্তের কাগজে যে সব কবিতা লিখেছিলেন, প্রধানত সেইগুলি নিয়েই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ললিতা। পুরাকালিক

গল্প। তথা মানস' নাম দিয়ে একটি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। এই বইটি তখন কলকাতার শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে ছাপা হয়েছিল। বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪১।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘকাল কবিতা লেখা একরূপ ছেড়েই দিয়েছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'মৃণালিনী' লেখার সময় ঐ বইয়ে কয়েকটি গান লেখেন।

আরও পরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে (১২৭৯ সালে) যখন তিনি 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন বঙ্গদর্শনে উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে কবিতাও লিখেছেন। বঙ্গদর্শন চলা কালে সঞ্জীবচন্দ্র 'ভ্রমর' পত্রিকা বার করলে, তাতে এবং বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশ করলে তাতেও কখন কখন দু একটা করে কবিতা লিখেছিলেন।

'প্রচার' প্রকাশিত (১৮৮৪র জুলাই) হওয়ার আগে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে ও ভ্রমরে প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলি, ঐ সঙ্গে আগে প্রকাশিত ললিতা ও মানস কবিতা দুটি এবং বঙ্গদর্শনে ও ভ্রমরে প্রকাশিত তিনটি ছোট গদ্য রচনা নিয়ে 'কবিতা পুস্তক' নাম দিয়ে একটি বই করেন।

ঐ গদ্য রচনা তিনটি হ'ল —১২৮০ সালের ভাদ্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'মেঘ', ১২৮১র আষাঢ় সংখ্যা ভ্রমরে প্রকাশিত 'বৃষ্টি' এবং ১২৮১র জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'খদ্যোত'।

'কবিতা পুস্তকে'র মধ্যে এই তিনটি ক্ষুদ্র গদ্য রচনা দেওয়ার কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বইয়ের গোড়ায় বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন—'এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সঙ্গত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণ স্বরূপ তিনটি গদ্য কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম।...'

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই 'কবিতা পুস্তকে'র আর এক বার পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল। সেবার তিনি এই বইয়ে ১২৯২ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রচারে প্রকাশিত তাঁর 'বাজার উপর রাজা' কবিতা ও ১২৯২ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রচারে প্রকাশিত 'পুষ্পনাটক' এবং ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে

প্রকাশিত তাঁর 'দুর্গোৎসব' কবিতাটি সংযুক্ত করেন। ফলে বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৪৪এ।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কবিতা পুস্তকে'র ২য় সংস্করণের সময় এই বইয়ের নামও বদল, করে দেন—গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক। বইয়ের এই নাম পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি বিজ্ঞাপনে বা ভূকিমায় লেখেন—'কবিতা পুস্তক অপেক্ষা 'গদ্য পদ্য' নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এই জন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্তন করা গেল।'

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে যে বঙ্কিম-রচনাবলী প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে যে খণ্ডটিতে 'লোক রহস্য', কমলাকান্ত, গদ্য পদ্য ও মুচিরাম আছে, সেই খণ্ডের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ সালের ভাদ্র মাসে। এই সংস্করণে সম্পাদকদ্বয় 'গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তকে'র প্রসঙ্গে তাঁদের ভূমিকায় লেখেন—

'গদ্য পদ্যের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি ছাড়া 'বঙ্গদর্শনে' (ফাল্গুন ১২ ৯, পৃষ্ঠা ৫২১) তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) অন্তত আর একটি কবিতা 'বিরহিণীর দশ দশা' প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা যে কারণেই হউক, পুস্তকে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কবিতাটি 'বিবিধ' খণ্ডে (২য় সংস্করণ) মুদ্রিত হইবে।'

এঁদের সম্পাদিত বঙ্কিম-রচনাবলীর 'বিবিধ' খণ্ড ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের পৌষ মাসে। দেখা যাচ্ছে, বিবিধ' খণ্ড ১ম সংস্করণের সময় সম্পাদকদ্বয় ধরতে পারেন নি যে, 'বিরহিণীর দশ দশা' বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। পরে এঁরা এটি বুঝেছিলেন।

আমার বক্তব্য—কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের হলে তিনি নিজেই তো তাঁর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে যেতেন। তাছাড়া এই কবিতায় ব্রজবুলি শব্দের ব্যবহার এবং কবিতা শেষে কবির ভনিতা দেখেও মনে হয়, এ বঙ্কিমের কবিতা নয়। কারণ, বঙ্কিমের কোন কবিতায় এসব নেই।

কৃষ্ণকান্তের উইল—

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের শেষ বছরের অর্থাৎ ১২৮২ সালের পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় এবং সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রথম বছরের অর্থাৎ ১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে মাঘ সংখ্যায়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এরপর ১২৮৫ সালের ভাদ্র

মাসে (২৯শে আগষ্ট ১৮৭৮ খ্রীঃ) বই হয়ে বেরোয়। বইটি ছাপা হয়েছিল, বাড়ির বঙ্গদর্শন প্রেসেই। বইয়ে মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে নাম ছিল—শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বঙ্গদর্শন প্রেসের কর্মী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করলে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর জায়গায় এই রাধানাথবাবুকে নিয়োগ করে ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মালদহে ডেপুটি কালেকটর ও রোডসেসের দায়িত্বে থাকাকালে অসুস্থতাবশত ২২ জুন ১৮৭৫ থেকে ২০ মার্চ ১৮৭৬ পর্যন্ত ন মাস ছুটি নিয়ে কাঁটালপাড়ার বাড়িতে ছিলেন। ছুটির শেষে আর মালদহে ফিরে না গিয়ে বাড়ির কাছে হুগলীতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছিলেন। ছুটি নিয়ে ন মাস বাড়িতে থাকার সময় বঙ্কিমচন্দ্র বাড়িতে বসে তখন এই বইটি লিখেছিলেন।

বঙ্গদর্শনে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লেখা শেষ হলে তার বছর দেড়েক পরে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির একটা বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে পিতার উপর এবং মেজদার উপর অভিমান করে ক্ষুব্ধ হয়ে হুগলীর পাশে চুঁচুড়ায় গিয়ে সপরিবারে বাস করেন। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন নৈহাটীর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একদিন চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে বলেন—আপনি তো চুঁচুড়ায় বাস করছেন, এর মধ্যে কি কিছু কৃষ্ণকান্তী আছে ?—বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন—তুমি ঠিক বুঝেছ।

হরপ্রসাদের এই কথা উদ্ধৃত করে কেউ কেউ বলেছেন--বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', অন্তত উইল সংক্রান্ত লেখাটির ব্যাপারে মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার উইলের বা দানপত্রের একটা যোগ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পিত ১২৭২ সালে দানপত্র করে তাঁর বিষয় সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তো বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল লেখা শুরু করার .০ বছর আগের ঘটনা।

যাই হোক্, আমার 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ের প্রথমেই এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে কৃষ্ণকান্তের উইলের চারটি সংস্করণ হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতি সংস্করণেই কিছু না কিছু পরিবর্তন করে ছিলেন। ৪র্থ সংস্করণের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল—আগে বইয়ের শেষে গোবিন্দ লালের জলে ডুবে আত্মহত্যার কথা ছিল, ৪র্থ সংস্করণে গোবিন্দলালের মৃত্যু না দেখিয়ে তার সন্ন্যাস জীবন দেখিয়ে বই শেষ করা হয়।

বঙ্গদর্শনে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হওয়ার সময় যখন গোবিন্দলালের গুলিতে রোহিনীর মৃত্যু দেখানো হয়, সেই সময়েই অনেক পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন—রোহিনীকে মারলেন কেন? সেই থেকে আজও পর্যন্ত বহু পাঠক ও সমালোচক এই নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে গোঁড়া নীতিবাগীশ বলে দোষ দিয়ে আসছেন। এঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের অভিযোগটাই সব চেয়ে চড়া। সে কথা পরে 'সমালোচনার সম্মুখে' বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'নারীর লেখা' প্রবন্ধে প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অন্য একটা ভুলের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণকান্তের উইলের গোড়াতেই 'ইহলোকান্তে' না বলে একাধিকবার 'পরলোকান্তে' বলেছেন।

'পরলোকান্তে'র বদলে 'ইহলোকান্তে' হওয়াই ঠিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে একথা জানতেন না, তা বলা যায় না। হয়ত এমনও হতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে উইলে ঐ ভাষাই প্রচলিত ছিল, তাই বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র তা জেনেও উইলের ক্ষেত্রে ঐ শব্দই ব্যবহার করে গেছেন। কোর্টে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, আজকাল উইলে সাধারণত দেহান্তে বা 'মৃত্যুর পরে' লেখা হয়। তবে এখনও কোন কোন উইল লেখক পরলোকান্তেও লিখে থাকেন। এঁদের মতে পরলোকান্তের অর্থ পরলোকান্তরিত হওয়ার পরে।

সাম্য—

'সাম্য' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৫ সালের মাঘ মাসে (৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯)। এই বইয়ে মোট ৫টি পরিচ্ছেদ আছে। ১ম, ২য় ও ৫ম পরিচ্ছেদটি আগে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এবং ১২৮২ সালের কার্তিক সংখ্যায় যথাক্রমে 'সাম্য', 'সাম্য [দ্বিতীয় সংখ্যা'] ও 'সাম্য, তৃতীয় প্রস্তাব—স্ত্রীজাতি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। আর ১২৭৯ সালের ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন মাসের বঙ্গদর্শনে 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, তার কিয়দংশ নিয়ে ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদ হয়।

'সাম্য' গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন- 'এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ তৃতীয় ও চতুর্থ

পরিচ্ছেদ ঐ পত্রে প্রকাশিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধ হইতে নীত। কৃষকদের কথা যে আধুনিক সামাজিক বৈষম্যের উদাহরণ স্বরূপ লেখা হইয়াছে, এমত নহে। প্রাচীন বর্ণ বৈষম্যের ফল স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। পাঠক যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন।

সাম্যনীতি নূতন তত্ত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যেভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি —সেইরূপ লিখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রের সহিত প্রভেদ দেখিলে কেহ রাগ করিবেন না। আরও, স্বদেশীয় সাধারণ জনগণকে এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান, আমি দুঃখিত হইব না। অশিক্ষিত পাঠকদিগের হৃদয়ে এই নীতি অঙ্কুরিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব।'

বঙ্কিমচন্দ্র এই 'সাম্য' গ্রন্থের আর ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন নি। তিনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার সময় এই 'সাম্য' গ্রন্থের উল্লেখ করে প্রসঙ্গত ভূমিকায় লিখেছিলেন—

'আমি বঙ্গদর্শনে 'সাম্য' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পশ্চাৎ তাহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া ছিলাম। 'বঙ্গদেশের কৃষক' আর পুনর্মুদ্রিত করিব না বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ 'সাম্য' মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া ছিলাম। এক্ষণে সেই 'সাম্য' শীর্ষক পুস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি। সুতরাং 'বঙ্গদেশের কৃষক' পুনর্মুদ্রিত করার আর একটি কারণ হইয়াছে।'

প্রবন্ধ পুস্তক—

প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৭৯র এপ্রিলে। এই বইয়ের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

'এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল, তাহা সকলই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিত্যাগ করা গিয়াছে। কখনও বা প্রবন্ধেব নাম পরিবর্তন করা গিয়াছে।

এই জাতীয় আরও কয়েকটি মৎপ্রণীত প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়া ছিল। নানা কারণে সেগুলি এক্ষণে পুনর্মুদ্রাঙ্কণের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম।

এই বইয়ে মোট ১০টি প্রবন্ধ ছিল। সেগুলি এই—বাঙ্গালির বাহুবল, ভালবাসার অত্যাচার, জ্ঞান, সাংখ্যদর্শন, হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল, ভারত কলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, প্রাচীনা এবং নবীনা, বুড়া বয়সের কথা।

'বুড়া বয়সের কথা'য় লেখক হিসাবে নাম ছিল কেবলরাম শর্মা। পরে এই প্রবন্ধটি 'কমলাকান্ত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাকি প্রবন্ধগুলিও পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়।

রাজসিংহ—

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৮৪ এর বৈশাখ থেকে 'বঙ্গদর্শন' আবার প্রকাশিত হতে থাকলে বঙ্কিমচন্দ্র এর প্রথম সংখ্যা থেকেই এতে লিখতে থাকেন। ঐ বছরের মাঘ সংখ্যায় তিনি কৃষ্ণকান্তের উইল শেষ করেন। এক মাস বাদ দিয়ে চৈত্র মাস থেকে বঙ্গদর্শনে আবার শুরু করেন 'রাজসিংহ'। পরবর্তী বছরের অর্থাৎ ১২৮৫ সালের ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত মোট ৬ সংখ্যায় লিখে অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখেন। বঙ্গদর্শনে আর কোন কিস্তি না লিখে ১২৮৮ সালে (৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৮২) 'রাজসিংহ' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বইয়ের আখ্যাপত্রে 'রাজসিংহ' লেখার পরে পৃথক ভাবে 'ক্ষুদ্র কথা'ও লেখা ছিল। এই প্রথম সংস্করণ রাজসিংহের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮৩।

'রাজসিংহ'র ২য় সংস্করণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র এটিকে তাঁর 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। ৩য় সংস্করণ হয় 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসে'র ২য় সংস্করণে। 'রাজসিংহ'র ৪র্থ সংস্করণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র এই বইকে পরিবর্ধিত আকারে আবার নতুন করে লেখেন। তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩৪। এই ৪র্থ সংস্করণ পৃথক হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে।

বঙ্কিমচন্দ্র ৪র্থ সংস্করণ রাজসিংহের একটা দীর্ঘ বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা লেখেন। তাতে তিনি বলেন—

'…ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি। মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষা রাজপুত বাহুবলে বলবান ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।…

যখন বাহুবল আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। উপন্যাসে সেকথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইতে গেলে, রাজসিংহের পূর্ব পূর্ব সংস্করণে যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি অবলম্বন করা গিয়াছিল, তদ্বারা অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না। রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাসভুক্ত করিতে হয়। তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া গ্রন্থের কলেবর এত বাড়িয়াছে। বিশেষত উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।...

স্থুল ঘটনা অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনি রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনা প্রসূত নয়। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে।...

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।'

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর ও সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে না চাইলেও বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ সমালোচকই, এমন কি ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারও ঐগুলিকে তো বটেই, সেই সঙ্গে মৃনালিণীকেও ঐতিহাসিক বা ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস বলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে মাসে মৃত্যু হয়, সেই ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ৪র্থ সংস্করণ রাজসিংহ উপন্যাসের উপর একটি সমালোচনা লিখে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ঐ সমালোচনা দেখেও থাকতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহের সমালোচনায় মূলত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাই করেছিলেন।

মুসলমানরা, রাজসিংহ লেখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বিশেষ ক্ষুব্ধ। সেকথা পরে 'সমালোচনার সম্মুখে' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

আনন্দমঠ—

'আনন্দমঠ' প্রথমে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ১২৮৭ সালের চৈত্র থেকে

১২৮৮ সালের আশ্বিন এবং ১২৮৯ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১২৮৮র কার্তিক থেকে চৈত্র পর্যন্ত ছ মাস বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ ছিল।

আনন্দমঠ প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালে (১৫ই ডিসেম্বর ১৮৮২)। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের উৎসর্গ পত্রে কাকে উৎসর্গ করেছেন, পরিষ্কার ভাবে তাঁর নাম উল্লেখ না করে শুধু লিখেছিলেন—

ক নু মাং ত্বদধীন জীবিতাং
বিনিকীর্য ক্ষণভিন্ন সৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো
জল সংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥

স্বর্গে মর্তে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এইরূপ উৎসর্গ হইল।

এই লেখার মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকটির ভাবার্থ হ'ল, জলধারা যেমন সেতুবন্ধনকে ভেঙ্গে জলে অবস্থিত পদ্মকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি ক্ষণমাত্রেই আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বকে বিচ্ছিন্ন করে এবং আমাকে দুঃখিত করে তুমি কোথায় গেলে ?

শ্রীশ মজুমদার তাঁর 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ—তৃতীয় প্রস্তাবে' লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর একটি শিশু পুত্রের মৃত্যুতে কাতর হয়ে, ঐভাবে লিখে তাকেই বইটি উৎসর্গ করে ছিলেন।

অপর দিকে ললিতকুমার মিত্র তাঁর 'বঙ্কিমবাবু' প্রবন্ধে লিখেছেন—'আমার পিতৃদেব তাঁহাকে (বঙ্কিমচন্দ্রকে) নবীন তপস্বিনী নাটক উৎসর্গ করেন। বঙ্কিমবাবুও তাঁহাকে মৃনালিণী উৎসর্গ করেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব যে বন্ধুর জীবনের সহিত শেষ হয় নাই, তাহা দেখাইবার জন্য আনন্দমঠের অভিনব উৎসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। ··নারায়ণ—বৈশাখ ১৩২২।

ললিতবাবুর মত্‌ তাঁর মৃত পিতা দীনবন্ধু মিত্রকেই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উৎসর্গ করেছিলেন। এ সম্পর্কে কেবল একটা প্রশ্ন—বঙ্কিমচন্দ্র একই ব্যক্তিকে কি একাধিক বই উৎসর্গ করেছিলেন ?

আনন্দমঠ রচনার প্রেরণা বা উৎস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অপর তিন ভাই ছেলেবেলায় তাঁদের 'খুল্ল পিতামহে'র কাছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের গল্প শুনেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা মনে

রেখেছিলেন এবং সেই কথা নিয়ে 'কিঞ্চিৎ পরিণত' বয়সে আনন্দমঠ লেখেন।
—বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা।

বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেবেলায় ঠাকুরদার কাছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের গল্প শুনে থাকতে পারেন। কিন্তু ছেলেবেলায় শোনা সেই কথা মনে রেখেই পরিণত বয়সে আনন্দমঠ লিখেছিলেন, একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী রচনা সম্বন্ধেও পূর্ণবাবু এইরূপ তাঁদের খুল্লপিতামহের কাছে শুনে লেখা বলে যা লিখেছেন, তা যে সঠিক নয়, তা আমি আগেই দেখিয়েছি।

এ সম্পর্কে ডঃ অতুল সুর তাঁর 'আনন্দমঠের পটভূমিকা' প্রবন্ধে যা লিখেছেন, সে কথাই বিশ্বাসযোগ্য বলে আমি মনে করি। অতুলবাবু লিখেছেন—

'W. W. Hunter এর Annals of Rural Bengal, এই বইখানাতেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ বর্ণনা ও ওর পদক্ষেপে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী বিবৃত আছে। এই বইখানাই বঙ্কিমকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আনন্দমঠ রচনা করতে। ··তিনি যে হাণ্টারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, সেকথা অবশ্য তাঁর আনন্দমঠের কোন জায়গায় লেখেন নি। কিন্তু আনন্দমঠের পরিপূরক গ্রন্থ হচ্ছে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস দেবী চৌধুরাণী। দেবী চৌধুরাণীর ভূমিকায় বঙ্কিম অবশ্য হাণ্টারের স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউণ্ট এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই দুই গ্রন্থের কোন জায়গাতেই তিনি হাণ্টারের অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গলের উল্লেখ করেন নি। অথচ আনন্দমঠ লিখবার সময় 'অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল' যে তাঁর সামনেই খোলা ছিল এবং সেই গ্রন্থ থেকেই যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ বর্ণনা ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে বর্ণনা হাণ্টারের বই থেকে দিচ্ছি, তার সঙ্গে বঙ্কিমের বর্ণনার হুবহু মিল দেখে কি মনে হবে, তা পাঠক বিচার করবেন।' —আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৮৭।

এই বলে অতুলবাবু হাণ্টারের বই থেকে এবং আনন্দমঠ থেকে পর পর যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেই ছিয়াত্তরের ভয়াবহ বর্ণনাটি একেবারে একই। বঙ্কিম তাঁর আনন্দমঠের জন্য হাণ্টারের ঐ বই থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্কিম নিজেই আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণ থেকে গ্রন্থ শেষে হাণ্টারের ঐ বইয়ের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা না দিলেও ঐ বই থেকেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কিছুটা উদ্ধৃত করেছেন। অতুলবাবু আনন্দমঠের

গ্রন্থশেষের ঐ অংশটুকু দেখেন নি ; তাই বঙ্কিম কোথাও হাণ্টারের নাম উল্লেখ করেন নি, বলেছেন।

আনন্দমঠে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে এবং তাঁর গুপ্ত দলের প্রভাব আছে বলেও মনে হয়। কারণ, ফড়কে সন্ন্যাসীর বেশে থাকতেন, আর তাঁর গুপ্ত দলের কার্য পদ্ধতিও ছিল আনন্দমঠের সন্তান দলের কাজেরই প্রায় অনুরূপ।

ফড়কে তাঁর গুপ্তদল নিয়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ১৮৭৯র ফেব্রুয়ারিতে। এরই ক'মাস পরে ফড়কের গ্রেপ্তার, বিচার, দ্বীপান্তর ইত্যাদি নিয়ে কাগজে কাগজে ও দেশের জনমানসে বেশ কিছুদিন ধরে আলোড়ন চলে।

১৮৮০র জুলাইয়ে নবীন সেনকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটা চিঠি থেকে জানা যায়, তিনি আনন্দমঠ লিখছেন। অতএব আনন্দমঠে সত্যানন্দ ও সন্তান দলের কল্পনায় যে ফড়কে ও তাঁর গুপ্ত দলের প্রভাব আছে, তা বলা যেতে পারে।

বঙ্কিমের জীবিতকালে আনন্দমঠের ৫টি সংস্করণ হয়েছিল। ৫ম সংস্করণ হয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। ১ম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময়ে নয়। সমাজ বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।'

আনন্দমঠের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০শে জুলাই ১৮৮৩। ২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লেখেন—'প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার টীকা স্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা অপর পৃষ্ঠে উদ্ধৃত করিলাম।'

এই বলে তিনি কৃষ্ণবিহারী সেনের The Liberal পত্রিকায় 8-4-1883 তারিখে প্রকাশিত একটি সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দেন।

লিবারেল পত্রিকায় আনন্দমঠের সমালোচনা প্রকাশের তারিখটা 8-4-1883, এর বদলে বরাবর 8-4-1882 ছাপা হয়ে আসছে। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৮৪ সালের পূজা সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত আনন্দমঠ বিষয়ক তাঁর একটি প্রবন্ধে প্রথম এই ভুলটির কথা উল্লেখ করেন।

লিবারেল পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ সমালোচনাটির প্রসঙ্গে চিত্তবাবু তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন—আনন্দমঠ প্রকাশিত হলে তখন এখানকার অনেক ইংরাজ বঙ্কিমের উপর অসন্তুষ্ট হন। সেই সময়ে বঙ্কিমেরই চাকরির ক্ষেত্রের এক উপরওয়ালা ইংরাজ বঙ্কিমকে বলেন—আনন্দমঠ নিয়ে তুমি বিপদে পড়বে। এক কাজ কর, কেশব সেনের সঙ্গে ইংরাজ সরকারের বেশ সদ্ভাব আছে। তুমি কোন কাগজে তাঁকে দিয়ে তোমার বইটা সম্বন্ধে লেখাও যে, এতে ইংরাজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক কোন কথা নেই।

তখন বঙ্কিমচন্দ্র বন্ধু কেশব সেনকে একথা বললে, কেশব সেন বলেন, আমার ভাই কৃষ্ণবিহারীকে দিয়ে তাঁরই কাগজে তুমি লিখিয়ে নাও। বঙ্কিম শেষে তাই করেন।

কেশব সেনদের পারিবারিক কাহিনীতেও নাকি ঐকথা লেখা আছে।

চিত্তবাবুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এসব কাহিনী আপনি কোথায় পেলেন? উত্তরে তিনি বললেন—সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্ম কেশব সেনের পৌত্রের কাছে শুনে আমাকে বলেছেন।

আনন্দমঠের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬র এপ্রিলে।

বঙ্কিম ৩য় সংস্করণের ভূমিকায় লেখেন—'এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল।

আরও দেখিবেন যে, দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে। যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইযাছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল। আর Captain Edwardes নামের পরিবর্তে Major Wood নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ অনৈক্য আমি সারাত্মক বিবেচনা করি না—কেন না উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।'

বঙ্কিম ৩য় সংস্করণে শুধু হান্টারের বই থেকেই নয়, তার আগে Gleig's Memoirs of the Life of Warren Hastings বই থেকেও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা উদ্ধৃত করেছিলেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আনন্দমঠের ৫ম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপনে যে অনৈক্যের কথা লেখা গিয়াছে, তাহা রাখিবার

প্রয়োজন নাই, ইহাই বিবেচনা করিয়া এই সংস্করণে আবশ্যকীয় পরিবর্তন করা গেল। অন্যান্য বিষয়ও কিছু কিছু পরিবর্তন করা গিয়াছে। শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করা গিয়াছে। এবং তৎ সম্বন্ধে যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল। ..'

আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে বিখ্যাত ও বিতর্কিত বই। বিখ্যাত এই জন্য যে, এই উপন্যাসে বর্ণিত দেশাত্মবোধের কাহিনী ভারতবাসীকে ইংরাজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরিসীম প্রেরণা জুগিয়েছিল। আর এই উপন্যাসের অন্তর্গত বন্দেমাতরম্ সংগীতের তো কথাই নেই। ভারতবাসী দেশের মুক্তি সংগ্রামে এই সংগীতকে জাতীয় সংগীত করেছিল এবং এই সংগীতের প্রথম দুটি শব্দ 'বন্দে মাতরম্'কে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

ভারতবাসী যখন বন্দেমাতরম্‌কে ভারতের জাতীয় সংগীত করে, তখন তারা এই সংগীতের অন্তর্গত 'সপ্তকোটীকণ্ঠ' ও 'দ্বিসপ্তকোটীভূজৈ' এর জায়গায় করে নেয় ত্রিংশকোটীকণ্ঠ ও দ্বিত্রিংশকোটীভূজৈ। পরে আবার ঐ দু জায়গায় করেছিল—কোটী কোটী কণ্ঠ ও কোটী কোটী ভূজৈ। বন্দেমাতরম্ সংগীতে বহু সংস্কৃত শব্দ থাকায় এবং সংগীতে সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা থাকায় ভারতেব সকলেরই গানের অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় নি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে, এক দিকে অহিংস সত্যাগ্রহীদের দ্বাবা, অপর দিকে সশস্ত্র বিপ্লবীদের দ্বারা। অর্থাৎ অহিংস ও সহিংস উভয় পন্থাতেই। এই উভয়পন্থীরাই আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম্ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। বিপ্লবীরা তো এক হাতে গীতা ও অপর হাতে আনন্দমঠ নিযে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নিতেন।

আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান শাসনের অবসান এবং ইংরাজ শাসকের আগমন ও তাদের সুশাসনের কথাই লিখেছেন। তবুও মুক্তিকামী ভারতবাসী, আনন্দমঠের সন্তানদলের মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধের আন্দোলনটাকে, ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধেই গ্রহণ করেছিল। কারণ, আনন্দমঠে বর্ণিত দেশাত্মবোধের কথাটাই ছিল তাদের কাছে আসল।

আনন্দমঠের শেষে স্পষ্ট করে ইংরাজ শাসনের প্রশংসার কথা থাকায়,

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের মুক্তি সংগ্রামের সময় বইটাকে বাজেয়াপ্ত করল না বটে, তবে এক সময় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ করেছিল। দেশবাসী তখন সরকারের সে নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে সরকারের হাতে অশেষ অত্যাচারও সহ্য করেছে।

বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত বই যে চরম বিতর্কিতও হতে পারে, তারও উদাহরণ এই আনন্দমঠ। বিতর্কিত এই জন্য যে, এই বইয়ে কিছু কিছু মুসলমান বিরোধী কথা থাকায়, মুসলমানরা, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানরা অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপর খুবই ক্ষুব্ধ। তারা এক সময় রাশি রাশি আনন্দ মঠ কিনে স্তূপীকৃত করে তাতে আগুন লাগিয়ে আনন্দমঠের বহ্ন্যুৎসবও করেছিল। আজও আনন্দমঠ নিয়ে এদের ক্ষোভ আদৌ কমে নি। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

বন্দেমাতরম্ সংগীতে পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে বলে মুসলমানরা আপত্তি তোলায়, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই সংগীতের মধ্যে ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী থেকে শেষাংশ বাদ দিয়ে কেবল প্রথমাংশকেই জাতীয় সংগীত করা হয়। তখন অবশ্য কংগ্রেসে যা মুসলমান ছিল, তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল, তাদের মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানে।

যাই হোক্, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সংগীতটি নিয়ে এখন একটু বিস্তৃত আলোচনা করছি। বন্দেমাতরম্ সংগীতটি রচনার স্থান ও কাল নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে—

১। ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুর অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র একবার মজিলপুরের জমিদার বন্ধু নগেন্দ্র দত্তর বাড়িতে থেকে তাঁদের বাড়ির দুর্গাপূজা দেখেছিলেন। পূজা দেখে সেই রাত্রেই বন্দেমাতরম্ সংগীতটি রচনা করেন। পরদিন সকালে বঙ্কিমচন্দ্র সদ্যরচিত গানটি নিয়ে মজিলপুর নিবাসী শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্যের কাছে যান।

আমার বক্তব্য—বঙ্কিমচন্দ্র মজিলপুরে গেলে নগেন্দ্র দত্তর বাড়িতে থাকতেন না। থাকতেন হরমোহন দত্তর বাড়িতে। মজিলপুরবাসীদের শুধু এই মুখের কথা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণও নেই। মজিলপুরের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত আমাকে বলেছিলেন—বন্দেমাতরম্ মজিলপুরে রচিত বলে যে প্রবাদ আছে, তা আদৌ সত্য নয়।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট যুগান্তর পত্রিকায় আমি 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে নানা যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলাম—মজিলপুরে প্রচলিত ঐ প্রবাদ সত্য নয়। মজিলপুরবাসীরা আমার লেখার কোন প্রতিবাদ করেন নি, বা করতে পারেন নি।

২। ১৩৬২ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'গল্প ভারতী' পত্রিকায় অনিমা দেবী নামে এক মহিলা 'পুরাতন ডায়েরির কয়েকটি পাতা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে ছিলেন। তাতে তিনি লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে গেলে, সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একদিন এক সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানান। সেই সভায় অনিমা দেবী বন্দেমাতরম্ গানটি গেয়েছিলেন। অনিমা দেবী লিখছেন—'মনে হয়, সভার উদ্বোধন সংগীত হিসাবে এইখানেই সর্বপ্রথম সে গান গীত হয়েছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ মতই।.. সম্বর্ধনার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছিলেন, সব কথা মনে থাকা সম্ভবপর নয়। তবু কিছু কিছু মনে আছে মাত্র: আনন্দমঠের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল এই বন্দেমাতরম্ গান গাওয়ায় এবং জনসমাজে তার সুরের রেশ ছড়িয়ে পড়ায়। .. এইখানে বসেই একদিন আনন্দমঠ রচনার অনুপ্রেরণা আমি পাই। আজ এইখানেই সে গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ল।'

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে যেতে না যেতেই তিনি আনন্দমঠ রচনার প্রেরণা পেলেনই বা কবে আর সেখানে আনন্দমঠ রচনা করলেনই বা কবে? বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে যান ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং সেখানে ছিলেন বছর পাঁচেক। এর অনেক পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র চুঁচুড়া থেকে কবি নবীনচন্দ্র সেনকে যে চিঠি লেখেন, তাতে জানা যায়, তিনি আনন্দমঠ রচনায় হাত দিয়েছেন।

অনিমা দেবী আরও লিখেছেন—সভার দিন তাঁর এক সঙ্গিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস দেবী চৌধুরাণীর নায়িকার নাম নিয়ে আদর ক'রে দেবী চৌধুরাণী বলেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে যাওয়ার ১৩।১৪ পরে আনন্দমঠ রচনারও পরে দেবী চৌধুরাণী রচিত হয়েছিল।

অতএব দেখা গেল—অনিমা দেবীর বর্ণিত কাহিনী সবই বানানো অলীক গল্প।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক সেই সময়েই ১২৮২ সালের চৈত্র মাসের

অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের আগেই কোন এক সময়ে তিনি তাঁর কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানা ভবনে বসে (এখানে বসেই তিনি লেখাপড়া করতেন। এই ভবনেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা') 'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি রচনা করেছিলেন। আর শুধু রচনাই নয়, ঐ বৈঠকখানাতেই একজন গায়ক বন্দেমাতরমে সুর দিয়ে তাঁকে একাধিক বার গেয়ে শুনিয়েও ছিলেন।

আমার এই কথার সমর্থনের যুক্তিগুলো এখন বলছি। তার আগে বলে নিই, বঙ্গদর্শন প্রথম বছর কলকাতার এক প্রেসে ছাপা হলেও দ্বিতীয় বছর থেকে সঞ্জীবচন্দ্র নিজের বাড়িতে কাঁটালপাড়ায় যে বঙ্গদর্শন প্রেস স্থাপন করে ছিলেন, তখন থেকে এই প্রেসেই বঙ্গদর্শন ছাপা হ'ত। বঙ্গদর্শন পত্রিকা দেখার জন্য একজন ম্যানেজার বা কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁর নাম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সকলে পণ্ডিত মশায়ও বলতেন।

'বন্দেমাতরম্' সংগীতটির রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—'কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে আনন্দমঠ লিখিলেন। বন্দেমাতরম্ গীতটি উহার বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই এক পাতা ম্যাটার কম পড়িলে পণ্ডিত মশায় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ঐদিনেই লিখিয়া দিতেন। বন্দেমাতরম্ গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিত মশায় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় এক পাতা ম্যাটার কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—আচ্ছা, আজই পাবে।

একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিত মশায়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়া ছিল, বোধ করি উহা পাঠও করিয়াছিলেন। কাগজখানিতে বন্দেমাতরম্ গীতটি লেখা ছিল।

পণ্ডিত মশায় বলিলেন—বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে, উহা মন্দ নয় ত, ঐটা দিন না কেন!

সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন—উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না। কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে। আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।—এই গীতটির একটা সুর বসাইয়া উহার গাওনা হইত। একজন গায়ক প্রথমে উহা গাইয়াছিলেন। বহুকাল পরে 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়' কোরাসে গাহিবার জন্য মিশ্র সুর বসাইয়া ছিলেন।' —বঙ্কিম প্রসঙ্গ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরম সুহৃদ দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি তাঁর 'বন্দেমাতরম' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—'বন্দেমাতরম' রচিত হইবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন সুকণ্ঠ গায়ক ভাটপাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাতে স্বরতাল সংযুক্ত করিয়া প্রথম গাইয়াছিলেন। সেইদিন বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রের কার্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কার্যানুরোধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কিসে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা সত্বর পূরিত হয়, সেই দিকেই লক্ষ্য ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, গান যাহাই হউক, বন্দেমাতরম দ্বারা বঙ্গদর্শনের পেট ভরিবে না। আপনি একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করুন। তদুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র কহিয়াছিলেন, এ গানের মর্ম তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না। যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক তখন দেখিবে, এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।'

ললিতবাবু আরও লিখেছেন—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ 'বন্দেমাতরম সম্প্রদায়' একবার রথযাত্রার সময় কাঁটালপাড়ায় গেলে, সেদিন তিনিও সেখানে গিয়ে ছিলেন এবং ভাগ্যক্রমে ঐ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়েছিল। যে কথাগুলি তিনি বললেন, এইগুলি তিনি তখন রামবাবুর নিজের মুখেই শুনে ছিলেন।

পূর্ণবাবু এবং ললিতবাবুর লেখার মধ্যে সামান্য যেটুকু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে বলা যেতে পারে—রামবাবু প্রথমে বঙ্গদর্শনের জন্য এক পাতা লেখা চাইতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন রামবাবুকে যে কথা বলেছিলেন, পূর্ণবাবু তাই লিখেছেন। আর যেদিন যদুনাথ ভট্টাচার্য বন্দেমাতরম গান করেন, সেইদিন রামবাবু সেখানে উপস্থিত থেকে গান শুনে বঙ্কিমচন্দ্রকে যা বলেছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও যা উত্তর দিয়েছিলেন, ললিতবাবু তাই লিখেছেন। এঁদের উভয়ের লেখার মধ্যে বন্দেমাতরমের রচনা নিয়ে মূলে কোনও পার্থক্য নেই, বরং সম্পূর্ণ ঐক্যই রয়েছে।

অতএব এই প্রত্যক্ষদর্শিদের কথা অনুযায়ী দাঁড়াচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক থাকাকালে কোন এক সময়ে তাঁর কাঁটালপাড়ার বাড়িতে এই গানটি রচনা করেছিলেন। এখন এই কোন এক সময়টা সম্বন্ধে কিছু হদিস পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক্।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ১২৮১ সালের কার্তিক সংখ্যায় তাঁর 'আমার

'দুর্গোৎসব' প্রবন্ধটা ছাপা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পূজার ছুটিতে বাড়িতে এসে, বাড়ির পূজা দেখে আশ্বিন মাসে এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লিখে পরের মাসের বঙ্গদর্শনে এটি প্রকাশ করেছিলেন।

আমার ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আমার দুর্গোৎসব' রচনার পরই 'বন্দে-মাতরম' সংগীতটি রচনা করেছিলেন। তার কারণ, আমার দুর্গোৎসব প্রবন্ধের—'এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্ন-ভূষিতা-দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু-বিমর্দিত নানা প্রহরণ ধারিণী, শত্রুমর্দিনী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী এবং ছয় কোটি কণ্ঠ ও দ্বাদশ কোটি কর ইত্যাদির সঙ্গে বন্দেমাতরম সংগীতের 'শস্যশ্যামলাং মাতরম, বহুবল-ধারিণীং তারিণীম রিপুদলবারিণীং তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে, ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, কমলা…বাণীবিদ্যাদায়িনী, সপ্ত কোটি কণ্ঠ, দ্বিসপ্তকোটিভুজ' ইত্যাদির প্রায় হুবহু মিল এবং ভাবের দিক থেকেও বেশ একটা মিল পাওয়া যায়। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধের শেষে, ২৬ লাইনের এই সহজ সংস্কৃতের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটির ন্যায় ২৭ লাইনের ঐরূপ সহজ সংস্কৃতের একটি স্তোত্র দেখা যায়। তাতেও বন্দেমাতরম সঙ্গীতের ন্যায় 'জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রী, সুখদে, অন্নদে, বরদে, দুর্গে' প্রভৃতি আছে।

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র 'আমার দুর্গোৎসব' রচনা কালে যেভাবে ভাবিত ছিলেন, সেই ভাবকেই দেশাত্মবোধে উন্নীত করে তখনই বা অল্প দু একদিন পরেই এই বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন।

১২৮১ সালের আশ্বিনে বা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বঙ্কিমচন্দ্র মালদহের ডেপুটি কালেকটর ছিলেন। পূজার ছুটিতে মালদহ থেকে কাঁটাল-পাড়ার বাড়িতে এসে বাড়ির দুর্গাপূজা দেখে প্রথমে 'আমার দুর্গোৎসব' এবং পরে বন্দেমাতরম্ রচনা করেছিলেন, বলেই আমার ধারণা।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, মালদহবাসীদেরও কেউ কেউ বলে থাকেন, বঙ্কিমচন্দ্র মালদহে বন্দেমাতরম্ রচনা করেছিলেন। আমার ধারণা, তিনি কাঁটালপাড়ায় বসেই আমার দুর্গোৎসব ও পরে বন্দেমাতরম্ রচনা করেছিলেন। তাহলেই পূর্ণবাবু এবং ললিতবাবুর বর্ণিত পণ্ডিত মশায় বা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপি চাওয়া এবং গান শোনার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যও পাওয়া যায়।

আমার এই যুক্তি, তথ্য এবং ধারণা সত্য হলে দাঁড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অকটোবরেই বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন। আমার এই কথা কেউ বিশ্বাস না করলেও পূর্ণবাবু এবং ললিতবাবুর কথা অনুযায়ী এ কথা সকলেই নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক থাকাকালে ১৮৭৬ এর মার্চের আগেই কাঁটালপাড়ায় এই গানটা লিখেছিলেন।

আমি আগেই বলেছি, এইসব প্রমাণ সত্ত্বেও কোন কোন জায়গায় বেশ কয়েকজন বন্দেমাতরম রচনার স্থান ও কাল নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করে আসছেন।

১২-৯-৭৬ তারিখে চুঁচুড়া ও হুগলীর কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং হুগলী জেলার অন্য জায়গারও কয়েকজন চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের এক বাড়িতে বন্দে-মাতরম রচনার শতবার্ষিকী পালন করলেন। এঁরা এই উপলক্ষে 'বন্দেমাতরম শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ' নামে বেশ বড় একটা বইও বার করেছেন।

ঐ স্মারকগ্রন্থে বন্দেমাতরম শতবার্ষিকীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁর 'নিবেদনে' এবং অপর একটি প্রবন্ধে পরিষ্কার লিখেছেন—'বন্দেমাতরম রচিত হয়েছিল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়াঘাটস্থিত বাসভবনে।'

এখন এ সম্বন্ধেও কিছু বলছি—বঙ্কিমচন্দ্র মালদহে কয়েক মাস থাকার পর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ হুগলীতে বদলি হয়ে আসেন। এবার বদলি হয়ে এসে তিনি প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন কাঁটালপাড়ার বাড়ি থেকে গঙ্গা পার হয়ে হুগলীতে যাতায়াত করতেন। পরে চুঁচুড়ায় জোড়াঘাটের কাছে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে সপরিবারে বাস করেন।

এখন দেখা যাক, বঙ্কিমচন্দ্র কতদিন বাড়ি থেকে হুগলীতে যাতায়াত করে ছিলেন।

এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র (সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র) জ্যোতিশচন্দ্র তাঁর ডায়রিতে লিখে গেছেন—'১৮৭৯ জুন ৮। তৃতীয় পিতৃব্য (বঙ্কিমচন্দ্র) চুঁচুড়ায় বাস করিতে থাকেন, সেটেল্ড ইন চিনসুরা। বৈশাখ বা জৈষ্ঠের কোন শুভদিনে কাঁটালপাড়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র জোড়াঘাটে গিয়েছিলেন ১৮৭৯র এপ্রিল-মেতে। অতএব জোড়াঘাটে বন্দেমাতরম রচনায় শতবার্ষিক কমিটির সদস্যরা

যে বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৬ সালে জোড়াঘাটে বন্দেমাতরম লিখেছিলেন, এ কি করে সম্ভব? এ সম্পর্কে এঁদের আর আর যে বক্তব্য আছে সেগুলোও বলছি। এঁরা বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়াঘাটের বাসার অদূরেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম রচনা করে ভূদেববাবুকে দেখতে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেববাবুকে শ্রদ্ধা করতেন একথা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৯তে জোড়াঘাটে গিয়ে অথবা তার আগে যেদিনই ভূদেববাবুকে বন্দেমাতরম দেখতে দিন না কেন, তাতে এটা প্রমাণ হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৬ সালে জোড়াঘাটে বসে বন্দেমাতরম লিখেছিলেন।

এঁদের আর একটা যুক্তি চুঁচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকারের একটা লেখা। অক্ষয়বাবু লিখেছেন—যখন আনন্দমঠ সূতিকাগারে তখন ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার একজন ডেপুটি ছিলেন, বঙ্কিমবাবুও একজন ছিলেন। উভয়েরই পাশাপাশি বাসা। সন্ধ্যার পর তিনিও আসেন, আমিও যাই। তিনি সুরজ্ঞ, টেবিল হারমোনিয়াম লইয়া বন্দেমাতরম গানে মল্লারের সুর বসান। বঙ্কিমবাবুকে সুরের খাতিরে সামান্য অদলবদল করিতে হয়।'

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৯র এপ্রিল-মেতে জোড়াঘাটে গিয়ে তারপরে কখনো আনন্দমঠের কিছু অদল-বদল করলেও অক্ষয়বাবুর লেখা থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র ঐখানে বসে বন্দেমাতরম লিখেছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়' প্রবন্ধে লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র কয়েক বৎসর ধরিয়া যদু ভট্টের নিকটে গান শিখিতেন। একটি হারমোনিয়ামও কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতেছেন, ইহাও দেখিয়াছি।

ললিতবাবুর বর্ণিত যদুনাথ ভট্টাচার্যই মনে হয় এই যদু ভট্ট। কাঁটালপাড়া ভাটপাড়ার বহু প্রবীণ ব্যক্তির কাছে শুনেছি, যদু ভট্টর বাড়ি বিষ্ণুপুরে হলেও তিনি অনেকদিন এখানে বাস করে ছিলেন। তাঁর এক বোনের বাড়ি ছিল এখানে। এই যদু ভট্টই বঙ্কিমচন্দ্রকে গান শেখাতেন এবং বন্দেমাতরমে প্রথম সুরও দিয়েছিলেন।

তাই সেকালের বিখ্যাত সুরশিল্পী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীতগুরু যদুভট্ট বন্দেমাতরমে একটা সুর দেওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথায় 'সামান্য অদলবদল' করেছিলেন, এতে স্বভাবতই একটা সন্দেহও হয়!

তবুও একথা স্বীকার করে নিয়েই বলা যায়, সুরের খাতিরে সামান্য অদল-বদল করলেও বন্দেমাতরম ১৮৭৬তে জোড়াঘাটে বসে রচিত হয়েছিল, একথা কখনই প্রমাণিত হয় না।

আনন্দমঠ বইয়ে প্রথমেই 'উপক্রমণিকা'র শেষে আছে—

আর কি আছে? আর কি দিব?

তখন উত্তর হইল, 'ভক্তি'।

বঙ্গদর্শনে 'ভক্তি'র বদলে ছাপা হয়েছিল 'প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব'।

আর বর্তমানে প্রচলিত আনন্দমঠ বইয়ের শেষ পংক্তিটি হ'ল—বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।—কিন্তু বঙ্গদর্শনে এবং আনন্দমঠের ১ম সংস্করণেও এই বাক্যটির পরে আরও ছিল—বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।

বঙ্কিম আনন্দমঠে মন্বন্তরের কারণ হিসাবে মীরজাফরের নিন্দা করেছেন। সুধাকর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে বলেছেন—মন্বন্তরের ৫ বছর আগে মীরজাফরের মৃত্যু হয়েছিল। মন্বন্তরের সময় বাংলার মসনদে ছিলেন মীরজাফরের পুত্র।

যদুনাথ সরকার সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত আনন্দমঠের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। তবে তিনি একথা বলেছেন যে, বঙ্কিম যে 'সন্ন্যাসী ফকিরের' সত্য ইতিহাস থেকে আনন্দমঠের সন্তানদলের কল্পনা করেছেন, সেই 'সন্ন্যাসী ফকিররা' ছিল—এলাহাবাদ, কাশী, ভোজপুর প্রভৃতির লোক। তারা ছিল নিরক্ষর ও শৈব। মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন এসব তাদের চিন্তাতেই ছিল না।

মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত—

বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে'। বঙ্কিমচন্দ্র এই লেখার সঙ্গে লেখক হিসাবে

নিজের নাম না দিয়ে দেন শ্রীদর্পনারায়ণ পতিতুণ্ড। ঐ সময় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র। পরে এই লেখা বই হয়ে বেরোয় ১২৯০ সালের মাঘ মাসে (২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪)।

বঙ্গদর্শনে সঞ্জীবচন্দ্রের 'পদোন্নতির পন্থা' নামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে এক রামধনদাদার কাহিনী আছে। সেই কাহিনী পড়ে তারই আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র এই 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' লিখে ছিলেন। তবে এই দুটি লেখার মধ্যে তফাৎ প্রচুর। বঙ্কিমের লেখায় যে তীব্র ব্যঙ্গ ও জ্বালা আছে, সঞ্জীবের লেখায় তার নামগন্ধও নেই। আমার 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য' বইয়ে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'পাঠকদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই গ্রন্থ কোন ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের লোককে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। সাধারণ সমাজ ভিন্ন, কাহারও প্রতি ইহাতে ব্যঙ্গ নাই। ইহাতে পাঠক যেরূপ মনুষ্য চরিত্র দেখিবেন, সেরূপ মনুষ্য চরিত্র সকল সমাজে, সকল কালেই বিদ্যমান। আধুনিক বাঙালী সমাজ, এই গ্রন্থের বিশেষ লক্ষ্য বটে, কিন্তু তৎস্থিত কোন ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষ তাহার লক্ষ্য নহে। যদি কেহ বিবেচনা করেন যে, তিনি ইহার লক্ষ্য, তবে ভরসা করি, তিনি কথাটা মনে মনেই রাখিবেন। প্রকাশে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখি না।'

এই লেখার শেষের দুটি বাক্য থেকে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিম শুধু জ্ঞাতসারেই নয়, দম্ভ সহকারেই ব্যঙ্গ করে লিখেছেন। আর ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষকে লক্ষ্য করে লেখা হয় নি, বললেও, মুচিরামকে যে শ্রেণী বিশেষের বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক বলে চিত্রিত করা হয়েছে, ঐ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বঙ্কিমের এই লেখার জন্য তাঁর উপর রীতিমতই ক্ষুব্ধ।

বঙ্কিমের জীবিতকালে এ বইয়ের আর কোন সংস্করণ হয় নি।

দেবী চৌধুরাণী—

সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের তখন শেষ সময়। প্রতি মাসের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় অনিয়মিতভাবে অনেক দেরিতে দেরিতে। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস ১২৮৯ সালের পৌষ মাসের বঙ্গদর্শনে ছাপা

শুরু হয়। পৌষ থেকে চৈত্র পর্যন্ত চার সংখ্যায় মাত্র এই উপন্যাস তখন প্রকাশিত হয়। তারপর বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়।

ছ মাস বন্ধ থাকার পর শ্রীশ মজুমদারের উদ্যোগে ও মালিকানায় বঙ্গদর্শন আবার ১২৯০এর কার্তিক মাস থেকে বেরোতে থাকলে তাতেও ঐ অসমাপ্ত দেবী চৌধুরাণী পুনরায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু শ্রীশবাবুর বঙ্গদর্শন মাত্র চার মাস অর্থাৎ মাঘ পর্যন্ত চলার পর বন্ধ হয়। দেবী চৌধুরাণীও তখন ঐ বঙ্গদর্শনে ঐ চার মাসই প্রকাশিত হয়েছিল।

দু বারের বঙ্গদর্শনে মোট ৮ সংখ্যায় দেবী চৌধুরাণীর ২য় খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। পরে বাকি অংশ লিখে বই সমাপ্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণী বই আকারে প্রকাশ করেন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে (১২৯১ এর জ্যৈষ্ঠে)।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন পিতা যাদবচন্দ্রকে। উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন—

যাঁহার কাছে প্রথম নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছিলাম,
যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্মই ব্রত করিয়াছিলেন,
যিনি এখন পুণ্যফলে স্বর্গারূঢ়,
তাঁহার পবিত্র পাদপদ্মে
এই গ্রন্থ ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

দেবী চৌধুরাণীর 'একটি ঐতিহাসিক মূল আছে। যিনি বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হণ্টর সাহেব কর্তৃক সংকলিত এবং গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালার Statistical Account মধ্যে রঙ্গপুর জিলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। সে কথাটা বড় বেশী নয়; এবং দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুড্‌ল্যাড সাহেব, লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্যন্ত। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বাধিত হইব।'

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই গ্রন্থে একটা ধর্মীয় আদর্শ এবং মানুষের উন্নত জীবনের

কথা বলতে চেয়েছেন। উপন্যাসের নায়িকা প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি অনুশীলনতত্ত্ব দেখাতে চেয়েছেন। এই বইয়ে আর যে দুটি কথা বলেছেন, সে দুটি হল—নিষ্কাম কর্মসাধনা ও গার্হস্থ্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে দেবী চৌধুরাণীর ৬টি সংস্করণ হয়েছিল। শেষ সংস্করণ হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। ১ম সংস্করণের পর বঙ্কিমচন্দ্র এই বইয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। ১ম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০৬। ৬ষ্ঠ সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ২৩১।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস—

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দিরা (৪র্থ সংস্করণ), যুগলাঙ্গুরীয় (৪র্থ সংস্করণ), রাধারাণী (৩য় সংস্করণ) এবং রাজসিংহ (২য় সংস্করণ) একত্র করে 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' নামে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। এটি আসলে ইতি-পূর্বে প্রকাশিত 'উপকথা'ই। কেবল 'উপকথা'র সঙ্গে 'রাজসিংহ' যোগ করা হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র পরে আর এই 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ করেন নি।

রাধারাণী—

রাধারাণী প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার পর, দুবার 'উপকথা' গ্রন্থে এবং একবার 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসে' অন্যান্য গল্পের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসে' রাধারাণীর যে ৩য় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল, সেইটাই নিয়ে ১৮৮৬র ২৫শে জুন বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম 'রাধারাণী'কে পৃথক ভাবে বই করে প্রকাশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর আগের বছর এই ৩য় সংস্করণ 'রাধারাণী'কে পরিবর্ধিত করে ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫।

'রাধারাণী'র উৎস সম্বন্ধে শচীশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখেছেন—'গৃহ-বিগ্রহ রাধাবল্লভজিউর রথযাত্রা প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। পূজনীয় যাদবচন্দ্র তখন জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটি

লইয়া গৃহে আসিয়া ছিলেন। রথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহার আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধানার্থ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়া ছিলেন। এই ঘটনার দুই মাস পরে 'রাধারাণী' লিখিত হয়। আমার মনে হয়, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'রাধারাণী' রচনা করিয়াছিলেন।'

কৃষ্ণচরিত্র—

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট (শ্রাবণ, ১২৯৩)। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে কৃষ্ণচরিত্র ১২৯১ সালের শ্রাবণ, কার্তিক, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র; ১২৯২ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ-পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন-চৈত্র এবং ১২৯৩ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা 'প্রচারে' প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম সংস্করণ কৃষ্ণচরিত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল—১৯৮।

১ম সংস্করণ 'কৃষ্ণচরিত্রে'র বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আনুপূর্বিক সাধারণকে বুঝাইতে পারি, এমন সম্ভাবনা অল্পই। কেন না, কথা অনেক, সময় অল্প। এই সকল কথার মধ্যে তিনটি কথা, আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। ঐ প্রবন্ধ তিনটি দুইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে।

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্মবিষয়ক; দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ব বিষয়ক; তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজি পর্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই।...

সকলগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহা পুনর্মুদ্রিত করিব, এ আশায় বসিয়া থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে কোন প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইবে না। কেন না. সকল কাজেরই সময় অসময় আছে। এই জন্য কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করা গেল।...

আগে অনুশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলে ভাল হইত। কেন না 'অনুশীলন ধর্ম' যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহ-

বিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তারপর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ; কিন্তু অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে।'

কৃষ্ণচরিত্র প্রথম খণ্ড বা প্রথম ভাগ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারে আবার কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ১২৯৩ সালের প্রচারের অগ্রহায়ণ-পৌষ এই এক সংখ্যায় মাত্র লিখে আর লিখতে পারলেন না। শেষে ১৮৯২ এর ১১ই আগষ্ট (শ্রাবণ ১২৯৯) কৃষ্ণচরিত্র প্রথম খণ্ডের ২য় সংস্করণের সময় সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায়—সর্বসমেত ৫২২।

কৃষ্ণচরিত্র ২য় সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অল্লাংশ মাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তাছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া উপক্রমণিকা-ভাগ পুনর্লিখিত এবং বিশেষ রূপে পরিবর্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্লাংশ মাত্র। অধিকাংশই নূতন।…

আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মত পরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না।…মত পরিবর্তিত বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পরিবর্তন হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞান বিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।…

পরিশেষে বক্তব্য, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি; —সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য কোন যত্ন পাই নাই।'

বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখেছেন—‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমার যত দূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপখ্যান জন-সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকার কৃত কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি।’

বঙ্কিমের আগে, এমন কি পরে আজ পর্যন্তও তাঁর মত অত পড়াশুনা ও অত পরিশ্রম করে ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে নিয়ে কেউই আলোচনা করেন নি বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র আলোচনার বিষয় সমূহের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল, ‘কৃষ্ণদ্বেষীদিগের নিকট যে কথা কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃষ্ণ-উপাসকদিগের নিকট যাহা কৃষ্ণভক্তির কেন্দ্র স্বরূপ’ সেই ব্রজগোপীতত্ত্বকে তিনি সত্য নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এর পক্ষে তিনি নানা যুক্তিও দেখিয়েছেন।

বঙ্কিম লিখেছেন—‘ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে।’

বঙ্কিম বলেছেন—মহাভারতের সভাপর্বে শিশুপাল বধ অধ্যায়ে শিশুপাল কর্তৃক কৃষ্ণের বিস্তর নিন্দা আছে। মহাভারত রচনাকালে যদি কৃষ্ণের ঐ ব্রজগোপীগণঘটিত কলঙ্ক থাকত, তাহলে শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধ বৃত্তান্ত লিখেছেন, তিনি কৃষ্ণনিন্দা কালে কখনই ঐ নিন্দাটা করতে ভুলতেন না।

বঙ্কিম তাঁর ‘কৃষ্ণচরিত্রে’ ব্রজগোপীতত্ত্ব তথা রাধাতত্ত্ব অস্বীকার করায় তিনি বহু হিন্দুর বিরাগভাজন হয়েছেন।

বঙ্কিমের মৃত্যুর পর চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে আয়োজিত যে সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, সেই প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন—

‘বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত, তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পণ্ডিত

হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে, সে আঘাতে বেদনা-বোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি, বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথককরণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসঙ্কোচে করিয়াছেন যে, এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।'

সীতারাম—

'সীতারাম' উপন্যাস প্রথমে 'প্রচার' মাসিক পত্রিকায় ১২৯১ সালের শ্রাবণ থেকে ১২৯৩ এর মাঘ মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রচারে বেরোন বন্ধও থাকে। যেমন—শ্রাবণ ১২৯১ থেকে কার্তিক পর্যন্ত বেরিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে বন্ধ থাকে। আবার পৌষ মাঘ মাসে বেরিয়ে ১২৯২ সালের আষাঢ় পর্যন্ত বন্ধ থাকে। এরপর ১২৯২ এর শ্রাবণ থেকে ১২৯৩ এর মাঘ মাস পর্যন্ত একটানা বেরোয়। তবে এই সময়ের মধ্যে 'প্রচার' কয়েকবার দু মাসের একত্রে হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

সীতারাম বই হয়ে বেরোয় ১২৯৩ সালের ফাল্গুনে (৪ মার্চ ১৮৮৭)। সীতারাম প্রচারে যেমন বেরিয়েছিল প্রায় সেই রূপেই বই হয়েও বেরোয়। সামান্য কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন হয়েছিল মাত্র।

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত তাঁদের সম্পাদিত সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ 'সীতারাম' গ্রন্থের শেষে 'পাঠভেদ' প্রসঙ্গে লিখেছেন—'প্রচারে' প্রকাশিত 'সীতারামে'র সহিত ১ম সংস্করণ পুস্তকের পার্থক্য খুব বেশী নয়, কয়েকটি অনুচ্ছেদ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কয়েকটি শব্দ পরিবর্তিত হইয়াছে মাত্র।'

প্রচারে প্রকাশিত সীতারামের কয়েকটি অনুচ্ছেদ পরিত্যাগ এবং কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করা ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র ১ম সংস্করণ সীতারামে 'প্রচারে'র অতি-রিক্ত কিছু সংযোজনও করেছিলেন। যেমন—প্রচারে বই শেষ হয়েছিল, এই কথাগুলি দিয়ে—

'রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি এবং সর্বফল দাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, পাঠকেরা

সীতারামের দুষ্কর্ম এবং শ্রীর অপকর্ম হইতে বিরত হইয়া জয়ন্তীর কর্মানুকারী হউন।'

বঙ্কিমচন্দ্র ১ম সংস্করণ 'সীতারামে' কিন্তু এই কথাগুলির পর আরও লিখে যোগ করে বই শেষ করেছিলেন এই বলে—

এখন, যাও জয়ন্তী! প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুই জনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ কর।

বঙ্কিমচন্দ্র পরের সংস্করণে এই লেখাগুলির মধ্যে 'আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি'—পযন্ত রেখে বাকি সব বাদ দিয়ে ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম' উৎসর্গ করেছিলেন, বই প্রকাশের কিছুদিন আগে মৃত স্নেহভাজন বন্ধু সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে। উৎসর্গ পত্রে লিখে ছিলেন—

সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, সর্বগুণের আধার, সকলের প্রিয়
আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের
স্মরণার্থ এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

'সীতারামে'র ১ম সংস্করণের ভূমিকায় বা বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে। যাঁহারা সীতারামের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Westland সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিবেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রকাশিত সীতারামের ২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লেখেন—

সীতারামের কিয়দংশ পরিত্যক্ত এবং কিয়দংশ পরিবর্তিত হইল। গ্রন্থের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইল, এজন্য ইহার দামও কমান হইল।

১ম সংস্করণ সীতারামের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪১৯। ২য় সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা অনেক কমে যায়।

১ম সংস্করণ সীতারামের '১ম খণ্ড ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ'টি বঙ্কিমচন্দ্র ২য় সংস্করণের সময় বাদ দেন। ঐ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র চাঁদশাহ নামক এক মুসলমান ফকিরের মুখে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে ফকিরের সঙ্গে সীতারামের এক আলাপের চিত্র দিয়েছিলেন। বঙ্কিম ২য় সংস্করণে ঐ ত্রয়োদশ

পরিচ্ছেদের মাত্র কয়েকটি কথা নিয়ে নতুন করে লিখে নবম পরিচ্ছেদে (এই নবম পরিচ্ছেদটি ১ম সংস্করণে হয়েছিল চতুর্দশ পরিচ্ছেদ) দিয়েছেন।

সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' বইয়ে লিখেছেন— 'যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমায় মহম্মদপুরে সীতারাম রাজত্ব করিতেন। বঙ্কিমবাবু কিছুকাল মাগুরার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখনই তিনি একদা সীতারামের কীর্তিচিহ্ন দেখিবার জন্য মহম্মদপুরে যান। তখন সে স্থান বড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল।···তিনি তথাকার ৺রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্প-রসিক কর্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক গল্পগুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন, রাইচরণবাবু ২।৩ মাস বঙ্কিমচন্দ্রের বেতনভূক হইয়া মাগুরায় থাকেন ও তাঁহাকে সময় মত গল্প শুনাইতেন।' —২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১৪।

বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি জীবনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, তিনি আগষ্ট ১৮৫৮ থেকে জানুয়ারি ১৮৬০ পর্যন্ত যশোহরে, নভেম্বর ১৮৬০ থেকে মার্চ ১৮৬৪ পর্যন্ত খুলনায় এবং ২৫ জুন ১৮৮৫ থেকে মে ১৮৮৬ পর্যন্ত ঝিনাইদহে ছিলেন।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র কোন দিনই যশোহরের মাগুরা মহকুমায় ছিলেন না। সতীশবাবু যদি বঙ্কিমচন্দ্রের ঝিনাইদহের চাকরিকেই মাগুরার চাকরি বলে বুঝে থাকেন, তাহলেও দাঁড়ায়, বঙ্কিমচন্দ্র ঝিনাইদহে যাওয়ার অনেক আগেই সীতারাম লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। কারণ, তিনি ঝিনাইদহে যান ১৮৮৫র জুনে বা ১২৯২ এর আষাঢ়ে, আর সীতারাম লিখে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন ১২৯১ এর শ্রাবণ থেকে।

তবে সীতারাম লেখার শেষ দিকে ঝিনাইদহে থাকা কালে বঙ্কিমচন্দ্র রাইচরণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে সীতারামের গল্প শুনে থাকতে পারেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে যশোহরে এবং পরে খুলনায় (খুলনা তখন পৃথক জেলা হয় নি, যশোহরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল) থাকাকালে খুব সম্ভব সীতারামের কাহিনী লোকমুখে শুনেছিলেন। পরে Stewart এবং Westland সাহেবের বই দুটিও পড়েছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত সম্পাদিত 'সীতারামে'র 'ঐতিহাসিক ভূমিকা' লিখতে গিয়ে যদুনাথ সরকার লিখেছেন—'সীতারামের বাসস্থানে তাঁহার নিজের এবং লোকজনের বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী সীতারামের নিজ

জীবনের বিবরণের একমাত্র উপাদান। তাহার উপর বঙ্গদেশের ইতিহাস কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র ষ্টুয়ার্ট (তস্য পিতা রিয়াজ-উস-সলাতীন, তস্য পিতা সলিমুল্লার তারিখ-ই-বংগালা) হইতে লইয়া বঙ্কিম নিজ কাহিনী পূর্ণ করিয়াছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের উৎস হিসাবে যদুনাথ ষ্টুয়ার্টের বই সম্বন্ধে 'তস্য পিতা, তস্য পিতা' বলে ব্যঙ্গ করে লিখলেও, বঙ্কিমচন্দ্র তো নিজেই Westland এরও বইয়ের কথা বলেছেন। বঙ্কিম বরং তাঁর সীতারাম উপন্যাসে Stewart এর History of Bengal এর চেয়ে Westland এর A Report of the District of Jessore বই থেকেই বেশী তথ্য নিয়েছেন।

যদুনাথ তাঁর সীতারামের ঐতিহাসিক ভূমিকায় লিখেছেন—১৮৬১-১৮৬৩ এই তিন বৎসর বঙ্কিম খুলনা জেলায় ডেপুটি কালেকটর ছিলেন এবং ঐ জেলার মাগুরা বিভাগের সব ডিভিসনাল অফিসার নিযুক্ত থাকেন।

যদুনাথের একথা ঠিক নয়। কারণ, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা পৃথক জেলা ছিল না। খুলনা তখন যশোহর জেলারই একটা মহকুমা। আর মাগুরা বরাবরই যশোহরের মহকুমা। খুলনার কখনই নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে কোনদিন মাগুরা মহকুমায় থাকেন নি, সে তো আগেই দেখিয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র যদি মাগুরায় থাকতেন, তাহলে বাঙ্গলা সরকারের গেজেটেড অফিসারদের চাকরির যে ইতিহাস বই আছে, তাতে নিশ্চয়ই মাগুরার কথাই লেখা থাকতো।

বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে যেভাবে সীতারামের শেষ পরিণতি দেখিয়েছেন, সতীশবাবু তা সমর্থন করেন নি। বরং ঐভাবে লেখার জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ক্ষুণ্ণই হয়েছেন। তিনি লিখেছেন—সীতারাম চিত্তবিশ্রামে প্রেমবিলাসে মত্ত, তাঁর সৈন্য সামন্ত সময় বুঝে সরে পড়ল, মোগলরা এসে অনায়াসে তাঁর রাজ্য লুঠে নিল; 'ব্যাপারটা এত সোজা নহে।...সীতারাম যে বিলাসী ছিলেন, সেকথাও একেবারে অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু বিলাসীর পক্ষে বশ্যতা স্বীকারই তো স্বাভাবিক হইত। সীতারাম তাহা করিলেন না কেন? ...তিনি কিনা সুরক্ষিত দুর্গের অনতিদূরে অরক্ষিত চিত্তবিশ্রামের পর্ণকুটিরে বিশ্রম্ভালাপে বিস্মৃত হইয়া রহিলেন? ইহাও কি বিশ্বাস করিতে হইবে? ... সাহিত্য-সম্রাট তো তাঁহার নভেলের ঐতিহাসিকতা বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আত্ম-বিস্মৃত বাঙ্গালী পাঠক কি সে নিষেধ মানে?

না নভেলী গল্পকে ইতিহাসের উপর স্থান দিয়া সীতারামের মুখে কালিমা মাখিয়া দিতেছেন? উপন্যাস ইতিহাসের সর্বনাশ সাধন করিতেছে বলিয়াই এত কথা বলিতে হইল।' পৃঃ ৫৮৯-৯০

বঙ্কিমের সীতারামের এই শেষাংশটা নিয়ে আমারও একটা প্রশ্ন আছে। অবশ্য সতীশবাবুর ঐ লেখা অনুযায়ী, রাজা সীতারামের চিত্তবিশ্রাম পর্ণ-কুটীরের ছিল কিনা, আর সে চিত্তবিশ্রাম অরক্ষিত ছিল কিনা কিংবা বিলাসীর পক্ষে বশ্যতা স্বীকার করাই স্বাভাবিক ছিল কি না, এ সব নিয়ে আমার প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন—সীতারাম রাজ্যের সমস্ত সুন্দরী স্ত্রীদের নিয়ে পাপে লিপ্ত হ'ল, অথচ এ নিয়ে তাঁর গুরু চন্দ্রচূড়, হিতৈষী চাঁদ শাহ, তাঁর স্ত্রী নন্দা, রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ, প্রজাবৃন্দ কেউই কিছু বলল না?

বঙ্কিম লিখেছেন—সীতারামের 'ভোগবিলাসে শেষ' সময়ে চিত্তবিশ্রামের ধর্ষিতা রমণীদের মধ্য থেকে ভানুমতী ক্ষোভে ও দুঃখে 'ধর্ম আছে' 'ধর্ম আছে' বলে সীতারামকে ধর্মকথা শুনিয়ে ছিল।

কিন্তু এরা অপহৃতা ও ধর্ষিতা হওয়ার আগে একটা কথাও বলল না কেন? আর ঐ সব নারীদের পুরুষ অভিভাবকরাই বা তখন কোথায় ছিল? সীতা-রামের অমন জঘন্য পাপের কাজে, কেউ একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করল না? অন্তত বঙ্কিমের বইয়ে তা নেই।

প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম' গ্রন্থে সীতারাম উপন্যাসে সীতারামের শেষ সময়কার কথায় লিখেছেন—

'মৃত্যুর আহ্বানে তাঁহার মনুষ্যত্ব পুনঃ সঞ্জীবিত হইল। সীতারাম যখন তোপের মুখে মুসলমান সেনা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া সূচীব্যূহের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, তাঁহার তৎকালীন রুদ্রমূর্তি দেখিয়া আমরা জয়ন্তীর প্রতি অত্যাচার-কারী হিংস্র পশুবৎ সীতারামকে ভুলিলাম—সীতারাম পুনরায় আমাদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার রাজ্য রক্ষা পাইল না, পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সীতারাম পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন জয়ন্তীর অশ্রু অভিশপ্ত রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ।'

প্রফুল্লবাবু তাঁর বইয়ে 'পরিশিষ্ট-গ'তে ৫৭৬ পাতায় দেখিয়েছেন—সীতারাম উপন্যাসের শেষ তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাগুলি একই দিনে ঘটেছিল। প্রফুল্লবাবুর এই কথা অনুযায়ীই দেখছি, ঐ শেষ দিনেই সীতারাম প্রথম দিকে 'চিত্তবিশ্রামে সুন্দরীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হয়ে লীলায় উন্মত্ত'। তাই যে সীতারাম

সকালে পাপে মগ্ন, সে-ই তুপুরে বা বিকালে, দেশরক্ষা বা বিরাট কিছু কাজও নয়, অপরের সাহায্যে নিজের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের রক্ষার চেষ্টা করল বলেই সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে ? প্রফুল্লবাবু সীতারামের শেষ কাজ দেখে ৫।৬ মাস আগের ঘটনার জন্য জয়ন্তীর প্রতি অত্যাচারী পশুবৎ সীতারামকে ভুললেন, কিন্তু ঐ শেষ দিনেরই চিত্তবিশ্রামের পশুবৎ সীতারামকে ভুললেন কি করে ?

আর জয়ন্তী তো সীতারামকে কোন অভিশাপ দেয় নি। তাই সীতারাম জয়ন্তীর অভিশপ্ত রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ রেখে যাবে কেন ?

জয়ন্তী যদি তার প্রতি ঐ পশুবৎ অত্যাচারের জন্য সীতারামকে কোন অভিশাপ দিত, তাহলে বোধ করি জয়ন্তীর চরিত্রটা আরও কিছুটা স্বাভাবিক হ'ত। কিন্তু বঙ্কিম জয়ন্তীকে আরও মহীয়সী দেখাবার জন্য তা করেন নি।

বিবিধ প্রবন্ধ—

'বিবিধ প্রবন্ধে'র বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

'ইতিপূর্বে কতকগুলি প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচন' নামে, আব কতকগুলি 'প্রবন্ধ পুস্তক' নামে প্রকাশিত করা গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রন্থই অপ্রাপ্য।

তুইখানি পৃথক সংগ্রহ নিঃপ্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সংকলন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ' নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্বে 'বিবিধ সমালোচন' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে' প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন বিষয়ে এক্ষণে আমার মত পরিবর্তিত হইয়াছে ; কোন কোন স্থানে ভ্রম সংশোধন করা গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থানে বিশেষ কারণ বশত প্রবন্ধ যেমন ছিল, তেমনি রাখিতে হইয়াছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের আগে প্রকাশিত 'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থের ৯টি প্রবন্ধের মধ্যে ৮টি এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে'র ১০টি প্রবন্ধের মধ্যে ৮টি এবার এই 'বিবিধ প্রবন্ধ' বইয়ে স্থান পায়। এ বই প্রকাশিত হয় ১৮৮৭র ৭ই জুলাইয়ে।

'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থের যে প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধে বাদ দেন, সে প্রবন্ধটি 'কৃষ্ণচরিত্র'। সেটি ১২৮১ সালের চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' গ্রন্থের আলোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র পরে যে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ করেন, তাতে এর অনেক কথা দিয়ে দেন।

'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থের 'সেকাল আর একাল' প্রবন্ধটি বিবিধ প্রবন্ধে 'অনুকরণ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ পুস্তকের অন্তর্গত 'বুড়া বয়সের কথা' কমলাকান্তের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর 'হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল' কিছু সংশোধিত ও পরিবর্জিত হয়ে 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্র কি বলে' নামে 'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগে' স্থান পায়।

বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ—

'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে। এই বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই লেখেন—'যে সকল প্রবন্ধ এই সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, অল্পভাগ প্রচারে।

আমার নিজের রচনার অধিকাংশই ইতিপূর্বে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। যাহা বাকি ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই প্রবন্ধে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।...

অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব কিনা, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।'

এই বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে মোট ২২টি প্রবন্ধ আছে। এই বইয়েও প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের সময় কোন কোন প্রবন্ধের পরিবর্তন এবং পরিবর্জনও করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'বিবিধ প্রবন্ধ' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ'—বইয়ের দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় নি।

এই দুটি বইয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি ছাড়া আরও যেসব প্রবন্ধ ছিল, তার কিছু সংগ্রহ করে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত তাঁদের সম্পাদিত 'বঙ্কিম-রচনাবলী'র বিবিধ খণ্ডে দিয়েছেন।

ধর্মতত্ত্ব—

১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'নবজীবন' মাসিক

পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় প্রথম সংখ্যাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে মাঝে মাঝে দু-এক মাস বাদ দিয়ে ১২৯২ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র নবজীবনে হিন্দুধর্ম নিয়ে নানা প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলি নিয়ে কিছু পরিবর্তিত আকারে এবং ঐ সঙ্গে আরও কয়েকটি ঐ ধর্ম বিষয়েই প্রবন্ধ লিখে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ, অনুশীলন'—গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটিকে পরিবর্তিত করে এবং দু ভাগে ভাগ করে ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের শেষে ক্রোড়পত্র ক ও খ করে মুদ্রিত করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১২৯৫ সালে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল, সর্বসমেত ৩৬৮; দাম—দেড় টাকা।

বইয়ের প্রথম ভাগ নাম দেখে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এরপর ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আরও লিখে হয়ত ঐ বইয়ের দ্বিতীয় ভাগও প্রকাশ করতেন। খুব সম্ভব সময়ের অভাবের জন্যই তিনি আর লিখে উঠতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন আগে ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ২য় সংস্করণে তিনি কিছু কিছু সংশোধন করে যান।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব ১ম সংস্করণ প্রকাশের পর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'কৃষ্ণ-চরিত্র' গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঐ কৃষ্ণচরিত্র ২য় সংস্করণের উপ-ক্রমণিকায় বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁর ধর্মতত্ত্ব বইটির কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন—

ইতিপূর্বে 'ধর্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে আমি যে কয়টি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই—

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ।

স্কুল পাঠ্য বই—

বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের একেবারে শেষ দিকে (মৃত্যুর ২।৩ বছর আগে) 'সহজ

রচনা শিক্ষা' ও 'সহজ ইংরাজি শিক্ষা' নামে দুটি বই রচনা করেছিলেন। বই দুটি তখন স্কুলে স্কুলে ভাল চলেছিল বলে, দুটারই কয়েকবার (৩।৪ বার) করে পুনর্মুদ্রণও হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষার্থীদের পড়ার জন্য একটা বাংলা সংকলন গ্রন্থও করে দিয়েছিলেন। তাতে অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে নিজেরও ক'টি রচনা দিয়েছিলেন। ঐ বইয়ে তখন মহাভারতের একটা গল্প অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। এবং ইংরাজীতে বইয়ের একটা ভূমিকাও লিখে ছিলেন। সেই লেখা দুটা এই বইয়ের শেষে সংযোজন অংশে দিয়েছি।

ছোট্ট ইংরাজি ভূমিকাটা ব্রজেনবাবুরা তাঁদের সম্পাদিত বঙ্কিম-রচনাবলীর বিবিধ খণ্ডে দিয়েছেন। তবুও আমি দিয়েছি এইজন্য যে, এই বইয়ে কয়েকটা আলোচনায় ঐ ভূমিকার কথা এসে গেছে এবং কোথাও উদ্ধৃতি দিতে হয়েছে।

গীতার ব্যাখ্যা—

বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' পত্রিকায় গীতার ২য় অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যাগুলি ১২৯৩ সালের শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন-কার্তিক, অগ্রহায়ণ-পৌষ এবং ১২৯৫ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ ও ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা 'প্রচারে' প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। তাই গীতার ব্যাখ্যা প্রকাশও বন্ধ হয়।

গীতার আলোচনার ভূমিকা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই লিখেছিলেন— 'ভগবান শঙ্করাচার্য প্রভৃতি প্রণীত গীতার ভাষ্য ও টীকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তবে···এখন আমাদিগের 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা প্রণালীর অনুবর্তী। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত। কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম তাঁহাদিগকে বুঝান আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।'

বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় (রাখালবাবুর পুত্র)

বলেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারে প্রকাশিত গীতার ২য় অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাখ্যা ছাড়া, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর দিব্যেন্দুসুন্দর বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ব্যাখ্যার সঙ্গে গীতার বাকি অংশ কালীপ্রসন্ন সিংহের গীতার অনুবাদ দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রকাশ করে ছিলেন।

অন্যান্য রচনা—

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'লুপ্ত রত্নোদ্ধার' নামে টেকচাঁদ ঠাকুরের যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেই বইয়ের একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রের আর্থিক সুবিধা করে দেবার জন্য 'সঞ্জীবনী সুধা' নামে সঞ্জীবচন্দ্রের যে রচনা-সংকলন গ্রন্থ করে দেন, তাতে একটি সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীও লিখে দিয়ে ছিলেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট কলকাতার সংস্কৃত কলেজে 'সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন' নামে যে সভা প্রতিষ্ঠা হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ সভার সাহিত্য-শাখার স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সভাই পরে 'ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউট' নামে পরিচিত হয়। এতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে দুটি ইংরাজি প্রবন্ধ পড়ে ছিলেন। সেই প্রবন্ধ দুটি Vedic literature নামে তখন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ ও ঐ বছরেরই ১লা এপ্রিল সংখ্যা The Calcutta University Magazine পত্রিকায় ছাপা হয়।

গ্রন্থাবলীর অনুবাদ, নাট্যরূপ ও ছায়াচিত্ররূপ

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রায় সবই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কয়েকটি উপন্যাস ইংরাজি প্রভৃতি অন্যান্য বিদেশীয় ভাষাতেও অনুবাদ হয়েছে। তাঁর জীবিতকালেই এইরূপ অনুবাদ কিছু কিছু হয়েছিল। যেমন—হিন্দুস্থানীতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ থেকে দুর্গেশনন্দিনীর অনুবাদ, লক্ষ্ণৌ থেকেই ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মৃনালিণীর অনুবাদ, ১৮৯১য়ে শিয়ালকোট থেকে বিষবৃক্ষের এবং ১৮৯৩তে অমৃতসর থেকে দেবী চৌধুরাণীর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

হিন্দীতে পাটনা থেকে ১৮৮০তে যুগলাঙ্গুরীয়ের, এবং ১৮৮২তে বারাণসী থেকে দুর্গেশনন্দিনীর অনুবাদ বেরোয়। আর ১৮৮৫তে বাঙ্গালোর থেকে বেরোয় দুর্গেশনন্দিনীর কানাড়ী অনুবাদ।

লণ্ডন থেকে ১৮৮৪ ও ১৮৮৫তে যথাক্রমে বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১৮৮৬তে জার্মাণী থেকে জার্মাণ ভাষায় কপালকুণ্ডলার এবং ১৮৯৪য়ে সুইডেন থেকে সোয়েডিশ ভাষায় বিষবৃক্ষের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে রুশ প্রভৃতি ভাষাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার অনুবাদ হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালেই আমাদের দেশেও তাঁর কপালকুণ্ডলা এবং দুর্গেশনন্দিনীর ইংরাজি অনুবাদ বেরিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর কৃষ্ণকান্তের উইল, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, সীতারাম, আনন্দমঠ, রজনী, ইন্দিরা প্রভৃতিরও ইংরাজি অনুবাদ হয়ে বেরোয়। এর মধ্যে কয়েকটি বই একাধিক বারও অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, আনন্দমঠ দুবার অনুবাদ হয়েছে। প্রথম অনুবাদ করেন 'The Abbey of Bliss' নাম দিয়ে সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পরে আবার আনন্দমঠ নাম দিয়েই অনুবাদ করেছিলেন—শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ছাড়া তাঁর প্রবন্ধেরও ইংরাজি অনুবাদ হয়েছে। যেমন, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত থেকে প্রকাশিত The Indian Magazine and Review পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় Miriam S. Knight বঙ্কিমচন্দ্রের

'স্বর্ণ গোলকে'র The Globe of Gold নাম দিয়ে ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। বিদেশীদের মধ্যে এই মিরিয়ম এস নাইটই সর্ব প্রথম লণ্ডন থেকে ১৮৮৪তে The Poison Tree নাম দিয়ে বিষবৃক্ষের অনুবাদ করেন। তাঁর ঐ বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত Edwin Arnold. তখনকার বিলাতের প্রসিদ্ধ Punch পত্রিকায় একটা কবিতায় এই বইয়ের কথা প্রশংসার সহিত প্রচারিত হয়েছিল। এই কবিতায় এবং এডউইন আরনল্ডের ভূমিকায়ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা ছিল।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। সেই প্রায় প্রথম থেকেই এখনও পর্যন্ত (এখন অবশ্য ক্বচিৎ কখন) সাধারণ রঙ্গালয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়ে আসছে। তাঁর কপালকুণ্ডলারই প্রথম নাট্যরূপ অভিনয় হয় ১৮৭৩ এর ১০ই মে। অভিনয় করেছিল তখনকার ন্যাশনাল থিয়েটার। এরপর ঐ বছরই ২০শে ডিসেম্বর দুর্গেশনন্দিনীর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয় বেঙ্গল থিয়েটারে। পরে বিভিন্ন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী ছাড়াও মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ প্রভৃতির অভিনয় হয়। অনেক জায়গায় সখের থিয়েটারেও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি ছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনাও নাট্যরূপ নিয়ে বহুবার কলকাতার বিভিন্ন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ও সে সব অভিনয় করেছে। এইরূপ কোন কোন বইয়ের নাট্যাভিনয় আজও কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সর্ব প্রথম যে অভিনয় হয়, তার নাট্যরূপ দিয়ে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অভিনয় হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোগে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে।

এরপরই বেঙ্গল থিয়েটারে দুর্গেশনন্দিনীর যে অভিনয় হয়, তাতে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার, রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার প্রভৃতি কলকাতার সকল সাধারণ রঙ্গমঞ্চই কেউ এক, কেউ বা একাধিক বার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাসেরই অভিনয় করেছিল। ১৯১৮

খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় হয়েছিল 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত।' এই ষ্টার থিয়েটারেই আমার এই 'বঙ্কিমচন্দ্র' বই প্রকাশের কিছুদিন আগেও দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় হল—কৃষ্ণকান্তের উইল। আর কলকাতার তপন থিয়েটারেও এক সৌখীন দল অভিনয় করল—স্বর্ণ গোলক।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন চুঁচুড়ায় ছিলেন, তখন তাঁর নির্দেশে সেখানকার এক সখের নাট্যকে দল চুঁচুড়ায় মৃণালিনী অভিনয় করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সে অভিনয় দেখেও ছিলেন।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী একবার ন্যাশনাল থিয়েটারে দুর্গেশনন্দিনীর ইংরাজি অভিনয়ও করেছিলেন।

থিয়েটারের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, দেবী চৌধুরাণী, রাজসিংহ, কৃষ্ণকান্তের উইল, প্রভৃতিও ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ম্যাডাম থিয়েটারই প্রথম কৃষ্ণকান্তের উইলের সিনেমা করে। তখন ছিল সিনেমায় নির্বাক ছবির যুগ। সেই নির্বাক ছবির যুগেই ম্যাডাম থিয়েটার বঙ্কিমচন্দ্রের আরও অনেকগুলি বইয়ের সিনেমা করে। অরোরা ফিল্ম সেই নির্বাক ছবির যুগে করেছিল চন্দ্রশেখর। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সবাক ছবিব যুগ এলে আবার নানা প্রতিষ্ঠান বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন বইয়ের চিত্ররূপ দেয়।

এখন এই 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থ প্রকাশের সময়ও (জুন, ১৯৮১) দেখছি, কলকাতার কয়েকটি সিনেমা গৃহে এবং কলকাতার বাইরেও অনেকগুলি সিনেমা গৃহে বঙ্কিমচন্দ্রের 'স্বর্ণ গোলকে'র সিনেমা চলছে।

বেতারে এবং টি, ভি, তেও বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের নাট্যরূপ হয়ে থাকে।

কয়েকটি টুকরো ঘটনা

কয়েকটি টুকরো ঘটনা আগে আমার 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে দিয়েছি। সে সব ঘটনা এখানে আর দিলাম না। এখানে অন্য কয়েকটি টুকরো ঘটনা দিচ্ছি—

গোরা সেনার সামনে

সিপাহী বিদ্রোহের সময় অনেক জায়গার মত হুগলীর চুঁচুড়ায়ও সামরিক আইন জারি হয়েছিল। এই নিয়ে তখন চুঁচুড়ায় একদল সৈন্যও থাকত।

সেই সময়কার একটা দিনের ঘটনা। সেদিন রাত্রে চুঁচুড়ার এক বিখ্যাত ধনীর বাড়িতে থিয়েটারের অভিনয় ছিল। ঐ ধনী ব্যক্তির দ্বারা অভিনয় দেখার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যার আগেই ছোটভাই পূর্ণচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে চুঁচুড়ার ঘাটে গিয়ে পৌছান।

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন ১৯, পূর্ণর ১৫। দু ভাই গঙ্গাব তীরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আগে, পূর্ণ পিছনে। খানিকটা গিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র দেখতে পেলেন, কয়েকজন গোরা সৈনিক পথের ধারে ঘাসের উপব বসে আছে। তাদের সঙ্গে একটা কুকুরও আছে।

এমন সময় কুকুরটা হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করতে করতে পূর্ণর দিকে ছুটে গেল। একজন গোরা মজা করবার জন্য মুখে শব্দ করে কুকুরটাকে লেলিয়েও দিল।

পূর্ণ ভয়ে পাশেই একটা উঁচু জায়গা ছিল, তার উপর উঠে পড়ল। কুকুরটাও সেই উঁচু জায়গাটায় উঠবার জন্য লাফাতে লাগল।

বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ রাগে ক্ষেপে গিয়ে সাহেবদের বললেন—Fine sport indeed. Don't you feel ashamed ?

তখন সাহেবরা লজ্জিত হয়ে তাদের কুকুরটাকে ডেকে নিল।

এরপর দু ভাইয়ে নিরাপদে পথ চলতে লাগলেন।

সেদিন থিয়েটার ভাঙ্গতে অনেকটা রাত হয়ে যায়। কাঁটালপাড়া থেকে আরও যাঁরা ঐ থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন, সকলে দল বেঁধে একত্রেই বাড়ি ফিরছিলেন।

চুঁচুড়ায় তখন যে সামরিক আইন জারি হয়েছিল, তাতে এও বলা ছিল যে, রাত্রি ৯টার পর পথে কোন লোককে দেখলে গোরা সৈন্য তাকে গুলি করে মারতে পারে।

এঁরা দল বেঁধে ফিরছেন, এমন সময় একজন গোরা, দলের মধ্যে যিনি আগে ছিলেন, তাঁর বুকের কাছে বন্দুকটা উঁচিয়ে এসে দাঁড়াল। আর একজন গোরা বন্দুক হাতে নিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াল।

গোরা দু জনকে দেখে দলের সামনের সকলেই অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দলের পিছনের দিকে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি সামনে এসে গোরাকে বললেন—আমরা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। থিয়েটার ভাঙ্গতে রাত হয়ে যাওয়ায়, আমরা নিরুপায় হয়েই পথে বেরিয়েছি।

গোরা বললে—How am I to know?

উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—You may ask the District Magistrate. He was present there.

তখন গোরা বলল—I believe you. Take yourselves off at once.

পথে গোরাদের ঝামেলা থেকে উদ্ধার পেয়ে সকলে গঙ্গার ঘাটে এসে দেখলেন, সেখানে আর এক বিপদ। ওপারে যে যাবে, ঘাটে কোন নৌকাই নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন সকলকে নিয়ে পাশেই কলেজের ঘাটে গেলেন। সেখানে গিয়েও দেখলেন—নৌকা নেই।

তবে পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় বঙ্কিমচন্দ্র দেখতে পেলেন, অদূরে গঙ্গার চড়ায় দুটো নৌকা বাঁধা আছে।

এখন চীৎকার করে মাঝিদের ডাকতে হবে। কিন্তু গোরার ভয়ে কেউই চেঁচিয়ে মাঝিদের ডাকতে সাহস করল না। তখন বঙ্কিমচন্দ্রই চীৎকার করে মাঝিদের ডেকে তাদের নৌকায় সকলকে নিয়ে নিরাপদে কাঁটালপাড়ায় ফিরে এলেন।

এপারে এসে দলের সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহসের প্রশংসা করতে করতে যে যার বাড়ি গেলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও ছোট ভাই পূর্ণকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

অনুশোচনা

চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে ষণ্ডেশ্বরতলায় (স্থানীয় শিবের নাম ষণ্ডেশ্বর) প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির দিন বেশ বড় মেলা হয়। মেলায় আশ-পাশের লোকজন ছাড়া, গঙ্গার অপর পারে কাঁটালপাড়া, ভাটপাড়া থেকেও লোক আসে।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। সেই সময় একবার মেলার দিন সন্ধ্যার আগে মেলা তদারক করতে এসে গঙ্গার ধারে গিয়ে দেখেন—এক মাঝি তার নৌকায় এত বেশী যাত্রী বোঝাই করেছে যে, নৌকা প্রায় ডুবু ডুবু হয়ে এসেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তীর থেকে মাঝিকে বললেন—কিছু যাত্রী নামিয়ে দাও।

যাত্রীরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়। তাই কেউই নামতে চাইল না। মাঝিও পয়সার লোভে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাটা যেন শুনতে পায় নি, এমন ভাব দেখিয়ে তখনি নৌকা ছেড়ে দিল। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই নৌকায় জল উঠে নৌকা গেল ডুবে।

বঙ্কিমচন্দ্র তখনই মাঝিকে পুলিশের হাতে দিলেন।

যথা সময়ে পুলিশ মামলা রুজু করল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মাঝির বিচার হয়। বিচারে তার তিন মাস কারাদণ্ড হয়েছিল।

মাঝি জেলে থাকাকালেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যায়।

তার বাড়ি ছিল কাঁটালপাড়া ও ভাটপাড়ার মাঝে মালাপাড়ায়। তার ছেলে ছিল না। দুই মেয়ে। আগেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

জেলে মাঝির মৃত্যুর দু এক দিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্র ঐ মৃত্যু সংবাদ পান। এই সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন।

মাঝির বিধবা স্ত্রী যতদিন বেঁচেছিল, তার সংসার চলার মত একটা বৃত্তি বরাবর তাকে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে ছিলেন।

মৃণাল

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মৃণালিনী' উপন্যাসে একটি গানে লিখেছেন—কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে।

একবার এক ব্যক্তি এই লাইটির কথা উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন

—এটা আপনি কেমন করে লিখলেন? মৃণালে কণ্টক নাই। পদ্মের ডাঁটাকে মৃণাল বলে না, 'নাল' বলে। মৃণাল মাটির ভিতর থাকে। হাতীতে সেটা সাদরে খায়।

শুনে বঙ্কিমচন্দ্র মৃদু হেসে তাঁকে বলেছিলেন—মৃণালে কাঁটা থাক, আর নাই থাক; আর সেটা কাদাতেই থাক বা হাতীতেই আহার করুক, আমি মৃণালই বলবো। গানের সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারব না। লোকেও বোঝে আমি কোন্ অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করেছি।

লোকটি বললেন—তবে আপনার মত অপরেও কি ভুল লিখবে?

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—দোষ কি? দাশু রায় গেয়েছেন—

ষড়রিপু হ'লো কোদণ্ড স্বরূপ।
পূণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ।

তাতে তাঁর কি এসে গেছে।

এরপর লোকটি আর কোন উত্তর করলেন না।

পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগরও একদিন মৃণালে কাঁটা থাকে না, থাকে নালে—এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিদ্যাসাগরের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন।

তবুও বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী'র পরবর্তী সংস্করণে এ কথার কিছুই পরিবর্তন করেন নি।

আজকাল বাংলা অভিধানে মৃণাল আর নালে কিন্তু কোন পার্থক্য দেখা যায় না। মৃণাল মানে নাল, আবার নাল মানেও মৃণাল লেখা রয়েছে।

নূতন লেখকের প্রতি উপদেশ

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা নীলাব্জকুমারীর বিয়ে দেন উত্তরপাড়ার জমিদার সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র একবার দ্বিতীয়া কন্যার বাড়ি থেকে ফেরবার সময় ট্রেন ফেল করে বালী রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে পায়চারি করছিলেন।

সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন যুবক। সেই সবে লিখতে আরম্ভ করেছেন।

কেদারবাবুর বাড়ি বালীর অদূরে এড়িয়াদহে। ঘটনা ক্রমে কেদারবাবু ঐদিন বালী স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

কেদারবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হবার লোভ সংবরণ করতে

পারলেন না। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে, নিজের কিছুটা পরিচয় দিযে সাহিত্য-রচনা সম্বন্ধে উপদেশ চাইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন উপদেশ হিসাবে কেদারবাবুকে বললেন—ও ইচ্ছা যদি থাকে, খুব পড়, পুঁজি বাড়াও। এরপর বিতরণ সহজ হবে। Spectator পড়েছ কি? এডিসন, স্টিল, সুইফ্‌ট এঁদের লেখা দেখো। ভাল কোরে দেখো। সত্যকার জীবন দেখা চাই। যা জানো বোঝো, তাই লিখো। লেখা বাড়াবার জন্যে ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে লিখো না।···এক কাজ ক'রো, নিজের গ্রামের আর আশ-পাশের পরিচয়, গল্প হোক্‌, কাহিনী হোক্‌ যতটা পার সংগ্রহ ক'রে লেখবার চেষ্টা ক'রো। আগে সেইটা করো দিকি· দুর্বোধ্য ভাষায় লিখতে যেও না। বৃথা শ্রম হবে। নিজের উদ্দেশ্যই নষ্ট হবে, কাজে লাগবে না।·· স্টাইল? স্টাইল শেখাতে হয় না। যা নিজের হয়ে দেখা দেবে, তাই তোমার স্টাইল। অন্যের মত করে লিখতে যেওনা, তাতে দুকূল যাবে—আমাদের সাহেব হবার মত।· ভাল শোনাবে ব'লে বেশী বিশেষণ ব্যবহার করো না। ঠিক বাছাই চাই। একটিই যথেষ্ট।

রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হিসাবে হাওড়া থেকে কলকাতায় বদলি হযে আসেন। কলকাতায় এসে তিনি ৯২নং বৌবাজার ষ্ট্রিটে (বর্তমান নাম বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট) থাকতেন। তখন তাঁর বাসায একরূপ প্রতিদিনই সন্ধ্যায সাহিত্যিক বৈঠক বসত। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র এঁরা নিয়মিত ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথও সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আসতেন। ঐ সময় থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় হয়।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র মিঃ ব্লাইদকে অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর হন। সেদিন ছিল ১১ই মাঘ। ঐ দিন ব্রাহ্মদের একটা উৎসবের দিন। তাই সেদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ এসে তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে যান।

এর কিছু দিন পরেই বাংলাদেশের তৎকালীন প্রায় সকল সাহিত্যিককে নিয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে একটি সাহিত্যিক সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। এই সংস্থার নাম ছিল—কলিকাতা সারস্বত সমাজ। এই সংস্থার অন্যতম সহযোগী সভাপতি ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যতর সম্পাদক ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ।

সারস্বত সমাজেব প্রথম অধিবেশন হয় ১২৮৯ সালের ২রা শ্রাবণ। এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন কিনা জানা যায় না। এই সভার কিছুদিন আগে (১২৮৮) রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা-সঙ্গীত পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এর আগে তিনি জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর বাড়িতে বিদ্বজ্জন সমাগম সভায় রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতি-নাট্যের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সারস্বত সমাজের অধিবেশনের পরে ১২৮৯ সালের শ্রাবণ মাসেই রমেশ-চন্দ্র দত্তর জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলার সঙ্গে ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসুর বিবাহ হয়। সেই বিবাহ সভায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বিবাহ সভায় রমেশবাবু একগাছি মালা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের গলায় পরাতে এলে, বঙ্কিম-চন্দ্র সেই মালাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গলায় পবিয়ে দিয়ে, এ মালা এঁরই প্রাপ্য বলে তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে এই ঘটনায় উল্লেখ করে লিখেছেন—'একদিন আমার প্রথম বয়সে কোনও নিমন্ত্রণ সভায় তিনি নিজ কণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়া ছিলেন। সেই আমার জীবনের সাহিত্য-চর্চার প্রথম গৌরবের দিন।· তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ জীবনে প্রত্যাশা করিতে পারিব না।'

চরিত্রের কয়েকটি দিক

সঙ্গীতজ্ঞ

'বন্দেমাতরম্' প্রসঙ্গে আগে ১৪২ পৃষ্ঠায় বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় যদু ভট্টর কাছে গান শিখতেন। শচীশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র গান শেখার সময় এই যদু ভট্টকে মাসে ৭০ টাকা করে বেতন হিসাবে দিতেন।

তিনি আরও লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন না বটে, তবে তান লয় সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। একবার তিনি কলকাতার এক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে তাঁর 'মৃণালিনী'র অভিনয় দেখতে গিয়ে গিরিজায়ার মুখে 'বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে, বহুত পিয়াসা-রে' গানটি বেসুরো শুনে বিরক্ত হয়ে চলে এসেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সঙ্গীত বোদ্ধা ছিলেন, তা তাঁর মৃণালিনী ও আনন্দমঠে নিজের রচিত গানগুলি থেকে এবং তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সঙ্গীত' প্রবন্ধটি থেকেও জানা বোঝা যায়।

চিকিৎসক

শচীশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখেছেন—আলিপুরে চাকরি করার সময় বঙ্কিমচন্দ্র মেডিকেল কলেজে কিছুকাল শরীরতত্ত্ব বা এনাটমি পড়েছিলেন বলে শুনেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে মেডিকেল কলেজে শরীরতত্ত্ব পড়েছিলেন, শচীশবাবুর এই শোনা কথা কি বিশ্বাস যোগ্য? যাই হোক, তবে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়িতে নিজে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার বই পড়ে, ভালই হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেন। তাঁর এই চিকিৎসার কথা, তাঁর নিজের লেখা কয়েকটি চিঠি থেকেই আমার 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে আগে দেখিয়েছি।

জ্যোতিষী

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম উপন্যাসগুলি

পড়লে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষ গণনা ও কুষ্ঠি ঠিকুজীতে খুবই বিশ্বাসী ছিলেন।

শচীশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষ চর্চা সম্বন্ধে লিখেছেন—কলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী ক্ষেত্রমোহনের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুদিন জ্যোতিষ শিক্ষা করেছিলেন। আর আরব্য দেশীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র শিখবার জন্য এক মৌলভীর কাছে আরবী ভাষাও শিখেছিলেন। (এই আরবী পড়ার প্রসঙ্গেই শচীশবাবু লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র ফাদার লাফোঁর কাছে কিছুদিন ল্যাটিনও পড়েছিলেন)।

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ দিকে কিন্তু জ্যোতিষ গণনা ও কুষ্ঠি ঠিকুজীর উপর আস্থা হারিয়ে ছিলেন। তিনি নিজে তো বটেই, তাছাড়া ভাল গণককারকে দিয়ে গণিয়ে ও কুষ্ঠি ঠিকুজী মিলিযে ছোট মেয়েব বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বিবাহই তাঁর কন্যার কাল হযেছিল। এ সম্পর্কে আমার 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে ৯৯-১০৭ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ভাবে বলেছি।

কন্যার মৃত্যু হয়েছিল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে, তাঁর শেষ উপন্যাস সীতাবাম বেবোবার পরে।

কন্যার মৃত্যুর পরই বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষের উপর আব আস্থা রাখতে পারেন নি।

পরিহাস প্রিয়

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত রাশভারী ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর বন্ধুর সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ হলেও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টাতেও যোগ দিতেন। তাঁর পরিহাস রসিকতার কথা 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে কিছু বলেছি। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়, সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক হতেন। তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বড়দা শ্যামাচরণের পুত্র শচীশচন্দ্রের শ্বশুর। দামোদরবাবু প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যেতেন। তখন দুই বৈবাহিকে মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টাও হ'ত।

দামোদরবাবু একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের বসবার ঘরে ঢালা ফরাসের উপর বসে আছেন। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র তো আছেনই, তাছাড়া আরও কয়েকজন বন্ধু আছেন। ঘরের বাইরে দরজার কাছে সকলের জুতো খোলা আছে। বঙ্কিম-চন্দ্রের শুঁড়তোলা তালতলার চটি জোড়াটাও সেখানে আছে।

সকলেই বসে নানা গল্প করছেন। এমন সময় দামোদরবাবু ঘরের বাইরে দরজার কাছে যেখানে সকলের জুতো খোলা আছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন—পাশের কোথা থেকে কিভাবে খানিকটা জল গড়িয়ে আসছে এবং সেই জল গড়িয়ে এসে বঙ্কিমচন্দ্রের শুঁড়তোলা চটিতে ঠেকছে। এই দেখেই দামোদরবাবু সেই দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করেই রসিকতা করে বলে উঠলেন—বঙ্কিম চট্টো ভেসে গেল বে! বঙ্কিম চট্টো ভেসে গেল!

বঙ্কিমচন্দ্র বাইরের দিকে তাকিয়েই বৈবাহিকের রসিকতাটা বুঝলেন। বুঝে সঙ্গে সঙ্গেই বৈবাহিকের কথার উত্তরে বললেন—দামোদব মুখো হয়ে বুঝি? (বলাবাহুল্য, এখানে দামোদর অর্থে দামোদর নদ)

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শুনে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন। এমন কি দামোদরবাবুও।

অলৌকিকে বিশ্বাসী

বঙ্কিমচন্দ্র অলৌকিকে, দৈবে, এমন কি ভূতেও বিশ্বাস করতেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারেব সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একবারের কথাবার্তা থেকে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র জলপড়া, 'তারকেশ্বরের মানৎ করা'তেও বিশ্বাস করতেন। তাঁর 'ইন্দিরা' উপন্যাস থেকে দেখা যায়, তিনি হয়ত 'বিদ্যাধরী'তেও বিশ্বাস করতেন। বিদ্যাধরীরা হ'ল এক রকমের দেবকন্যা, (বা মায়াবিনী)।

বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায তখন বর্ধমানের স্পেশাল সাব্-রেজিষ্ট্রার। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় মাঝে মাঝে সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে বর্ধমানে বেড়াতে যেতেন। তাছাড়া বর্ধমানে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকজন বন্ধুও বাস করতেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, দিগম্বব বিশ্বাস। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, দিগম্বরবাবু তখন সেখানে সাব-জজ ছিলেন। সেই সময়েই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র একবার বর্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে গিয়ে, দিগম্বরবাবুর বাড়িতে বেড়াতে যান। গিয়ে দেখেন যে, দিগম্বরবাবুর বাড়িতে কোথা থেকে এক কিম্ভূতকিমাকার ব্রাহ্মণ এসেছে। সেই ব্রাহ্মণটি ইট, পাথর প্রভৃতি গিলে ফেলে, আবার সেগুলো মুখ দিয়ে বার করে দেয়। পাঁচ টাকা দিলেই, সে ঐ রকম খেলা দেখায়।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, কয়েকজন মিলে সেই ব্রাহ্মণটিকে একটি ঘরের ভিতরে

নিয়ে গিয়ে একটা টেবিলের সঙ্গে বেশ করে বেঁধে দিল। কিন্তু দেখা গেল, অল্পক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণটি বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

এই দেখে বঙ্কিমচন্দ্রও কৌতূহলী হলেন। তিনিও চুপ করে থাকতে পারলেন না। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এবার তিনি নিজেই ব্রাহ্মণটিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে তাকে বেশ করে বেঁধে দিলেন, এবং তার দু হাতে দু মুঠো ময়দা দিয়ে দিলেন। ভাবলেন, নিজে খুলবার চেষ্টা করলে, ময়দা হাত থেকে পড়ে যাবে। কিন্তু হাতের মুঠোর ময়দা যেমন তেমনি রইল, অথচ ব্রাহ্মণ ঠিকই বেরিয়ে এল। দেখে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্যান্বিত হলেন।

ব্রাহ্মণকে টাকা দিলে তখনই তা পেটের মধ্যে রেখে দিত। আবার বললেই বার করত।

বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচটা টাকা চিহ্নিত করে তাকে দিলেন। দেওয়া মাত্রই সে সেগুলো উদরস্থ করল। তারপর হাসতে হাসতে বললে—এবার আপনার মার্কা করা টাকা আপনাকে দেখাতে হবে, না?

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—হ্যাঁ।

ব্রাহ্মণ বললে—ভাল, কিন্তু আমি বলি সব ক'টা বার করা অপেক্ষা কোন্ চিহ্নের টাকাটা আগে বার করব বলুন।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—তবে থাক, বলে উঠে পড়লেন।

আর এক দিনের কথা। সেদিন দিগম্বর বিশ্বাসের বাড়িতে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার অতিথি। বঙ্কিমচন্দ্রও সেদিন বর্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে গিয়ে দিগম্বরবাবুর বাড়িতে বেড়াতে গেছেন।

ঐ সময় বর্ধমানে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে টাকা ওড়ানো, মন্ত্র পড়ে সন্দেশ আনা প্রভৃতি খেলা দেখাতো। দিগম্বরবাবুর বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল। ঐদিন সে দিগম্বরবাবুর বাড়িতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও ডাঃ সরকার এসেছেন শুনেই, একটু খেলা দেখাবার ইচ্ছা করল।

এই সময় দিগম্বরবাবুর পুত্র তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন—ঐ ব্রাহ্মণ টাকা ওড়াতে এবং মন্ত্র পড়ে সন্দেশ আনতেও পারে।

শুনে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—টাকা ওড়ানো ফাঁকির বিদ্যা জানি, কিন্তু সন্দেশ আনবে কি করে?

ব্রাহ্মণ বললে—কি করে তা বলব না, তবে এনে দেখাবো।

ব্রাহ্মণ সেদিন তার সে খেলা দেখালো। সন্ধ্যার সময় সভার মধ্যে মন্ত্রাদি পাঠ করে একটা থালা রাখল এবং তার উপর অঞ্জলিবদ্ধ করে কি সব বলতে লাগল। আর অমনি থালায় উপর থেকে টপ্‌টপ্‌ করে সন্দেশ পড়তে লাগল। এইভাবে সে প্রায় দু সের সন্দেশ আনল। বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মিত হলেন। তিনিই সর্বপ্রথম একটি সন্দেশ ভেঙ্গে দেখলেন; কিন্তু খেলেন না।

দিগম্বরবাবুর পুত্ররা কিন্তু কয়েকটা সন্দেশ খেলেন।

এইসব দেখে বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন—আমি দৈবে ও প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করি। ওসব কিছু বোঝা যায় না। কি থেকে কি হয়, তা বলা কঠিন।

তিনি আরও বলেছিলেন—এমন অনেক ঘটনা আমি দেখেছি, যা লোকের কাছে বলাও ঠিক নয়, অবিশ্বাস করাও ঠিক নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ভূতপ্রেতে রীতিমতই বিশ্বাসী ছিলেন। আর শুধু বিশ্বাসীই নয়, তাঁর জীবনে দু দুবার দুটি ভৌতিক ঘটনাও ঘটেছিল। সে দুটি এই—

১। বঙ্কিমচন্দ্র তখন মেদিনীপুর জেলায় নেগুয়া (বর্তমান কাঁথী) মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই সময় তিনি কার্যোপলক্ষে একদিন ঐ মহকুমার এক জায়গায় যান। সেখানে রাত্রে তিনি যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়িতে নাকি এক প্রেতিনী দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। তাঁর এই ভৌতিক অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি তাঁর দৌহিত্রদের কাছে অনেকবার বলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনীটি লিখে ছাপিয়ে ছিলেন।

২। বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর পূর্বে কয়েকদিন ধরে তাঁর মৃতা প্রথমা স্ত্রীকে দেখতে পেতেন। একথা তিনি সজ্ঞানেই তাঁর তখনকার শুশ্রূষাকারীদের বলেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র একবার 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী' নামে ভূত নিয়ে একটি রচনাও লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। শোনা যায়, এটি নাকি বিদ্যাসাগর মশায়ের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য লিখছিলেন। কিছুটা লিখেই তিনি মৃত্যু শয্যা গ্রহণ করেন। ফলে লেখাটি আর সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। এই লেখাটির মূলে ছিল নাকি পূর্বোক্ত নেগুয়া মহকুমার প্রেতিনী দর্শনের অভিজ্ঞতা। পরে এই পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেলে, চিত্তরঞ্জন দাস (পরে দেশবন্ধু) তাঁর 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে 'বঙ্কিম সংখ্যায়' এই পাণ্ডুলিপিটির প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছিলেন।

শেষ জীবন ও মৃত্যু

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ৩৩ বছর চাকরি জীবনের শেষ ৩ বছর আলিপুরে ছিলেন। এই সময় তিনি কলকাতায় নিজের বাড়ি থেকে কোর্টে যাতায়াত করতেন। এর আগে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে কলকাতায় মেডিকেল কলেজের পূর্ব দিকে ৫নং প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে এই বাড়িটি তিনি কিনেছিলেন। বাড়িটি ছিল দু তলা, তিনি কিনে দু তলার উপর ঘর তুলে এটিকে তিন তলা করেছিলেন।

বাড়ি কেনার পর কর্মসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতার বাইরে বাইরে থাকলেও এই বাড়িতে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা, জ্যেষ্ঠ জামাতা ও দৌহিত্রেরা থাকতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার পুত্রদের নিয়ে খুবই আনন্দে কাটাতেন। তার একটা ঘোড়ার গাড়ী ছিল। তিনি প্রতিদিন বিকালে সেই গাড়ীতে করে নাতিদের নিয়ে গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চাকরি থেকে অবসর নেন ১৮৯১ এর ১৪ই সেপ্টেম্বর। চাকরি থেকে অবসর নেবার সময় তিনি ভেবে ছিলেন—অবসর জীবনে খুব লিখবেন; কিন্তু এই সময় তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ায় তেমন কিছুই লিখতে পারেন নি। সঞ্জীবচন্দ্রের একটা জীবনী, বৈদিক সাহিত্যের উপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য একটা ইংরাজি প্রবন্ধ প্রভৃতি এই ধরণের কয়েকটা ছোটখাট লেখাই লিখতে পেরেছিলেন। তবে এই সময় তাঁর কয়েকটা বইয়ের পুনর্মুদ্রণকালে সেই সব বইয়ে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ইত্যাদি করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে তখনকার শিক্ষিত ও ইংরাজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অনেকেই সুরাপান করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও মধ্যবয়সে কিছুদিন সুরাপান ধরেছিলেন। পরে ছেড়ে দেন। শেষ জীবনে তিনি কিছুদিন মাছ মাংস খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন তিনি হবিষ্যান্ন আহার করতেন। শেষ বয়সে নামাবলী গায়ে দিতেন, শুদ্ধাচারে থাকতেন ও সর্বদা গীতা আবৃত্তি করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার আগেই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে

মে একটা উইল করেছিলেন। সেই উইলের প্রধান প্রধান অংশগুলো এই—
লিখিতং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁটালপাড়া.........

১। আমার মৃত্যুর পর আমার যে কিছু স্থাবর, অস্থাবর, পুস্তকের কপি-রাইট বা অপর যে কিছু সম্পত্তি আছে বা থাকিবে, তাহাতে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইবেন। এবং তাহাতে দান বিক্রয় হস্তান্তর করার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। এবং ঐ সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি নিজে উইল করিতে পারিবেন।

২। কেবল এই সকল সম্পত্তির মধ্যে শহর কলিকাতা পটলডাঙ্গার অন্তর্গত প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলিতে ৫ নম্বরের যে খরিদা জমি আছে, তাহা আমার উক্ত বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী দান-বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। বা তৎসম্বন্ধে উইল করিতে পারিবেন না। তাহার মৃত্যুর পর ঐ ৫ নম্বরের বাটী ও ৪ নম্বরের ভূমি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার উহাতে দান-বিক্রয় বা অন্য প্রকার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। যদি আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যুকালে আমার জেষ্ঠা কন্যা (ঈশ্বর না করুন) বিদ্যমান না থাকেন, তবে উক্ত ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি শরৎকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাপ্ত হইবেন।

৩। যদি আমার মৃত্যুর পর কোন সময়ে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী বিবেচনা করেন যে, উক্ত ৫ নম্বরের বাটী ও ৪ নম্বরের ভূমি বিক্রয় করা আবশ্যক, তবে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর লিখিত সম্মতি লইয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন, নচেৎ পারিবেন না। ঈশ্বর না করুন ঐ সময়ে যদি শরৎকুমারী দেবী বিদ্যমান না থাকেন, তবে শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী আপন স্বেচ্ছাক্রমে ঐ ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি বিক্রয় করিতে পারিবেন। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিতে হইবে না।

চাকরি থেকে অবসর নেবার পরই বঙ্কিমচন্দ্র অল্প-স্বল্প বহুমূত্র রোগে ভুগতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র, ভ্রাতুষ্পুত্র (সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র) জ্যোতিশচন্দ্র প্রভৃতি লিখেছেন—বঙ্কিমের মৃত্যুর ক'মাস আগে তাঁর পিতার তিব্বতের গুরুদেব এক সাধুকে বঙ্কিমের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সাধু এসে, বঙ্কিমের মৃত্যু যে আসন্ন, এ কথা তাকে জানিয়ে গিয়েছিলেন।

১৮৯৪ এর প্রথম দিকে শীতকালে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমূত্র রোগ হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ও'ব্রায়েন সাহেব এবং শেষে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর চিকিৎসা করেন। কিন্তু কিছু সুবিধা হল না। ২৫শে চৈত্র পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান থাকলেও, তাঁর বাক্‌বোধ হয়ে যায়। পরদিন ২৬শে চৈত্র ১৩০০ সাল, (ইং ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪) রবিবার বেলা ৩টা ২৩ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর শয্যা পার্শ্বে ছিলেন—স্ত্রী, জ্যেষ্ঠা কন্যা, ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পক্ষণ পরেই এই দুঃসংবাদ জানতে পারেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। তিনি তখনই তাঁব ছাপাখানায় বড় বড় অক্ষরে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদটা ছাপিয়ে লোক দিয়ে কয়েক হাজার ঐ শ্লিপের মত কাগজ কলকাতাময় প্রচার করে দেন। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য দলে দলে লোক তাঁর ৫নং প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনের বাড়িতে আসতে থাকে। সন্ধ্যার আগে বাড়ি থেকে শবযাত্রা বেরোবার পূর্বেই অগণিত লোক এসে যায়। এরা প্রায় সকলেই শবযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে। পথেও আরও বহু লোক শবযাত্রায় যোগ দেয়।

নিমতলার মহাশ্মশানে বঙ্কিমচন্দ্রের দেহ ভস্মীভূত হয়। মুখাগ্নি করেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) কৃষ্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর বহু বৎসর রাজলক্ষ্মী দেবী জীবিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব মৃত্যুর ২৬ বছর পরে ১৩২৬ সালের ১০ই ভাদ্র তাঁর মৃত্যু হয়।

বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতি-কথায়

এই বইয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ মজুমদার, কালীনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্মৃতি-কথা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা উদ্ধৃত করেছি। আমার 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়েও রমেশচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীশ মজুমদার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির বঙ্কিম-বিষয়ক স্মৃতি-কথা বলেছি। এখানে এবার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের বঙ্কিম-বিষয়ক স্মৃতিচারণ থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি—

বিদ্যাসাগরের জীবনী লেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহ-ভাজন ছিলেন। সুরেশ সমাজপতির 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' বইয়ে চণ্ডীবাবু এক প্রবন্ধে তাঁর বঙ্কিম-স্মৃতি লিখে গেছেন। তা থেকে কিছু এখানে বলছি—

পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মশায় তখন হিন্দুধর্ম নিয়ে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গলা সেরে শেষে তিনি কলকাতায় এলেন।

কলকাতায় এলবার্ট হলে তিনি উপরি উপরি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তর্কচূড়ামণির প্রথম দিনের সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতিত্ব করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তর্কচূড়ামণির প্রথম দু' তিন দিনের সভায় উপস্থিত থেকে, তারপর আর যান নি।

চণ্ডীচরণবাবু তর্কচূড়ামণির সব ক'টি বক্তৃতাই শুনেছিলেন। চণ্ডীচরণবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে তর্কচূড়ামণির প্রথম ক' দিনের সভার পর আর উপস্থিত না দেখে, কেন আসছেন না, তার কারণ জানবার জন্য বড় কৌতূহলী হলেন।

তাই তিনি একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রসঙ্গক্রমে তর্কচূড়ামণির বক্তৃতার কথা তুললেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন—ক'দিন তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোক নেচে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে পারে; কিন্তু ওতে কোন স্থায়ী ফল হতে পারে না। মালা, তিলক, ফোঁটা ও শিখা রাখায় যে ধর্ম টেকে, আর ঐ গুলির অভাবে যে ধর্ম লোপ পায়, সে ধর্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত

নয়। তর্কচূড়ামণি মশায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝতে পারেন নি যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নতুন শিক্ষার ফলে, দেশ এখন ও অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়। কি হলে এ দেশের সমাজ-ধর্ম এখন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নেই। তাই যা খুশি তাই বলে লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র সভা সমিতিতে বড় একটা যেতেন না। তার কারণ তিনি তেমন বক্তৃতা করতে পারতেন না। তবে যে সব জায়গায় তিনি এড়াতে পারতেন না, সে সব সভায় বাধ্য হয়েই যেতেন।

রাজকায থেকে অবসর গ্রহণ করার অল্প কয়েক দিন পরে ঐরূপ একটা সভায় একবার তিনি সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। সে সভা হয়েছিল জেনারেল এসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশানের (বর্তমান নাম স্কটিস চার্চ কলেজ) হল ঘরে, আর তাতে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের নাম ছিল 'ভারতবাসী ও ইংরাজ'। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে সম্রাট আকবরের কিছু প্রশংসা করে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধ পাঠের সভায় চণ্ডীচরণবাবুও উপস্থিত ছিলেন। চণ্ডীচরণবাবু পরে একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দেখা করতে গিয়ে ঐ সভাব কথা উত্থাপন করলে, বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন সভায় আকবর সম্বন্ধে যে কথা বলে ছিলেন, তাঁকে সেই কথাগুলি বললেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব কথাগুলি ছিল এই—

আকববের নামে দেশের লোক এত নাচে কেন? তাঁর দ্বারা হিন্দু জাতির বক্ষা ও স্থিতি বিষয়ে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হয়েছে। সে কথা ছেড়ে দিলেও, তার উচ্চ উদার রাজনীতি জ্ঞানের মূলে বিজাতীয় স্বার্থপরতাই লুকিয়ে ছিল, দেখা যায়। তিনি সুবিধা মত বেছে বেছে রাজপুতনার ক্ষত্রিয় রাজ-কুমারীদের আপন অন্তঃপুরে গ্রহণ করে ছিলেন। এতে স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়, উদারতাব লেশমাত্র এতে খুঁজে পাওযা যায না। যদি দেখতে পাওয়া যেত যে, আকবর মোগল রাজকুমারীদের সঙ্গে ক্ষত্রিয রাজকুমারদের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তা' হলেও একদিন মনে করা যেত যে, তিনি সমদর্শী ছিলেন। সমাজ ও শাসন বিষয়ে আকবব স্বার্থপরতাপুষ্ট অসাধারণ শক্তি সামর্থ্যের পরিচালনায় কৃতকার্য হয়েছিলেন মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র কবি নবীন সেনকে এত স্নেহ করতেন যে, তাঁকে নাতি বলে

ডাকতেন। নবীন সেন তাঁর 'আমার জীবনে' বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে অনেক কথা লিখে গেছেন। আমার 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে প্রসঙ্গত সে সবের কিছু দিয়েছি। এখানে ঐ বই থেকে আরও কিছু বলছি—

নবীনচন্দ্র যখন রাণাঘাটের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সেই সময় তিনি একদিন কলকাতায় এসে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেদিন তাঁদের উভয়ের মধ্যে তৎকালীন বাঙ্গলা সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সে সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন—

'কলিকাতায় একদিন শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে একটু আন্তরিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার আদর অভ্যর্থনার কথা কি আর বলিব! তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলাপ হইল। সর্বশেষ সাপ্তাহিক প্রভুদের অপূর্ব সমালোচনা ও বিজ্ঞাপনের কল্যাণে বঙ্গ সাহিত্যের বর্তমান দুরবস্থার কথা উঠিল। আমি বলিলাম—আপনি বঙ্গ সাহিত্যের একমেটে সরস্বতীকে বটতলার ধূলাকাদা ও পূতিগন্ধ হইতে উদ্ধার করিয়া এবং দোমেটে করিয়া অমন শুভ্রবর্ণে ও বহুমূল্য আভরণে সজ্জিত করিয়া শতশোভাপূর্ণ সহস্রদলে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তাহায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন বঙ্গ সাহিত্য আবার সেই 'কি মজার শনিবার', 'হদ্দ মজার রবিবার' সাহিত্যের দিকে গড়াইতেছে। আপনি কেমন করিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া আছেন?

তিনি চিন্তাযুক্ত বিষণ্ণমুখে বলিলেন—নাতি! গড়াইতেছে, কেন গড়াইয়াছে বল। সত্যই আমরা যে বটতলা হইতে তুলিয়াছিলাম, বঙ্গ সাহিত্য আবার সেই বটতলায় গিয়াছে। কিন্তু কি করিব?

আমি বলিলাম—আপনি এখন জীবিত। আপনার মানসিক শক্তি ও প্রতিভা এখনও পূর্ণ প্রতিভান্বিত এবং বঙ্গ সাহিত্যে আপনার একাধিপত্য এখনও অপ্রতিহত। আপনি আবার বঙ্গদর্শনের পতাকা গ্রহণ করুন, আর আমরা আপনাকে বেষ্টন করিয়া সে পতাকার ছায়ায় দাঁড়াই। আপনি আমাকে একবার বলিয়াছিলেন, যদি আমরা সাহায্য করি, আপনি একখানি ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস বঙ্গদর্শনের মত খণ্ডশঃ মাসে মাসে লিখিবেন। আপনি নভেল ছাড়িয়া এ গুরুতর কার্যটিতে ব্রতী হোন। আপনি ভিন্ন উহা অন্য কাহারও দ্বারা হইবে না।

তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—তাহা পারি যদি তোমরাও কোমর

বাঁধিয়া দাঁড়াও। আমি এখন বুঝিতেছি যে, বঙ্গদর্শন বন্ধ করিয়া অন্যায় করিয়াছিলাম।...

আমি বিদায় হইবার সময় আবার বলিলেন—তুমি শীঘ্র আর একবার আসিও। তোমার ঐ জলন্ত উৎসাহ আমার বুড়া হাড়েও বিদ্যুৎ সঞ্চার করে, আর একবার সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব।

বঙ্গ সাহিত্যের সেই সুদিন আর হইল না।'

(এই আলোচনার কয়েকদিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্র অসুখে পড়েন এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।)

এখানে নবীনচন্দ্রের স্মৃতি-কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখার কথা আছে, সেকথা বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮০র ১৫ই জুলাই তারিখে চুঁচুড়া থেকে এক চিঠিতেও নবীনচন্দ্রকে লিখেছিলেন। ঐ চিঠিটা আমার 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ের ৮৯ পৃষ্ঠায় দিয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন ইতিহাস লেখার জন্য একটা খসড়া খাতায় এইভাবে বিষয় ভাগ করেছিলেন—

Character of the Ancient Hindus, Maritime power and habits, External commerce, Manners and customs (women and widow marriage), Dates of authors, Wealth of ancient India, Government, Military power, Arab expeditions, Arab Geographers, Historical and Miscellaneous.

শেষ পর্যন্ত এ বই আর লেখা হয়ে ওঠে নি।

সমালোচনার সম্মুখে

অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া, বঙ্গদর্শনে কারও বইয়ের নিরপেক্ষ ভাবে বিরূপ সমালোচনা করা প্রভৃতি কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর জীবিত কালে যে কিরূপ তীব্র আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমার 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বা চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বইয়ে ১৪৫-১৫৮ এবং ২৮২-২৮৪ পৃষ্ঠায় তার কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি। এখানে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলছি—

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বাউল শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী ছদ্মনামে ১২৮৭ সালে 'বঙ্গীয় সমালোচক' নামে একটা ছোট বই লিখেছিলেন। ঐ চটি বইয়ে দুটা ছবিও ছাপা হয়েছিল। প্রথম ছবিটা ছিল এইরূপ—একটা কাঁঠাল গাছ। তাতে কাঁঠাল ঝুলছে। সেই গাছের নীচে একটি বানর পতাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। পতাকায় লেখা—বঙ্গদর্শন। দ্বিতীয় ছবিটা ছিল—বানর কাঁঠাল খাচ্ছে, তার চারপাশে কাঁঠালের কোয়া ছড়ানো।

এই দুটা ছবিতেই বঙ্কিমকে বানর করা হয়েছে। আর কাটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম বলে, ছবিতে বঙ্কিমকে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য শুধু 'বঙ্গ-দর্শন' দিয়েই নয়, কাঁঠাল গাছও দেখানো হয়েছে। বইয়ে আবার ছবির 'বানরের রূপ বর্ণনা' প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন ব্যঙ্গ করে ছড়াও লিখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বেশ বিপদে পড়ে ছিলেন, বঙ্গদর্শনে বিদ্যাসাগর মশায়ের বহু বিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তক এর সমালোচনা করে। এর জন্য তখন তাঁকে অনেক আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল। যেমন, 'হালিশহর পত্রিকা' বঙ্কিমকে বেশ ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখেছিল। প্যারীমোহন কবিরত্নও এই নিয়ে 'গীতা-বলি' নামে একটা ছোট বই লিখে তাতে বঙ্কিমকে ছড়ায় আক্রমণ করেন।

ঐ সময় 'বসন্তক' মাসিক পত্রিকার ১ম বর্ষের ৮ম সংখ্যায়ও এই বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম প্রসঙ্গ নিয়ে একটা কার্টুন ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ ছবিটি ছিল—একটা বৃহৎ আকারের বৃষ দাঁড়িয়ে; বৃষের গায়ে লেখা 'বিদ্যাসাগর'। এর পাশেই ছোট একটা ঝোপের মধ্যে কতকগুলো ব্যাঙ বসে। ঐ ব্যাঙ-গুলোর মধ্যে একটা বেশ ফুলো ফুলো, তার আকারটা একটু বড়। সেই ব্যাঙটার গায়ে লেখা 'বঙ্গদর্শন'।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বিধবার দাঁতে মিশি' নামে একটা প্রহসনের বই প্রকাশিত হয়। এতে লেখক 'উড়ুম্বর' নামে একটি চরিত্র সৃষ্টি করে বঙ্কিমকে আক্রমণ করেন।

এঁদের এই সব আক্রমণ কেবল ব্যঙ্গ ও গালি গালাজ, তাই আলোচনার অযোগ্য। তবে অন্য দু একটা আক্রমণ আলোচনার যোগ্য। যেমন—

বঙ্কিম তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বন্দুকের গুলিতে রোহিনীর মৃত্যু ঘটানোয় বঙ্গদর্শনে এই অংশটা সেই প্রকাশের সময় থেকেই আজও অনেকে এজন্য বঙ্কিমের সমালোচনা করে আসছেন। সব চেয়ে বেশী অভিযোগ তুলেছেন বোধ করি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র। তিনি তাঁর 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধে লিখেছেন—'পাপের শাস্তি না হইলে গ্রন্থ শিক্ষাপ্রদ হইবে না, অতএব শাস্তি চাই-ই। এই চাই-ই-এর জন্য গ্রন্থকারকে যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে, সেইখানেই আমাদের বড় বাধা।'

শরৎচন্দ্র তাঁর 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধেও এই একই প্রশ্ন তুলেছেন।

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হ'ল এই—

গোবিন্দলাল একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশীয় গণ্যমান্য, সুস্থ, সামাজিক মানুষ। সে চিত্তের দুর্বলতায় অপরূপ সুন্দরী রোহিনীর রূপমুগ্ধ হলেও, এটাও সত্য যে, গুণবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করে বিধবা রোহিনীকে নিয়ে একত্র বাস করা যে অন্যায় আচরণ, এ কথা তার মনের কোণে সর্বদা না হলেও কখন উঁকি দিতই।

আরও একটা কথা, গোবিন্দলালের ন্যায় একজন সুস্থ সামাজিক মানুষ তার সমাজ, আত্মীয়স্বজন, সবকিছুই ত্যাগ করে প্রসাদপুরের নির্জন কুটীরে (পারতপক্ষে সেখানকারও সকলের সংস্পর্শ ত্যাগ করে) কেবল রোহিনীকে নিয়ে কখনই দীর্ঘদিন কাটাতে পারে না।

এমন অবস্থায় কিছুদিন পরেই রোহিনীর উপর থেকে গোবিন্দলালের মোহ কেটে গেল। তখন সে একদিকে তার রূপমোহের এই কৃতকর্মের জন্য মনে মনে অনুতাপ করতে, অপর দিকে পুনরায় ভ্রমরকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হতে লাগল। অথচ তখন তার অবস্থা এমন যে, ভ্রমরের কাছে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়, আবার রোহিনীকে ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও সে রোহিনীর কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্যই ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল।

গোবিন্দলাল যেমন রোহিনীর কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, রোহিনীও তেমনি তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে গোবিন্দলালের

কাছ থেকে মুক্তি পাবার কথা চিন্তা করে ছিল। এই কারণেই হয়ত রোহিনী নিশাকরকে দেখে এবং গোবিন্দলালের সঙ্গে নিশাকরের জমিপত্তনি লওয়া সংক্রান্ত কথাবার্তায় তাকে অবস্থাপন্ন লোক জেনে তার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিল। রোহিনী হয়ত ভেবেছিল, গোবিন্দলালের এই মানসিক অবস্থা অর্থাৎ তার প্রতি গোবিন্দলালের আন্তরিকতার অভাব, আরও বৃদ্ধি পেলে এবং সেই অবস্থায় গোবিন্দলাল তাকে ত্যাগ করলে, তখন তার অবস্থা কি হবে? সে হয়ত এই কারণেই আরও ভেবেছিল যে, এখন তার দেহে রূপযৌবন আছে, অতএব নিশাকরকে জয় করবার বা শিকার করবার চেষ্টা করবে নাই বা কেন?

রোহিনী যে কেবল ভোগবাসনার জন্যই নিশাকরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, ঠিক তা নয়। সে তার নিজের প্রতি গোবিন্দলালের আন্তরিক ভালবাসার অভাব অনুভব করে, তার নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই নিশাকরের সঙ্গে কথা-বার্তা বলবার চেষ্টা করেছিল।

তাই গোবিন্দলাল ও রোহিনী উভয়েই যখন নিজ নিজ জীবনের কঠিন সমস্যায় বিব্রত, সেই সময় রোহিনীর পক্ষে নিশাকরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খোঁজা এবং সেই অজুহাতেই গোবিন্দলাল কর্তৃক রোহিনীকে হত্যা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত তখনকার দিনের জমিদার শ্রেণীর লোকেরা যখন সামান্য কারণেই গুলি চালাতে অভ্যস্ত ছিল।

১৩৩৭ সালে শরৎচন্দ্রের ৫৫তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানায়। সভার উদ্যোক্তারা সেদিন সভায় রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করার মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের অসুবিধাবশত সভায় আসতে পারেন নি। তবে সভায় পড়বার জন্য একটা লিখিত বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ বাণীতে তিনি সংক্ষেপে বাংলা কথা সাহিত্যের ক্রম বিকাশের একটা ইতিহাস লিখেছিলেন। ঐ ইতিহাসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস সম্বন্ধেও দু একটা কথা বলেছিলেন।

কবির ঐ বাণীর ইংরাজি অনুবাদ সভার দিন ইংরাজি দৈনিক 'লিবার্টি' কাগজেও বেরিয়েছিল। শরৎচন্দ্র সভায় আসার আগে রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে ঐ মন্তব্য পড়ে, সভায় ঐ নিয়েই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন—

'কবি, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র উল্লেখ করে বলেছেন, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণ-কান্তের উইলের তুলনায় এর সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই। এর মূল্য স্বদেশ-

হিতৈষণায়, মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দশার বিবরণে, তার প্রতিকারের উপায় প্রচারে, তার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণে। অর্থাৎ আনন্দমঠে সাহিত্যিক বঙ্কিম-চন্দ্রের সিংহাসন জুড়ে বসেছে প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র।...

বঙ্কিমের ন্যায় অত বড় সাহিত্যিক প্রতিভা যিনি তখনকার দিনেও বাঙ্গলা ভাষার নবরূপ, নবকলেবর সৃষ্টি করতে পেরে ছিলেন, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল—বঙ্গ সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দুটি যিনি বাঙ্গালীকে দান করতে পেরে ছিলেন, কিসের জন্য তিনি পরিণত বয়সে কথা-সাহিত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে আবার আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম লিখতে গেলেন? কোন্ প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল? কারণ, একথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে স্বকীয় মত প্রচার তাঁর কাছে কঠিন ছিল না।'

এই তিনটি বইয়েই মূলত বঙ্কিম হিন্দুর ও হিন্দু আদর্শের কথা নিয়েই লিখে-ছিলেন। আনন্দমঠে ও সীতারামে তিনি হিন্দুকে প্রাধান্য দিয়ে লিখতে গিয়ে মুসলমান শাসক প্রভৃতি সম্পর্কে কিছু বিরুদ্ধ কথাও বলেছেন।

এজন্য বঙ্কিমের উপর মুসলমানদের অনেকেরই বেশ রাগ আছে।

আজও বঙ্কিমচন্দ্রকে সব চেয়ে বেশী সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, মুসল-মান লেখকদের হাতেই। এ নিয়ে এখানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করছি—

শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি 'বঙ্কিম-দুহিতা' নামে একটা বই লিখেছেন। এই বই সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন—এতে 'অনেক নোংরা কথা আছে।'

এরপর ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন-এর নাম করা যেতে পারে। এই আবুল হোসেনের লেখা সম্বন্ধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আনি-সুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)' গ্রন্থে লিখেছেন—'তাঁর (আবুল হোসেনের) সাহিত্য কর্মের আগাগোড়া রুচি বিকৃতির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দটি উপন্যাসের প্যারডি প্রকাশ করেছিলেন আবুল হোসেন। পরে সেগুলো একত্রে 'জ্ঞান ভাণ্ডার' (১৯২৭) নামে প্রচারিত হয়েছিল।...কাহিনীর রূপান্তরে আবুল হোসেন কুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, 'কপালকুণ্ডলা বা সখের সতীনে' নবকুমারকে পদ্মাবতীর গৃহে কাবাব রুটি খাইয়েছেন, শ্যামার মুসলমান প্রণয়ীর আমদানী করেছেন, পরিশেষে শ্যামা ও নবকুমার, পেশমন ও গৌরী সবাইকে হিন্দু থেকে মুসলমান করেছেন।...'

বঙ্কিম-বিরোধী আর একজন লেখক হলেন—ইসমাইল হোসেন শিরাজী। এঁর লেখা সম্বন্ধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর অধ্যাপক রশীদ আল ফারুকী তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন—'ইসমাইল হোসেন শিরাজী তুলনা-মূলকভাবে শক্তিশালী লেখক। ··তিনি ভাবের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধিতা করেছেন বটে, কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে পনের আনাই বঙ্কিমানুসারী।'

এইরূপ আরও কেউ কেউ বঙ্কিমের বিরুদ্ধে লিখেছেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, গোপাল মুখোপাধ্যায়, 'মধ্যস্থ'র লেখক প্রভৃতির ন্যায় ইদরিস আলি, আবুল হোসেন প্রভৃতির লেখাও কেবল রাগে বঙ্কিমের প্রতি কম বেশী পরিমাণের গালাগালি মাত্র। এ নিয়ে কোন আলোচনাই হতে পারে না। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ ও মুনীর চৌধুরী বঙ্কিম-সাহিত্যে মুসলমান প্রসঙ্গ নিয়ে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। এখন এই দুই বিজ্ঞ অধ্যাপকের লেখা থেকে কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি।

ডঃ শরীফের 'প্রত্যয় ও প্রত্যাশা' নামে নিজের লেখা প্রবন্ধ সংকলনের একটা বই আছে। তাতে 'বঙ্কিম-বীক্ষা: অন্য নিরিখে' নামে একটা প্রবন্ধ দিয়েছেন। অধ্যাপক রসীদ আল ফারুকীর সম্পাদিত বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ সংকলন 'আধুনিক সাহিত্যের রূপকার' গ্রন্থেও ডঃ শরীফের বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে অন্য আর একটি প্রবন্ধ আছে। বঙ্কিম সম্পর্কে ডঃ শরীফের বক্তব্য তাঁর ঐ দুটা প্রবন্ধ থেকেই নিয়েছি।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী তাঁর 'তুলনামূলক সমালোচনা' গ্রন্থে 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাস নিয়েও আলোচনা করেছেন। তা থেকেও কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করছি।

আগে অধ্যাপক চৌধুরীর লেখাটা নিয়ে আলোচনা করে, পরে ডঃ শরীফের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এঁর লেখাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে 'রাজসিংহ' থেকে, মুসলমানদের কাছে অপ্রিয় লাগে, এমন এগার জায়গার লেখা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি প্রথমেই উদ্ধৃত করেছেন, চঞ্চলকুমারী কর্তৃক তার বাঁ পা দিয়ে আওরঙ্গজেবের তসবিরে লাথি মারার ঘটনাটা। চৌধুরী সাহেবের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে এইটাই প্রধান।

এই প্রসঙ্গটা সম্বন্ধে অধ্যাপক চৌধুরী লিখেছেন—'রূপনগরের রাজকন্যা যে আওরঙ্গজেবের চিত্র পদদলিত করেছিল, সে কথা কোন ঐতিহাসিকের

পক্ষে লিখে রেখে যাওয়া সম্ভব ছিল না। টড, মনুচী, অর্মেরও তা অসাধ্য ছিল। এই অঘটন ঘটাবার পটুত্ব শিল্পী ছাড়া আর কার থাকতে পারে? তাছাড়া এই ঘটনার নজীর অতীত ইতিহাসে বিরল হলেও বঙ্কিমের সমকালে অবশ্যই কল্পনীয় ছিল। রূপনগরের রাজকন্যা ও আওরঙ্গজেব প্রতীক মাত্র। দলনের অভিপ্রায় নিয়ে পদত্তোলনের আগ্রহটা বাস্তব সত্যের অন্তর্ভুক্ত।'

আওরঙ্গজেবের তসবিরে চঞ্চলকুমারীর পদাঘাত প্রসঙ্গে ডঃ শরীফ লিখেছেন—'চঞ্চলকুমারীর আওরঙ্গজেবের তসবিরে পদাঘাত, আর মুসলিম গোঁয়ারের রাস্তা প্রতিরোধ (সীতারামে) মানুষের একই নীচ প্রবৃত্তির প্রকাশ। লক্ষ্যণীয়, চঞ্চলকুমারী আকবর, জাহাঙ্গীরের ছবির প্রতি শ্রদ্ধাশীলা। কাজেই এ জাতি বিদ্বেষ নয়, স্ব-কালীন শাসক বিদ্বেষ।'

বঙ্কিম লিখেছেন—চিত্রবিক্রেত্রী আকবর বাদশাহ, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও নুরজাহানের ছবি দেখালে চঞ্চলকুমারী হেসে হেসে সে সব ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল—'ইহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তসবির আছে।'

চঞ্চলকুমারী আকবর বাদশাহ প্রভৃতির প্রতি শুধু শ্রদ্ধাই নয়, আকবর রাজপুত রাজকন্যাদের সঙ্গে মোগল রাজকুমারদের যে বিবাহের প্রথা চালু করে গিয়েছিলেন, সেই সূত্রে আকবর প্রভৃতিকে কুটুম্ব বলেও সম্বোধন করেছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বঙ্কিম, চঞ্চলকুমারীকে আকবর প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলা দেখিয়েও কেবল আওরঙ্গজেবের তসবিরেই তাকে দিয়ে পদাঘাত করালেন কেন?

ডঃ শরীফের মতে ওটা হয়েছে, চঞ্চলকুমারীর 'স্ব-কালীন শাসক বিদ্বেষ।'

আওরঙ্গজেব যে কিরূপ রাজপুত তথা হিন্দুবিদ্বেষী ও হিন্দুধর্মের শত্রু ছিলেন, তাঁর সমকালীন চঞ্চলকুমারীর নিশ্চয়ই তা জানার কথা। তাই বঙ্কিম, আওরঙ্গজেবের ঐ হিন্দু-বিদ্বেষের কথা স্মরণ করেই হয়ত, চঞ্চলকুমারীকে দিয়ে আওরঙ্গজেবের ছবিতে পদাঘাত করিয়ে ব্যাপারটা অনৈতিহাসিক হলেও কতকটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছেন।

এখন আওরঙ্গজেব কিরূপ রাজপুত তথা হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন, তার কিছুটা নমুনা দিচ্ছি—

'আওরঙ্গজেব আজমীর হইতে দিল্লী ফিরিয়াছিলেন (২ এপ্রিল ১৬৭৯) এবং সেই দিনই অমুসলমানদের উপর জিজিয়া কর আবার চাপাইয়া দিলেন।

উদার-চরিত্র বাদশাহ আকবর শত বৎসর পূর্বে এই কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। মাড়োয়ার হইতে মন্দির ভাঙ্গিয়া দেব-দেবীর মূর্তি গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া দিল্লী আনা হইল এবং বাদশাহের হুকুমে তাহা দিল্লী দুর্গের প্রাঙ্গণে এবং শহরের জমা মসজিদের সিঁড়ির নীচে ফেলিয়া রাখা হইল, 'যে সকলে তাহা পদদলিত করিতে থাকিবে।' (মাসির, ফারসী মূল, ১৭৫ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু অজিত সিংহের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ফলে রাজনৈতিক চিত্রপট একেবারে উল্টাইয়া গেল। রাষ্ট্রনেতা পাইয়া মাড়োয়ার জাগিয়াছে জানিয়া, বাদশাহ তৎক্ষণাৎ (১৭ আগষ্ট) এক প্রবল সৈন্যদল সেই দেশে পাঠাইলেন এবং তাহার দুই সপ্তাহ পরে স্বয়ং দিল্লী ছাড়িয়া আজমীরে গেলেন। চারিদিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন নিজ সৈন্যদল ডাকিয়া আনিয়া, আজমীরকে নিজের হেড-কোয়ার্টার্স করিয়া আওরঙ্গজেব যুদ্ধ, লুঠ, হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড মাড়োয়ারদের উপর চালিয়া দিলেন। পুষ্কর হ্রদের নিকট এক মহাযুদ্ধে রাজপুত দেশরক্ষিগণ দিন দিন যুঝিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। 'যেমন মেঘ পৃথিবীর উপর জলধারা ঢালিয়া দেয়, তেমনই আওরঙ্গজেব এই দেশের উপর বর্ষ সৈন্য বর্ষণ করিলেন, মাড়োয়ারের সব বড় শহর লুঠ হইল, মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার স্থানে মসজিদ গড়া হইল।' মাড়োয়ার দেশকে ঠিক মোগল সাম্রাজ্যের এক সুবার মত ঘোষণা করিয়া, কয়েকটি ফৌজদারিতে (অর্থাৎ সব-ডিভিসনে) বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটির উপর এক এক জন মোগল শাসন কর্তা রাখা হইল।' —বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত রাজসিংহ গ্রন্থে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের লেখা ভূমিকা।

আওরঙ্গজেব অত্যুগ্র হিন্দু-বিদ্বেষী হওয়ার ফলে তাঁর পূর্বপুরুষদের দীর্ঘ দিনের সুপ্রতিষ্ঠিত অত বড় মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ তিনি নিজেই যে প্রশস্ত করে যান--এ সব তো ইতিহাসের কথা। আওরঙ্গজেব অত অত্যাচারী হলেও, তবুও আমার মতে, বঙ্কিমের মত লেখক অনৈতিহাসিক ঐ পদাঘাতের ব্যাপারটা না লিখলেই পারতেন! কেন না, তিনি নিশ্চয়ই জানতেন, এই লেখার ফলে আওরঙ্গজেবের শুধু স্বধর্মী বলেই অন্তত কিছু মুসলমান তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হবেনই।

আর একটা কথা, আওরঙ্গজেব রাজপুতের ঘোরতর শত্রু হলেও তাঁর তসবিরে চঞ্চলকুমারীর পদাঘাত দেখানো যে, খুব স্বাভাবিক হয়েছে, তাও মনে হয় না। কারণ, নির্মলকুমারী প্রভৃতির সঙ্গে চঞ্চলকুমারীর কথাবার্তায় দেখা

যায়, চঞ্চলকুমারী রীতিমতই বুদ্ধিমতী। তাই তার মত বুদ্ধিমতী এটা নিশ্চয়ই বুঝতো যে, ঐ চিত্রবিক্রেত্রীর সামনে সদম্ভে আওরঙ্গজেবের ছবিতে পদাঘাত করলে, তার নিজের, তার পিতার এবং তার পিতৃ-রাজ্যের কি পরিণতি হতে পারে! তাই রাজপুতের প্রবল শত্রু আওরঙ্গজেবের প্রতি চঞ্চলকুমারীর ক্রোধটা বঙ্কিম অত বড় করে না দেখিয়ে (ক্রোধ দেখানো যদি প্রয়োজনই ছিল), অন্যভাবে স্বাভাবিক হয়, এমন করে দেখালেও পারতেন।

ঠিক এমনি নির্মলকুমারী যেখানে আওরঙ্গজেবকে বলছে—'রাজপুতানী দিল্লীর বাদশাহের মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিযা যায় নাই কি? আমিও এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।' (মুনীর চৌধুরী তাঁর বইয়ে ১১ উদ্ধৃতির মধ্যে এই কথাগুলোও উদ্ধৃত করেছেন।) — এটাও কিছুটা অস্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে হয়। নির্মলকুমারী নির্ভীক রাজপুতানী হলেও, দিল্লীর অমন দুর্দ্ধর্ষ বাদশাহের মুখের উপর কি ঐ কথা বলতে পারে? আর বাদশাহও এর উত্তরে তেমন কিছুই বললেন না।

আওরঙ্গজেবের ছবিতে চঞ্চলকুমারীর পদাঘাতের ব্যাপারটাকে ডঃ শরীফ যে বলেছেন, ওটা জাতি-বিদ্বেষ নয়, ওটা চঞ্চলকুমারীর স্ব-কালীন শাসক বিদ্বেষ—এ কথ ঠিকই। কারণ, হিন্দু-বিদ্বেষী আওরঙ্গজেবের প্রতি বঙ্কিমের মন বিরূপ থাকলেও সাধারণভাবে মুসলমানদের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না। বিদ্বেষ থাকলে, তিনি কখনই মুসলমানের এত প্রশংসা করে লিখতেন না—'রাজা ভিন্ন জাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলা যাইতে পারে না। পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত। · এই সময়েই চৈতন্যদেব। এই সময়েই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অপূর্ব গ্রন্থাবলী। চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।…' (বাঙ্গালার ইতিহাস)।

আর বঙ্কিম মুসলমান-বিদ্বেষী হলে তাঁর 'বাঙ্গালার কৃষক' প্রবন্ধে হাসিম শেখের দুঃখে অত দরদ দিয়ে দুঃখও প্রকাশ করতেন না।

ডঃ শরীফ লিখেছেন—'সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটে সংস্কারমুক্ত

জিজ্ঞাসু মানুষ হিসেবে এবং তাঁর তিরোভাব ঘটে একজন খাঁটি হিন্দু হিসেবে। অতএব বঙ্কিম-সাহিত্য হচ্ছে, মানুষ বঙ্কিমের হিন্দু বঙ্কিমে ক্রম পরিণতির ইতিহাস ও আলেখ্য।'

ডঃ শরীফের এই মন্তব্যের সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ একমত। আমি আগে বলেছি, বঙ্কিম যতদিন নাস্তিক ছিলেন, ততদিন তিনি হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদাভেদ না করে উভয় সম্প্রদায়কেই সমান চোখে দেখেছেন এবং তাঁর সাহিত্যে মুসলমান চরিত্রগুলিকে সুন্দর ভাবেই চিত্রিত করেছেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলায় আকবর প্রভৃতির প্রচুর প্রশংসা তো আছেই, বখতিয়ার খিলজিরও কোন নিন্দা নেই। এমন কি, দেশদ্রোহী মানসিংহকেও, হয়ত তাঁর কোন গুণের কথা স্মরণ করেই, তাঁকে 'মহাত্মা' বলতেও এতটুকু ইতস্তত করেন নি। আরও বঙ্কিম লিখেছেন—সেলিমের মহিষী, মানসিংহের ভগিনী বলছে, হিন্দুনারী হয়েও বাদশাহের মহিষী হলে তার মনুষ্য জন্ম সার্থক। —কপাল-কুণ্ডলা ৩।১

এহেন বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখা যায়, তিনি মৃণালিনীতে মগধ ও বাংলা আক্রমণকারী তুর্কী মুসলমান বখতিয়ার খিলজির বিরুদ্ধে মগধের বিজিত হিন্দু রাজকুমারকে দাঁড় করিয়ে কাহিনী রচনা করেছেন। এবং পররাজ্য আক্রমণ-কারী বখতিয়ার খিলজির নিন্দা করেছেন, বিশেষ করে তাঁর দৈহিক আকৃতি নিয়ে বিদ্রূপও করেছেন। মৃণালিনীর কাহিনীটি যদিও আসলে, মাত্র ১৭ জন সঙ্গী নিয়ে বখতিয়ারের বাংলা জয়, এই কিংবদন্তীরই প্রতিবাদ; তবুও এই সময়েই নাস্তিক বঙ্কিমের মনে তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া হিন্দুধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ আসে।

আমি আমার এই বইয়েই ৯০ ও ৯১ পৃষ্ঠায় বলেছি, বঙ্কিম ১৮৬৯ এর জানুয়ারিতে বি. এল. পরীক্ষা দেওয়ার আগে চাকরিতে ছ মাস ছুটি নিয়ে ছিলেন। সেই ছুটির মধ্যে ১৮৬৮র সেপ্টেম্বর নাগাদ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কাশী, প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঐ সময়েই অথবা ওর কিছুদিন পরেই তিনি মৃণালিনী লিখতে আরম্ভ করেন।

বঙ্কিম কাশী, মথুরা প্রভৃতি স্থানে গিয়ে দেখেছিলেন, সেখানকার হিন্দু মন্দিরগুলির উপর তুর্কী মুঘলদের অত্যাচারের নিদর্শন। আর শুধু দেখাই তো নয়, সেখানকার পাণ্ডা বা গাইডরা, যারা পুরুষানুক্রমে আগত লোকদের, ঐসব মন্দির ও মন্দিরের দেবতাদের উপর মুসলমান বাদশাহদের অত্যাচারের

কাহিনী শুনিয়ে আসছিল, তারা বঙ্কিমকেও সে কথা শুনিয়েছিল। আমার ধারণা, হিন্দুর মন্দির ও দেবতার উপর মুসলমান বাদশাহদের ঐ অত্যাচারের কাহিনী শুনেই বঙ্কিমের মনে বিশেষ ভাবে হিন্দুভাব জাগে।

বৃন্দাবনে ঐ মুসলমান-অত্যাচারের কাহিনী শুনে শরৎচন্দ্রের মত একজন বাউণ্ডুলে ও ভবঘুরে লোকেরই মনে তখন যা হয়েছিল, সেটাও এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পাবে। শরৎচন্দ্র তাঁর 'দিন কয়েকের ভ্রমণ কাহিনী' প্রবন্ধে লিখেছেন—

' সেই রাত্রেই আবার সকলে মন্দিরাদি দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। স্বামীজী আমাদের পথ দেখাইয়া চলিলেন। অথচ, না গেলেই হয়ত ভাল করিতাম। পথ চলার দুঃখের কথা বলিতেছি না, সে তো ছিলই। কিন্তু সেই আবার পুরাতন ইতিহাস। শুনিতে পাইলাম, এখানে ছোট বড় প্রায় হাজার পাঁচেক মন্দির আছে। কিন্তু অধিকাংশই আধুনিক ইংরাজ আমলের। ইংরাজের আর যাহাই দোষ থাক্, যে মন্দিরের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই, তাহার চূড়া ভাঙ্গে না, যে বিগ্রহের সে পূজা করে না, তাহারও নাক কান কাটিয়া দেয় না। অতএব যে কোন দেবায়তনের মাথার দিকে চাহিলে বুঝা যায়, ইহার বয়স কত। স্বামীজী দেখাইয়া দিলেন, ওটি অমুক জিউর মন্দির সম্রাট আওরঙ্গজেব ধ্বংস করিয়াছেন, ওটি অমুক জিউর মন্দির অমুক বাদশাহ ভূমিস্মাৎ করিয়াছেন, ওটি অমুক দেবায়তন ভাঙ্গিয়া মসজেদ তৈরি হইয়াছে, ওখানে আর কেন যাইবে, আসল বিগ্রহ নাই—নূতন গড়াইয়া রাখা হইয়াছে—ইত্যাদি পুণ্যময় কাহিনীতে চিত্ত একেবারে মধুময় করিয়া আমরা অনেক রাত্রে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।'

মুসলমান বাদশাহদের এই সব অত্যাচারের নিদর্শন ও কাহিনীই নাস্তিক হয়ে যাওয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে পুনরায় তাঁর নিজ হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুসলমান বাদশাহদের প্রতি, বিশেষ করে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেন।

অতএব ডঃ শরীফের কথা মতই দেখা গেল, বঙ্কিম সাহিত্য ক্ষেত্রে সংস্কার-মুক্ত মানুষ হিসাবে প্রবেশ করেও, শেষ পর্যন্ত আর পূর্ববৎ সংস্কার মুক্ত থাকতে পারেন নি।

এই সঙ্গে আর একটা কথা। বঙ্কিম তাঁর চাকরি জীবনে, এক মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ছাড়া, আর যে সব জায়গায় গেছেন, সে সব স্থানই হিন্দু প্রধান।

তিনি যদি মুর্শিদাবাদের মত পূর্ব বাংলার নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে, এমন কি উত্তর বঙ্গে রংপুরের মত মুসলমান প্রধান জায়গায় কোন দিন চাকরি নিয়ে যেতেন, তাহলে সেখানকার নবাব, জমিদার, ধনী ও শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'ত। আর এই পরিচয়ের ফলে, তাঁর সাহিত্যে যে হিন্দু প্রাধান্য ও মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু বিরূপ কথা আছে, সেটা হয়তো থাকতো না। থাকলেও যেভাবে আছে, ঠিক এইভাবে থাকতো না।

একথা আমার বলার আরও হেতু এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মৃণালিনী'তে হিন্দুর পক্ষ নিয়ে লিখলেও, তিনি চন্দ্রশেখরে কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমান দৃষ্টি নিয়েই লিখেছেন। বরং নবাব মীরকাশিমের প্রতি শ্রদ্ধাই দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর লিখেছিলেন, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে বসে। তখন তাঁর বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সময় ১২৮০ সালের শ্রাবণ থেকে ১২৮১ সালের ভাদ্র পর্যন্ত এই ১৪ মাস বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখর প্রকাশিত হয়েছিল।

বহরমপুরে থাকাকালে সংলগ্ন শহর মুর্শিদাবাদের নবাব এবং স্থানীয় ধনী ও জমিদার মুসলমানদের সঙ্গে বঙ্কিমের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। এখানে বিশিষ্ট মুসলমানদের সঙ্গে বঙ্কিমের সৌহার্দ্য ও পরিচয়টা চন্দ্রশেখরে হিন্দু মুসলমানে সমতা আনায় অনেকটা কার্যকর হয়েছিল, বলে আমার ধারণা।

ড. শরীফ লিখেছেন—'তাঁর (বঙ্কিমের) ধারণায় হিন্দুর রাজত্ব হলেই হিন্দু জাতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি। অথচ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা দেশে উনিশ-শতকের শেষার্ধেও হিন্দু রাজত্ব ছিল দিবাস্বপ্ন মাত্র। বাংলা দেশে মুসলমানকে বাদ দিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুর স্বাধীনতা বাঞ্ছা যে পূর্ণ হবার নয়—এ বাস্তব বুদ্ধি তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায় নি।'

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীও তাঁর বইয়ে বঙ্কিমের উপর এই অভিযোগ করে লিখেছেন -'হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ তুলে ধরবার জন্য সীতারাম (১৮৮৭)।'

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাসও তাঁদের সম্পাদিত 'সীতা-রাম' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রায় এই কথাই বলেছেন। তাঁরা লিখেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে দিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছারখার হইয়াছে।'

ব্রজেনবাবুদের কথাটা নিয়েই আগে কিছু বলছি--সীতারামকে দিয়ে যদি বঙ্কিমের হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নই ছিল, তা তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর অমন

স্বপ্নটা ভাঙলেন কেন? কলম তো তাঁর নিজের হাতেই ছিল। তিনি ইচ্ছা করলে ইতিহাসের পরোয়া না করেই তো তাঁর স্বপ্নকে সফল করেও দেখাতে পারতেন। এমনিতেই তো বঙ্কিম সীতারাম চরিত্র চিত্রণে প্রকৃত ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন বলে, 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র বঙ্কিমের উপর দোষারোপই করেছেন। না হয়, নিজের স্বপ্নকে সফল দেখাবার জন্য বঙ্কিম আর একটু ইতিহাসকে উপেক্ষা করতেন।

আসল কথা মোটেই তা নয়।

সীতারামের রচনাকাল ১২৯১-৯৩ সাল অর্থাৎ ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৬ খ্রীঃ। বঙ্কিমের এই শেষ উপন্যাসটিতেও হিন্দু-মুসলমানের একটি যুদ্ধের কাহিনী আছে।

এখন আমাদের মনে করতে হবে—ইংরাজ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলা জয় করে। তারপর ঐ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সওয়া শ বছরেরও বেশী সময় ধরে ইংরাজ বিজিত বাঙ্গালী ও ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করে, নিজের গোলা গুলি, কামান ও সৈন্যবাহিনীতে এ দেশ ভরে দিয়ে, এখানে দৃঢভাবে শক্ত শাসন কায়েম করেছিল। তখনকার ঐ মহাশক্তিশালী বৃটিশ শাসিত ভাবতে (তখন ইংরাজের পৃথিবীব্যাপী রাজ্য ছিল এবং তার রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না) তাদের ভারত-ছাড়া করা সংখ্যা লঘু হিন্দু কেন, সংখ্যাগুরু মুসলমানেরও অকল্পনীয় ছিল।

১৮৮৬তে তখন বাংলায় মুসলমান নবাব কোথায় যে, বঙ্কিম মুসলমান নবাবদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের তাতিয়ে দেশে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন কববেন? তখন যারা দেশের শাসক তাদের গায়ে আঁচড় দেবার মত হিন্দু মুসলমান উভয়ের যৌথ ক্ষমতাও ছিল না।

আসলে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় সুদৃঢ় ইংরাজ শাসনের আমলে বঙ্কিম হিন্দু মুসলমানের পুরাতন যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন মাত্র। তাতে হিন্দুর পক্ষ টেনে লেখা থাকতে পারে, তাই বলে এই বোঝায় না যে, বঙ্কিম ঐ বই লিখে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাছাড়া কিছুদিন আগেই তো তিনি আনন্দমঠে ঐ পুরাতন হিন্দু মুসলমানের কথা লিখতে গিয়ে ঐ বইয়ের শেষে পরিষ্কার ভাবে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, শাসক ইংরাজেরই জয় ঘোষণাই করেছেন এবং ইংরাজের আগমনকে ও শাসনকে শুভই বলেছেন।

ইংরাজের সুদৃঢ় শাসনকালে বঙ্কিম ঐ পুরাতন কাহিনী নিয়ে লিখতে গিয়ে যদি হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের স্বপ্ন দেখতেন, তাহলে তিনি চন্দ্রশেখরেও তা দেখাতে

পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। ইংরাজের সঙ্গে যখন মীরকাশিমের যুদ্ধ, তখন প্রতাপ তার 'একদল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা' নিয়ে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি বা ইংরাজের পক্ষেও যায় নি। বঙ্কিম দেখিয়েছেন, প্রতাপ মুসলমান নবাব মীরকাশিমেরই সাহায্যে আগিয়ে এসেছে।

আর বঙ্কিম তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' নিজেই তো বলেছেন—বাংলায় মুসলমান পাঠান রাজত্বকালেই বাঙ্গালী হিন্দুর প্রভূত প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি।

অতএব বঙ্কিমের উপন্যাসে হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের স্বপ্ন ছিল, এ কথাটা ঠিক নয়। বরং বলা যেতে পারে, ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের কথাই আছে।

ড. শরীফ নিজেই তো লিখেছেন—বঙ্কিম 'হিন্দুবীর সীতারামের পতন ঘটিয়ে ব্রিটিশ শাসন পোক্ত রাখার সহায়তা করে, আর একবার রাজভক্তি দেখিয়েছেন।'—প্রত্যয় ও প্রত্যাশা : পৃঃ ১৯৪।

ডঃ শরীফ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রসঙ্গে বলতে গিয়েও লিখেছেন—'ব্রিটিশ শাসন পোক্ত করার প্রয়াসীই (বঙ্কিম) জাতীয় স্বাধীনতার উদ্গাতা বলে বন্দিত হলেন। একেই বলে ভাগ্য।'—ঐঃ পৃঃ ১৯২।

মুসলমান আমলের শেষ ভাগে, এমন কি বঙ্কিমের সময়েও ইংরাজ যে বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে 'বন্দ্য' বা বন্দ্যনীয় হয়েছিল, তার কারণও ডঃ শরীফের ভাষাতেই বলছি—

'এখনকার দিনে যেমন এমনি নৈরাজ্য অবস্থায় আমরা স্বদেশী, স্বজাতি, স্বধর্মী, স্বভাষীর সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি, তাদের নিন্দা করি, আঠার উনিশ শতকের বাঙ্গালী হিন্দুও ছিল তেমনি নৈরাজ্যের ও নৈরাজ্য-পীড়নের স্মৃতি-প্রসূত ক্ষোভ জেদের স্বীকার। তাই জন-জীবনে জীবিকার নিরাপত্তা-দানে অসমর্থ তুর্কী মুঘল হ'ল ঘৃণ্য এবং ইংরাজ হ'ল বন্দ্য।'

বঙ্কিম একবার ভারতের ইংরাজ রাজকে সমর্থন করে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধেও মত দিয়েছিলেন। এজন্য তিনি দেশবাসীর কাছে নিন্দনীয় হয়েছিলেন। সেই সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তাঁর বিরুদ্ধে লিখে ছিল—

'...According to his [Bunkim Chunder Chatterjee the Dy collector of Berhampoor] opinion, 'much of the general feeling of distrust towards the Government which has often been the comment, is due to the action of the native press,'...We

are taken by surprise at the remarks of an educated native like Bunkim Babu.' 16 Octr, 1873

'...This mischievous remark of the Babu, as may be easily supposed, has met with the approval of his Honor....What Bunkim Babu said was simply silly in extreme.' 28 Octr, 1873

অতএব দেখা গেল, বঙ্কিম হিন্দু রাজত্ব স্থাপন নয়, বরং ইংরাজ শাসনই তখন বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন।

ডঃ শরীফ লিখেছেন- -'হিন্দু-মুসলমান কি কোন কালে এক ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যাবে? বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিজাতি-বিদ্বেষী। সাধারণভাবে বিচার করলে এতে অন্যায়, অস্বাভাবিকতা কিছুই পাওয়া যাবে না। কেন না, বঙ্কিম যে মুসলমানকে গাল দিয়েছেন, তারা তুর্কী মুঘল শাসকগোষ্ঠী। যে বিদেশী বিজাতি ও বিধর্মী এ দেশে চেপে বসল, আর দেশবাসীর স্বাধীনতা ও সম্পদ কেড়ে নিল, তাদের প্রতি বিরূপ থাকাই তো স্বাভাবিক ও শোভন। সহজাত এই বিরূপতা দেশী মুসলমানের গায়েও লাগল, কেন না ধর্মীয় ঐক্য সূত্র এবং আভিজাত্য বোধে দেশী মুসলমানেরাও নিজেদের তুর্কী মুঘলের জ্ঞাতি ভাবতে শিখেছে। যেমন, দেশী খ্রীষ্টানরা স্বজাতি ভেবেছে ইংরেজকে।'

ডঃ শরীফ অন্যত্র লিখেছেন—তুর্কী মুঘলের জ্ঞাতিত্বগর্বী দেশী মুসলমান অকারণে এ নিন্দা গালি নিজেদের গায়ে মাখে। 'মুসলমান' স্থলে 'মুঘল' লিখলে হয়তো তাদের গায়ে এতটা লাগত না।

ডঃ শরীফের এই কথাটা নিয়ে দুটা উদাহরণ সহযোগে একটু আলেচনা করছি। (১) কোন মুসলমান যদি দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহ বা বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ইতিহাসের সত্যতা স্বীকার করেই ইংরাজকে পররাজ্য অপহরণকারী, চক্রান্তকারী, অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারী বলে নিন্দা করবেনই। আর যেহেতু উপন্যাস সেজন্য বইয়ে কিছু অনৈতিহাসিক অবাস্তব কথাও থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে কি এই লেখার জন্য এখানকার দেশী খ্রীষ্টানরা, যাঁরা ইংরাজদের স্বজাতি বলে গর্ব করেন, তাঁরা ঐ মুসলমান ঔপন্যাসিকের উপর খড়্গ হস্ত হবেন? যদি হন, তাহলে তো তাঁরা ভুলই করবেন বলে মনে হয়।

তুর্কী মুঘলদের অত্যাচারের কথা নিয়ে লেখার জন্য বঙ্কিমের উপর দেশী মুসলমানদের ক্রোধ হলে, কতকটা এই ধরণের হবে না কি ?

(২) আর একটা কথা। দেশী খ্রীষ্টানদের আদি উৎস যেমন হিন্দু, দেশী মুসলমানদের উৎসও তাই। এটা তো সত্য যে, আজকের এই দেশী মুসলমান-দের পূর্বপুরুষরা তুরস্ক থেকে আসেন নি। তাঁদের প্রায় সকলেই শাসক নবাব বা বাদশাহের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিলেন এবং বলপূর্বক তাঁদের ইসলাম ধর্মেও ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। (হিন্দু স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে খুবই নগণ্য। সেইজন্যই ভারত ৫০০ বছর মুসলমান শাসনে থেকেও আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতির মত মুসলমান রাষ্ট্র হয় নি।) ভারতের অনেক প্রদেশের ন্যায় এই বাংলাতেও হিন্দুর মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করা হয়েছে, এমন বহু নিদর্শনও রয়েছে। হাওড়া, হুগলী জেলাতেও এরূপ ক'টি মসজিদের কথা জানি। পাবনা জেলার শাজাদপুরে মখদুম শাহের মাজার নামে একটা বিখ্যাত মাজার আছে। অতবড় মাজার ঐ অঞ্চলে দ্বিতীয় নেই। সেটি আসলে একটি হিন্দু মন্দিরকে ঐভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। হিন্দু মন্দিরকে যে এরূপ করা হয়েছে, একথা আমাকে বলে-ছেন—ঐ অঞ্চলের অধিবাসী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ মযহারুল ইসলাম এবং শাজাদপুর কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব নরুল ইসলামের এক চিঠিতেও জেনেছি। মাজারের বাড়ির গায়ে নাকি এখনও হিন্দুত্বের ছাপও রয়েছে।

বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রসঙ্গে বঙ্কিমও লিখেছেন—'এখন তো দেখিতে পাই, বাংলার অর্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক—কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব।'

অতএব বাঙ্গালী হিন্দুরাই যে বাদশাহের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে জোর পূর্বক মুসলমানে পরিণত হয়েছে, তা বলা যেতে পারে।

এখন, এটা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, আজকের 'ক' নামক কোন ব্যক্তির পূর্ব পুরুষের উপর কেউ যদি অত্যাচার করে, তার স্বাধীনতা হরণ করে, তার ধন-

সম্পদ লুঠ করে, তার নারীর অবমাননা করে ও তার ধর্মে আঘাত হানে, তাহলে এই 'ক' কখনই ঐ অত্যাচারীকে শ্রদ্ধা করবে না। কিংবা কেউ যদি ঐ অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা লেখে, তাহলেও সে ঐ লেখককে গালি দেবে না।

ঠিক এমনি, আজকের বাঙ্গালী মুসলমানরা (যাঁদের পূর্ব পুরুষ হিন্দু ছিলেন), তাঁদের সেই পূর্বপুরুষদের উপর অত্যাচারী তুর্কী মুঘলকে কেন শ্রদ্ধা করবেন? আর ঐ তুর্কী মুঘলের সেই অত্যাচারের কাহিনী কেউ লিখলে তাঁর উপর ক্রুদ্ধই বা হবেন কেন?

এরূপ করলে, উদাহরণের ঐ দেশীয় খ্রীষ্টানদের মতই ভুল করা হবে না কি?

তবে এটা ঠিক যে, অনেক আগে পূর্বপুরুষদের ভাগ্যে যাই ঘটে থাকুক, আজকের ভারতীয় বা বাঙ্গালী মুসলমানরা যখন দীর্ঘকাল ধরেই মুসলমান, তখন কেউ তাঁর লেখায় তুর্কী মুঘল উল্লেখ না করে, শুধু মুসলমান উল্লেখ করে তাঁদের উদ্দেশে কোন অপ্রীতিকর শব্দ ব্যবহার করলে, তাতে মুসলমানদের ক্রোধ হবারই কথা।

তবে দেশী মুসলমানদের এটাও বোঝা দরকার যে, বঙ্কিম তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে মুসলমানদের সম্বন্ধে যে অপ্রীতিকর শব্দ ব্যবহার করেছেন, সে ঐ পররাজ্যগ্রাসী, অত্যাচারী তুর্কী মুঘলদের প্রসঙ্গেই।

ডঃ শরীফ লিখেছেন—'আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীতে মুসলিমের প্রতি নিন্দা, বিদ্রূপ এবং অশালীন কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে।'

ডঃ শরীফ এই কথা বলেও এর পরেই লিখেছেন—'মুসলমান বিদ্বেষবশে করলে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারামেও তা থাকত। এর কারণ আরও গভীরে। মুরশিদকুলি খাঁনের পরে কখনো বাঙ্গলায় নানা কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির দ্রুত ক্ষয়িষ্ণুতা, বর্গীর লুণ্ঠন, নবাবদের অযোগ্যতা, সামন্ত স্বৈরাচারের বৃদ্ধি, ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বেণেদের প্রাবল্য প্রভৃতি জনজীবনে দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব, নিরাপত্তাহীনতা, চারিত্রিক শৈথিল্য, প্রশাসনিক পীড়ন প্রভৃতি অনিবার্য ও ক্রমবর্ধমান করে তোলে। যে নবাব ও সরকারের উপর জনজীবন রক্ষার ও জীবিকার নিশ্চয়তা দানের দায়িত্ব

রয়েছে, সে-সরকার যদি তা পালনে উদাসীন ও অসমর্থ হয়, তাহলে জনজীবনে সর্ব দুঃখের কারণ স্বরূপ সেই রাজশক্তি ও সরকারের প্রতি মানুষ ক্ষিপ্ত, বিরক্ত ও আস্থাহীন হয়ে পড়ে। মনের ক্ষোভ তখন অক্ষম অসহায় মানুষ নিন্দা গালিতেই মিটায়। 'বিশেষ মুসলমান রাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ··যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায়, দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে।· ·২০।২৫ জন (হিন্দু) জড় করিয়া মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়।' (আনন্দমঠ) 'মুসলমানের পর ইংরাজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরাজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল।'

ডঃ শরীফের এই সুচিন্তিত ও সুন্দর ব্যাখ্যাটির সঙ্গে আমার একটা কথা যোগ করতে চাই—

অযোগ্য নবাব ও সরকার জনজীবন রক্ষার ও জীবিকার নিশ্চয়তাদানে অসমর্থ হলে, তখন দেশের হিন্দু মুসলমান সকল প্রজাই তো নবাবের প্রতি নিন্দা ও গালি বর্ষণ করবে। খেতে না পেলে এবং জীবন রক্ষার নিশ্চযতা না পেলে, মুসলমান প্রজারাও স্বধর্মীয় সত্ত্বেও নবাবের উপর ক্ষিপ্ত হবেই। কিন্তু দেশের সেই দুঃসময়ে মুসলমানরা যখন নবাবকে কিছুই বলছে না, অথচ হিন্দুরা প্রতিবেশী মুসলমানদের বাড়ি পোড়াচ্ছে, তখন বুঝতে হবে, নবাব তার শাসন ব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তারতম্য করেছিলেন। তাই হিন্দুরা যে নবাবকে গালি দিয়েছিল ও মুসলমানের ঘর পুড়িয়েছিল, সেও অযোগ্য নবাবের অপশাসনের জন্যই।

ডঃ শরীফ সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমের প্রশংসা করেও, আবার এও বলেছেন—'কেবল উদ্দেশ্যদুষ্ট সচেতন অশিল্পী বঙ্কিমই কাহিনী বহির্ভূত মন্তব্যের মধ্যে (তথা মুঘলের, তুর্কীরও নয়—রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণীতে) অশ্লীল, অসংযত ভাষায় নিন্দা করেছেন।'

ডঃ শরীফের এই কথাটা সম্বন্ধে আমার একটু বলার আছে— 'সচেতন' বঙ্কিম রাজসিংহ ও আনন্দমঠে 'অসংযত ভাষায়' নিন্দা করলেও, অশ্লীল অর্থে সাধারণত যা বোঝায়, এমন কোন ভাষা কি তিনি ব্যবহার করেছেন? আর দেবী চৌধুরাণীতে তো বঙ্কিম মুসলমানদের তেমন কোন নিন্দাই করেন নি।

'উদ্দেশ্যদুষ্ট, সচেতন অশিল্পী বঙ্কিম' না বলে ডঃ শরীফ বরং একথা বললে পারতেন—শিল্পী বঙ্কিম উদ্দেশ্যদুষ্ট হয়ে সচেতন ভাবে নিন্দা করেছেন। কারণ, 'অসংযত ভাষায় নিন্দা'র কথা বাদ দিয়ে রাজসিংহ ও আনন্দমঠে যে বঙ্কিমের শিল্প প্রতিভা আছে, একথা মুসলমান সাহিত্যিকরাও স্বীকার করেছেন। আর বঙ্কিম কেন বা কি উদ্দেশ্যে রাজসিংহ, আনন্দমঠে মুসলমানদের নিন্দা করেছেন, সে কথা আগেই আলোচনা করেছি।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের কোন কোন রচনায় মুসলমানদের প্রতি যে নিন্দা আছে, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রও যা বলেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অধিকাংশ মুসলমানই যখন বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতকে পৌত্তলিকগন্ধী বলে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি জানায়, তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কি মত তা জানতে চান। রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে তখন যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার কিছুটা এই—

'আমি নিঃসঙ্কোচে ইহা স্বীকার করি যে, বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের সমগ্র অংশ যে পুস্তকে উহা সন্নিবিষ্ট, উহার সহিত পঠিত হইলে, ইহাতে মুসলমানদিগের মনে আঘাত লাগিতে পারে। কিন্তু ঐ সঙ্গীতের যে প্রথমাংশ স্বতঃই জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে, তাহা যে সর্বদাই আমাদিগকে উহার অবশিষ্ট অংশের বা যে উপন্যাসে উহা ঘটনাক্রমে সন্নিবিষ্ট, তাহার কথা স্মরণ করাইবে, তাহা নহে।'

রবীন্দ্রনাথের এই বিবৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে—আনন্দমঠ রচনার জন্য মুসলমানরা যে বঙ্কিমের উপর ক্ষুব্ধ হতে পারেন, এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

শরৎচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট. উপাধি নিতে গেলে, ঢাকায় 'শান্তি' পত্রিকার পক্ষ থেকেও তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয়। সেই সভায় কিছু মুসলমান বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উত্থাপন করায় শরৎচন্দ্র সেই প্রসঙ্গে বলে ছিলেন —'বঙ্কিমবাবু অনেক জায়গায় অকারণে মুসলমানদের আক্রমণ করে ছিলেন।'

বঙ্কিমের ঐতিহাসিক বা ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাসগুলিতে যে মুসলিম বিরূপতার কথা আছে, সে সম্বন্ধে ডঃ শরীফের বক্তব্য এবং সেই সঙ্গে আমারও

কথা আগে বলেছি। এই ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাসের কথা বাদ দিয়েই শরৎচন্দ্রের ন্যায় একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বঙ্কিম অনেক জায়গায় অকারণে মুসলমানদের আক্রমণ করেছেন। যেমন—

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মত একটা হিন্দুর সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিম নিশাকরের মুখ দিয়ে গায়ক দানেশ খাঁর উদ্দেশ্যে বলিয়েছেন—'ওস্তাদজী শুয়ার শুন্‌চো নাকি?'

আবার 'কমলাকান্তে'র মত অমন একটা সুন্দর বইয়ে এর 'মনুষ্য ফল' প্রবন্ধে খানাসামা ফৈজু প্রসঙ্গে কমলাকান্তের মুখ দিয়ে অকারণ গালিসূচক একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত 'রাজসিংহে'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে যদুনাথ সরকার দেখিয়েছেন, আকবর তার পিতা আওরঙ্গজেবকে চিঠি লিখছে—'ঘৃণিত কাফিরদের আশ্চর্যজনক পরিশ্রম ও কার্যতৎপরতার ফলে··· লজ্জা ও মনোকষ্ট পাইতেছি।'

এখন কেউ হয়ত আওরঙ্গজেবের পুত্র আকবরের এই চিঠি দেখিয়ে বলবেন, মুসলমানরা যেমন অকারণে হিন্দুদের কাফির বা ঘৃণিত কাফির বলতো, তেমনি বঙ্কিমও নিশাকরের কথায় বার বার বাধাদানকারী দানেশ খাঁ এবং আফিংখোর, আধপাগলা বা সেয়ানাপাগলা কমলাকান্তের মুখ দিয়ে ফৈজু প্রসঙ্গে ঐ কথা বলিয়ে, স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছেন।

কয়েকজনকে এই নিয়ে বলতেও শুনেছি—মুসলমানরা যেমন নিজেদেব মধ্যে হিন্দুদের গালি দিয়ে কথা বলতো, হিন্দুরাও তেমনি নিজেদের মধ্যে মুসলমানদের গালি দিয়ে কথা বলতো। অতএব ঐরূপ লিখে বঙ্কিম অস্বাভাবিক কিছু করেন নি।

লেখার মধ্যে পাত্র-পাত্রীর ঐরূপ মুখের কথা স্বাভাবিক হোক, আব অস্বাভাবিকই হোক্, তবুও বলবো, সব কথা সব সময়ে লেখা ঠিক নয়। তাছাড়া ঐ কথাগুলো এমন কিছু প্রয়োজনীয়ও নয় যে, বইয়ে তা দিতেই হবে। বিশেষত একজন যে কথায় আঘাত পেতে পারে, সে কথা বাদ দিয়ে বা ঘুরিয়েও তো লেখা যেতে পারতো। এতো আর চিঠি বা মুখের কথা নয়। তাই বঙ্কিমের ন্যায় অত বড প্রতিভাধর সাহিত্যিকের চিরস্থায়ী সাহিত্যে ও কথা না থাকলেই ভাল হ'ত।

বঙ্কিম লিখেছেন—

'বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্ম এই তিন ধর্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার আসন গ্রহণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। কেহই হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ইসলাম কতকগুলো বন্যজাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলা অনার্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্য সমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই। ভারতীয় আর্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে।'

বঙ্কিমের সময়েই এককালের হিন্দু-বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সমান, হয়ত বা কিছু বেশীই দাঁড়িয়ে ছিল। তাই 'আর্য সমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই' বলে, বঙ্কিমের এই যে গর্ব, তা তাঁর একটা বৃথা গর্ব।

বঙ্কিমের এই লেখাতেও দেশী মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন, তাহলে তাঁদের পূর্বপুরুষরা কি বন্যজাতি ও অনার্য জাতির মানুষ ছিলেন ?

হতে পারে, মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীব লোকই হয়ত, যে কারণেই হোক, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তবু এটাও তো সত্য যে, বহু ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুও ইসলাম ধর্ম বরণ করে ছিলেন। যেমন—কালাপাহাড়, তানসেন, ইকবাল, জিন্না, আলাউদ্দীন খাঁ, আক্রাম খাঁ প্রভৃতি। এঁরা কেউ নিজে, কারও বা পূর্বপুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ছিলেন। বাংলার কালাপাহাড়, আলাউদ্দীন খাঁ, আক্রাম খাঁ এরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশের। শুনেছি, সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলির পূর্বপুরুষরাও নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বঙ্কিম তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন— 'পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ তামাসা হইয়াছিল। আমাব কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমানের লিখিত স-এর মতাখ্‌খরীণ নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ।'

এখানে বঙ্কিম পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে বেশ ভাল কথাই বলছিলেন। বলতে বলতে হঠাৎ কিছুটা রাগত ভাবেই স-এর বই এর নাম করতে গিয়ে 'গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমান' অকারণে বললেন।

বঙ্কিম তাঁর 'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থেও অধৈর্য হয়ে ইউরোপীয় লেখকদের প্রতি প্রায় এই ধরণেরই উক্তি করায়, রবীন্দ্রনাথ সে কথার উল্লেখ করে তাঁর 'কৃষ্ণ-

চরিত্র' প্রবন্ধে ('আধুনিক সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত) তাই লিখেছেন—'পাশ্চাত্য মূর্খ অর্থাৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি লেখক (বঙ্কিমচন্দ্র) অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করিয়াছেন।…কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি নহে, সাধারণত ইউরোপীয় জাতির প্রতিই লেখক স্থানে অস্থানে তীব্র বৈরিতা প্রকাশ করিয়াছেন।… অকারণে ইউরোপীয়দের প্রতি একটা অন্যায় খোঁচা দেওয়া যে কেবল অনাবশ্যক হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে মূল উদ্দেশ্যটি পর্যন্ত নষ্ট হইয়াছে।'

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিম পরিণত বয়সে স্বধর্মে অর্থাৎ হিন্দুধর্মে গভীর আস্থা ও অনুরাগের বশেই শুধু মুসলমানদের প্রতিই নয়, ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের প্রতিও খোঁচা দিয়ে লিখেছেন। অথচ এই বঙ্কিমই যতদিন নাস্তিক ছিলেন, ততদিন কী উদারই না ছিলেন!

ডঃ শরীফ লিখেছেন—'শাসক-শাসিতের পূর্ব সম্পর্ক স্মরণ করে উনিশ-শতকের হিন্দুলেখক মাত্রেই মুসলমানদের প্রতি কম বেশী বিরূপতা দেখিয়েছেন। সে বিরূপতা বিদ্বেষ ও বিদ্রূপরূপে প্রকাশ পেয়েছে।…অন্যদের কথা আলোচ্য নয় এই জন্য যে, তাঁরা কেউই প্রভাবশালী ছিলেন না। কিন্তু বঙ্কিম যুগস্রষ্টা প্রতিভা বলে স্বীকৃত। কাজেই তাঁর পক্ষে এ অনুদার ও অবিজ্ঞজনোচিত মনোভাব দূষণীয়। শাসক-শাসিতের পূর্ব সম্পর্ক যাই থাক না কেন, ইংরাজ শাসনে যখন হিন্দু মুসলমানের ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা, তখন দূরদর্শী জাতিপ্রাণ মনীষীর কর্তব্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের সংহতি সাধন করা। বঙ্কিমের মনন দৈন্য এখানে যে, তিনি প্রযোজন সচেতন ছিলেন না। একচক্ষু হরিণের মত, হিন্দু জাগরণের চারণ কবির ব্রতকেই বড় মনে করেছেন, দেশের সামগ্রিক স্বার্থের দিকে নজর রাখেন নি। তাই তিনি হিন্দুর ঋষি হলেন বটে, কিন্তু দেশের চিন্তানায়কের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রইলেন।'

ডঃ শরীফ আরও লিখেছেন—'বঙ্কিম সম্বন্ধে আমাদের ক্ষোভ এই, তাঁকে আমরা যুগন্ধর ও যুগোত্তর প্রতিভা বলে জানতাম।… তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক, পেয়েছি তার চাইতে কম, তাই এই ক্ষোভ।'

ডঃ শরীফের এই অভিযোগের সঙ্গে আমিও প্রায় একমত। আমারও বক্তব্য—বঙ্কিমের সময় বাংলার মুসলমানরা সকলেই বাঙালী। অর্থাৎ হিন্দুদের মত তারাও বাংলা দেশেরই অধিবাসী। বাংলার সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে তারাও সমান অংশীদার। আর তারা সংখ্যাতেও তখন নগণ্য নয়।

তাই বঙ্কিম যেমন বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বাংলার দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমভাবে দরদ দেখিয়ে ছিলেন, কিংবা দুর্গেশনন্দিনী ও চন্দ্রশেখর লিখে যেমন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাবের কথা প্রচার করেছিলেন; তেমনি ইংরাজের সুদৃঢ় শাসনের আমলে, ঐতিহাসিক হলেও, হিন্দু-মুসলমানের অতীতের বিরোধের কাহিনী এনে হিন্দু-দরদী হয়ে উপন্যাস না লিখলেই পারতেন। এই জন্যই তো রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রও বলেছেন—বঙ্কিম তাঁর শেষের উপন্যাসগুলিতে প্রচারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বঙ্কিমের মত সেকালের ঐ বিরাট প্রতিভাধর লেখক যদি হিন্দু-মুসলমানের মিলন বা বন্ধুত্ব-ধর্মী উপন্যাস লিখতেন, অথবা বাংলার হিন্দু-মুসলমানের অভাব-অভিযোগের কাহিনী নিয়ে 'বঙ্গদেশের কৃষকে'র মত আরও কিছু লিখতেন তাহলে দেশের এই উভয় সম্প্রদায়েরই অনেক উপকার হ'ত।

অথচ বঙ্কিম শেষ জীবনে কতকটা হিন্দুধর্মের প্রচারক হিসাবেই অমন যে অনুশীলনতত্ত্ব লিখলেন বা অত কঠোর পরিশ্রম করে কত শাস্ত্র ঘেঁটে ব্রজ-গোপীতত্ত্বের বিরুদ্ধ কথা লিখলেন, হিন্দুরা তা নিলই না। 'কৃষ্ণচরিত্রে' ব্রজগোপীতত্ত্বের বিরুদ্ধ কথা লেখায় গোঁড়া হিন্দু এবং বৈষ্ণবদের কাছে তাঁকে তিরস্কারই খেতে হ'ল। এমন কি অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তর মত একজন বঙ্কিম-সাহিত্যের সমালোচকও লিখলেন—'বঙ্কিম ভক্ত বৈষ্ণবের ভাব অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই বলিয়া বৃন্দাবন লীলাকে তেমন ভাবে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার সেরূপ সুকৃতি থাকিলে এবং আর কয়েক বৎসর বাঁচিয়া গেলে (কে বলিতে পারে?) হয়ত সে লীলাও বুঝিতেন।'

তাই আমার মতে বঙ্কিম যদি বরাবর নাস্তিকই থাকতেন, কিংবা বিদ্যা-সাগর মশায়ের মত না-আস্তিক না-নাস্তিক হিন্দু হতেন, অথবা অতটা গভীর হিন্দুভাবাপন্ন না হতেন, তাহলে আজ তাঁকে আর মুসলমানদের কাছে এত আক্রমণ সহ্য করতে হ'ত না। অবশ্য আমার এও ধারণা যে, নাস্তিক এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী, বরং মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতীই (আকবর প্রভৃতির প্রশংসা ও আয়েষার মত দেবীসমা অপূর্ব চরিত্র চিত্রণের জন্য) বঙ্কিমকে অতখানি হিন্দু করার এবং মুসলমানের প্রতি যা কিছু বিরূপ করার মূলেও, হিন্দুদের প্রতি তুর্কী মুঘলের, বিশেষ করে আওরঙ্গজেবের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী ও নিদর্শনগুলিই।

প্রশংসা ও সম্মান

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চাকরি-জীবনে দক্ষতা ও ন্যায় নিষ্ঠার জন্য উপরওয়ালা সাহেবদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন। সরকার স্বেচ্ছায় তাঁকে রায় বাহাদুর এবং সি. আই. ই. উপাধিও দিয়েছেন। কিন্তু এ সব বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কাছে এবং তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও বাহ্য ব্যাপার। বঙ্কিম-চন্দ্রের আসল প্রশংসা ও সম্মান হ'ল তাঁর সাহিত্য নিয়েই।

আগে 'সাহিত্য সাধনা' অধ্যায়ে দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা প্রসঙ্গে বলেছি, এই দুটি বই বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে কিরূপ প্রশংসা লাভ করে ছিলেন।

বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হয়ে বই আকারে বেরুলে তখন সেকালের বিখ্যাত 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় এর প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল।

পরে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে, বিভিন্ন সময়ে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁর রচনা নিয়ে আলোচনা করায় তিনি সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। এমন কি বিদেশীয়রাও তখন তাঁর বইয়ের অনুবাদ পড়ে তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী মিরিয়ম এস, নাইট বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের ইংরাজিতে অনুবাদ করলে, সেই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিতে গিয়ে সেকালের বিখ্যাত ইংরাজ লেখক Edwin Ernold বঙ্কিমের উচ্চ প্রশংসা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্রে'র ভূমিকায় বঙ্কিম-প্রসঙ্গে লেখেন—'বঙ্কিমচন্দ্রের উজ্জ্বল প্রতিভা সাহিত্যের যে ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রই উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ হইয়াছে।'

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজে' লেখেন—'বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইনি (বঙ্কিমচন্দ্র) একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।'

বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর পরই তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে 'সাহিত্য সম্রাট' আখ্যা পান। তাঁর সেই সম্মান আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

তাঁর মৃত্যুর ১১ বছর পরে বঙ্গ ভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী তাঁর আনন্দমঠ ও আনন্দমঠের অন্তর্গত বন্দেমাতরম্ গান নিয়ে মেতে ওঠে এবং এই বই ও এই গান থেকেই দেশাত্মবোধের প্রেরণা লাভ করে। এই সময়েই তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে বন্দেমাতরম্ গীত বা মন্ত্রের জন্য 'ঋষি' আখ্যাও লাভ করেন। অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি তখন 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কে প্রথম 'ঋষি' আখ্যা দেন, এই নিয়ে একটা মত-বিরোধ আছে। চন্দননগরের প্রবর্তক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী মতিলাল রায় তাঁর 'প্রবর্তক' পত্রিকায় ১৩৪৫ সালের শ্রাবণে লিখেছেন—বঙ্গভঙ্গের সময়ে, সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি এক সভায় সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' বলে ঘোষণা করেন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা নারায়ণ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখেছেন—বঙ্গভঙ্গের সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'বঙ্কিম উৎসব' শুরু করেছিলেন। সেই সময় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এক সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' বলে ঘোষণা করে। এরপর অরবিন্দ বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লেখেন—'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' নামে।

কে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম ঋষি বলেন, এ নিয়ে এই মতবিরোধ থাকায়, আমি মতিবাবু এবং হেমেন্দ্রবাবু উভয়ের সঙ্গেই দেখা করেছিলাম। মতিবাবু বলে-ছিলেন—'আজ আর কিছু মনে নেই।' হেমেন্দ্রবাবু বলেছিলেন—'আমার পরিষ্কার মনে আছে, সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অফ ইয়ং মেন (পরবর্তী-কালের ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট) এর এক সভায় স্যার গুরুদাস প্রথম ঘোষণা করেছিলেন।'

এ নিয়ে ১৩৬৮ সালের ৩রা বৈশাখের আনন্দবাজার পত্রিকায় আমি একটা প্রবন্ধও লিখেছিলাম। হেমেন্দ্রবাবুর কথাটাই ঠিক বলে মনে হয়।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দের 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল। তিনি বন্দেমাতরম্ সংগীত প্রসঙ্গে লেখেন—

It was thirty two years ago that Bankim wrote this great song. The Mantra had been given and in a single day a whole people had been changed to the religion of patriotism.

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরই তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কলকাতা করপো-রেশন ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউটের সামনের রাস্তার নামকরণ করে বঙ্কিম

চ্যাটার্জী স্ট্রিট। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচালক মণ্ডলী পরিষদ ভবনে বঙ্কিমের তৈল চিত্র এবং মর্মর মূর্তি স্থাপন করেন। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাস ভবনে 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা' স্থাপন করেছেন। এবং কলকাতায় আউটরাম ঘাটের সামনে গড়ের মাঠে যেখানে সম্রাট পঞ্চম জর্জের মূর্তি ছিল, সেটি অপসারিত করে তার জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ ব্রোঞ্জমূর্তি স্থাপন করেছেন। এছাড়া হাওড়ায় বঙ্কিম সেতু, নৈহাটীতে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে কলেজ ইত্যাদিও হয়েছে।

ডঃ আহমদ শরীফ এবং মুনীর চৌধুরী সাহেবও বঙ্কিমের সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে কি লিখেছেন, এখন সে কথা বলছি—

ডঃ আহমদ শরীফ লিখেছেন—'বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল অসামান্য। জ্ঞান-পিপাসাও ছিল অসাধারণ। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রশ্নাতীতরূপে গভীর ও ব্যাপক। ইতিহাসে, অর্থশাস্ত্রে এবং বিজ্ঞানেও ছিল তাঁর কৌতূহল। বঙ্কিম-রচনায় বঙ্কিমকে আমরা সর্ববিদ্যা-বিশারদরূপেই পাই। এমনটি আজো কচিৎ দেখা যায়।'

ডঃ আহমদ শরীফ আরও লিখেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্র এ যাবৎ শ্রদ্ধার আসনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েই আসীন রয়েছেন। উনিশ শতকে এ শ্রদ্ধা তিনি পেয়েছিলেন অসামান্য শিল্পী ও রোমান্স রচয়িতা হিসেবে। তিনি লেখক তথা শিল্পী-হিসাবে ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার বিস্ময়।···কেবল শিল্পী হিসেবে যে সব সমালোচক তাঁর যোগ্যতা যাচাই করবেন, সে-সব রসগ্রাহী পাঠক-সমালোচকের বিস্ময়মুগ্ধ চিত্তলোকে তাঁর মর্যাদার আসন অক্ষয় হয়ে থাকবে।'

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী তাঁর 'তুলনামূলক সমালোচনা' গ্রন্থে বলেছেন—

'একবার তাঁর (বঙ্কিমের) কল্পনা যখন নিজের সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি ধমণীতে উষ্ণ রক্তের মতো সবেগে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন তাঁর চিত্ত আর নিয়মার্গীয় চিন্তার বশ থাকে না। জীবনের মহত্তম আবেগ, তার গূঢ়তম সত্য, তার সহস্র জটিলতার মোহনীয় লীলা ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়ে এক বিস্ময়কর মহামূল্যবান জগৎ সৃষ্টি করে।'

বঙ্কিম সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত প্রশংসা বাণী উচ্চারিত হয়েছে, সে সবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাণীই সর্বাধিক ও সর্বপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ সেই বিখ্যাত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে যেমন

বঙ্কিমের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তেমনি তাঁর বহু লেখায় এবং অভিভাষণেও বঙ্কিমের উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কথা বলেছেন। বঙ্কিমের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সেই সব সশ্রদ্ধ উক্তির কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি—

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্য রূপ' প্রবন্ধে লিখেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকালে দেখি, তিনি গল্প-সাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। তাঁর পূর্বেকার গল্প সাহিত্যের ছিল মুখোশ পরা রূপ, তিনি সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন।'

১৩৪১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রবাসীবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—একথা মানতেই হবে বঙ্কিম তাঁর নভেলে আধুনিক রীতিরই রূপ ও রস এনেছিলেন। তাঁর ভাষা পূর্ববর্তী প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা ভাষায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেও তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন—

আধুনিক বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের পথ মুক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান কাঁটালপাড়া-নৈহাটীতে ১৩৩০ সালের ৮ই ও ৯ই আষাঢ় যে চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়, তার প্রথম দিনে রবীন্দ্রনাথ ঐ সম্মিলনের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে বলেছিলেন—

আমার এই বৃদ্ধ বয়সে সভা সমিতিতে যোগদান অসম্ভব। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমির আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি নাই। তাই আমাকে আসিতেই হইয়াছে।

নব্য বঙ্গ-সাহিত্যের ভগীরথ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দিতেই নৈহাটী সম্মিলনে আসিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার গ্রাম্য সাহিত্যের ভাষাকে বিশ্ব সাহিত্যের উপকরণরূপে গড়িয়াছেন। টোলের পণ্ডিত ও কর্মীনবীশেরা তাহাকে যে সমস্ত শৃঙ্খল পরাইয়াছেন, তাহা স্বহস্তে মোচন করিয়া তিনি বাঙ্গলা ভাষাকে মক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল সাহিত্যের বিজয় যাত্রার পথই তৈরী করেন নাই, রথও নিজে গড়িয়াছিলেন। তখনকার দিনে সে যে কত বড় কৃতিত্ব, তাহা আধুনিকেরা বুঝিতে পারিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের শৈশবে যে বীজ বপণ করিয়াছিলেন, তাহাই আজ অরণ্যকে বহন করিয়া আনিয়াছে অতএব বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গলা সাহিত্যের ঋণের পরিমাণ করা যায় না।

সংযোজন

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি অজ্ঞাত রচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি অজ্ঞাত রচনা এখানে পর পর প্রকাশ করছি। এই রচনাগুলি আজও পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

এই ক'টি রচনার মধ্যে প্রথমটি—'বাল্মীকির জয়' ১২৮৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র। রচনাটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের দীর্ঘ সমালোচনা।

বঙ্গদর্শনে সমালোচনার সঙ্গে সমালোচকের নাম না থাকলেও এটি বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা। এ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ প্রভৃতির লিখিত প্রমাণ ছাড়াও, সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, স্বয়ং হরপ্রসাদই তাঁর 'বাল্মীকির জয়' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্গদর্শন থেকে এই লেখাটি উদ্ধৃত করে লেখার সঙ্গে লেখক ব'লে বঙ্কিমচন্দ্রেরই নাম দিয়ে গেছেন।

গোপীনাথ কবিরাজ প্রভৃতির লেখার কথা যে বলছি, তাঁরাও অবশ্য হরপ্রসাদের মুখে শুনেই এ কথা লিখেছেন।

হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের একরূপ প্রতিবেশী ছিলেন। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাড়ির খুব নিকটেই ছিল হরপ্রসাদের বাড়ি। হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের এবং সঞ্জীবচন্দ্রেরও সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের লেখক ছিলেন, আর উভয়েরই অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। তাই হরপ্রসাদের অনুরোধে তাঁর বইয়ের সমালোচনা লেখা একদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে যেমন সম্ভব ছিল, তেমনি হরপ্রসাদের অনুরোধ ছাড়াই বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেও লেখাটি যে কার, তা সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রের কাছ থেকে পরে জেনে নেওয়াও হরপ্রসাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এনট্রান্স পরীক্ষার বাংলা পাঠ্য বইটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদনা করেছিলেন। বইটি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পাঠ্য হলেও তিনি বইটির সম্পাদনা শেষ করেছিলেন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দেই, এবং ঐ বছরেই বই ছাপাও শেষ হয়েছিল।

এই বইয়ে মূল সংস্কৃত মহাভারত থেকে বাংলা গদ্যে অনুবাদ করা একটি কাহিনী আছে। কাহিনীটির নাম দেওয়া হয়েছে—কৃষ্ণপার্শ্ব নকুল। এর অর্থ যে-বেজি বা নেউলের দেহের একটা পাশ সোনার।

এই কাহিনীর সঙ্গে অনুবাদক হিসাবে কারও নাম নেই। তবে এটি যে বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা তার প্রমাণ, অনুবাদের শেষে তারকা চিহ্ন দিয়ে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র পাদটীকায় লিখেছেন—This extract has been specially translated, occasionally freely by the compiler for the present compilation. A few words and phrases and even entire verses have been here and there purposely omitted.

'কৃষ্ণপার্শ্ব নকুল' গল্পটি বইয়ের প্রথমেই আছে। তারপরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরও বই থেকে রচনা দেওয়া হয়েছে। বইয়ের পদ্যাংশে আছে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সংকলিত ও সম্পাদিত ঐ এনট্রান্স পরীক্ষার বাংলা পাঠ্য বইটির প্রথমে ইংরাজিতে লেখা একটা preface বা ভূমিকা আছে। ভূমিকার শেষে যথারীতি বঙ্কিমচন্দ্রের পুরা নামও ছাপা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই লেখাটিও এখানে দিয়েছি।

'Caste in Lower Bengal' নামে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অজ্ঞাত ইংরাজি রচনা নিয়ে প্রসঙ্গ-কথা সহ ১৯৬১র জুলাই সেপ্টেম্বর সংখ্যা Man in India পত্রিকায় Bankimchandra on Caste নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। সেই প্রবন্ধের একটি পুনর্মুদ্রণ কপি ঐ পত্রিকার সম্পাদক আমাকে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ Caste in Lower Bengal রচনাটি আজও তাঁর কোন গ্রন্থভুক্ত হয় নি। Man in India পত্রিকায় সম্পাদকের লেখা প্রসঙ্গ-কথা সহ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই রচনাটিও এখানে দিয়েছি।

বাল্মীকির জয়

বঙ্গদর্শনে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পুনর্মুদ্রিত হইলে তাহা বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়া থাকে না। 'বাল্মীকির জয়' কিয়দংশে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু গ্রন্থের অধিকাংশই বঙ্গদর্শনে বাহির হয় নাই। উহার যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষরূপে পরিবর্তিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এ অবস্থায়, আমার সমালোচ্য গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অতএব পাঠক যদি অনুমতি করেন, তবে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। সম্পাদকের অনুমতি পাইয়াছি।

দুঃখের বিষয় সমালোচনা আরম্ভ করিয়া, আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, এখানি কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা পদ্যে লিখিত নহে, সুতরাং সমালোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে আমি নিশ্চিত জানি, কেন না ইহা কথোপকথনে বিন্যস্ত নহে। ইহাকে নবেলও বলিতে পারিলাম না। কেন না, ইহাতে নায়ক নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টসিপ নাই, বিবাহ নাই, লুকোচুরি, মারামারি খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথা আছে—কিন্তু পুরাণ নহে—দিগ্বিজয়ের কথা আছে, কিন্তু ইতিহাস নহে। একটা সৃষ্টির বিবরণ আছে, কিন্তু বিজ্ঞান নহে; নক্ষত্র-নীহারিকার কথা আছে, কিন্তু জ্যোতিষ নহে; মনুষ্যকে পশু করিবার কথা আছে, অথচ 'Origin of species' নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূত কিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভাল, গ্রন্থের জাতি নির্বাচন করিতে না পারি, এক রকম পরিচয় দিতে পারিব। গ্রন্থকার নিজে টাইটেল পেজে একপ্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন 'The Three Forces Physical Intellectual and Moral' ইংরেজি ভাষায় শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়া থাকি, Force ত কিছু দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাট মূর্তি—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি! যদি বল এই তিনটিই আমার Force, আমার উত্তর তোমার Force লইয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দাও, আমি এই ত্রিমূর্তির উপাসনা করিব। তোমার মানব দেবী অপেক্ষা আমার দুর্গাঠাকুরাণী অনেক

ভাল। দুর্গাঠাকুরাণীকে গড়িতে পারি, তাই পূজা করিতে পারি। মানবদেবী কোথায় ?

একথা অনেক দিন হইতে দেশে আছে—কোন্ কথা নাই ? তিনটি force physical, intellectual, moral. ত্রিগুণ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ; অথবা তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব, বহুকাল হইতে আছে। ক্রমে তিন গুণ ত্রিমূর্তিতে পরিণত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তিতে আর কাজ চলে না—ইহারা কেবল দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। দুই জন মন্দিরে বসিয়া চাল কলা মহার্ঘ্য করেন, আর একজন কেবল দুর্গা প্রতিমার চাল চিত্রে। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং—আমরা অন্য ত্রিমূর্তির অনুসন্ধান করি।

যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যে দেখাইবে, সে গুরুদেব এক্ষণে সাগর পারে। ইউরোপ হইতে কর্ণরন্ধ্রে মন্ত্র প্রেরিত হইতেছে, পূজা কর এই ত্রিমূর্তি Physical, Intellectual, Moral !—'দেখ Physical —আমাদের এই বাহু সম্পদ ! এই অতুল ঐশ্বর্য্য ! এই অসংখ্য অজেয় সেনা !' Intellectual—সে এই সেক্ষপীয়রের নাটক, এই গেটের কাব্য, এই কাণ্টের দর্শন, এই ইউরোপীয় বিজ্ঞানসমুদ্র ! আর Moral ? বুঝি শুধু খ্রীষ্ট ধর্ম। এ ত্রিমূর্তিতেও আমাদের মন উঠিল না—আমরা আপনাদের জন্য ত্রিমূর্তি গড়িব। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং ! দেখি চল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্তি কি প্রকার।

তুমি যেই হও না কেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কর কি ? তুমি বলিবে—আমি আপনার অন্নবস্ত্রের যোগাড় করি। কে তোমাকে অন্নবস্ত্র দেয় ? সমাজ। তুমি যেই হও, তুমি সমাজের খাটিয়া দাও—সমাজ তোমাকে খাইতে দেয়। যেই যাই করুক, সব পরের কাজ। সকল কাজের শেষ ফল সমাজের উপকার।

এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু সহস্র বৎসর হইতে, সমস্ত মনুষ্যবংশ চেষ্টা করিতেছে। সমাজের অনেক উন্নতিও হইয়াছে। কিন্তু এখনও মানুষের মন উঠে না। অনেকেই বলে সমাজ এখনও বড় অবনত। উন্নতির এক আধটা সোজা উপায় বাহির হয় না কি ? সোজা উপায় গোটা কতক প্রথম ফরাসিস রাষ্ট্র বিপ্লবের সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহার একটার বীজমন্ত্র 'Faternity !' ভ্রাতৃভাব। যখন মনুষ্যে মনুষ্যে দ্বেষশূন্য হইবে, যখন কেহ কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না, যখন সকলেই সকলের উপকারে ব্রতী হইবে,

তখন সবাই অপর সবাইকে ভাল বাসিবে। যখন মনুষ্যে মনুষ্যে 'ভাই ভাই' সম্বন্ধ হইবে তখনই মনুষ্য সমাজ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইবে। এই 'ভাই ভাই' সম্বন্ধ যাহাতে ঘটিয়া উঠে, তাহাই সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

কথাটা বড় পাকা কথা বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। এদেশের অবস্থা আমরা যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে ভ্রাতৃভাবকে বড় একটা শান্তিময় পদার্থ বলিয়া বোধ হয় নাই। আমাদের ভয় হয় যে, যদি সকল বাঙ্গালীতে ভ্রাতৃভাব ঘটিয়া উঠে—তাহা হইলে ঘরাও বিবাদে আর শরিকী মামলা মোকদ্দমায় দেশটা পয়মাল হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে জেলায় জেলায় হাইকোর্ট আর গ্রামে গ্রামে সব জজ নহিলে চলিবে না। আমাদের দেশী পণ্ডিত চানক্য ঠাকুর ইহার অপেক্ষা সার বুঝিয়াছিলে; ভ্রাতৃভাবে হইবে না—আত্মভাব চাই। আত্মবৎ সর্বভূতেষু দেখিতে হইবে। আরও মধুর—সর্বভূতেষু!

যাই হউক, আমরা ধরিয়া লই যে, এই গ্রন্থে যেখানে 'ভাই ভাই' পড়িব সেখানে মনুষ্যে মনুষ্যে অবিচল পবিত্র প্রেম বুঝিব। এই পবিত্র প্রেম, এই ভ্রাতৃভাব কিসে হইবে? কেহ বলেন বাহুবলে। সব জয় করিয়া, এক ছত্রাধীন কর, এক খড়্গে শাসিত কর, এক আইনে বদ্ধ কর, সবাই একাচার, কাজেই একপ্রাণ হইবে। সে বৎসর লর্ড সালিসবরি, একটা সভায় বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের এক ছত্রাধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে একীভূত হইতেছে। বৎসর কত হইল, আমেরিকার দক্ষিণ ভাগ নিগ্রোকে ভাই বলিতেছে না দেখিযা, উত্তর ভাগ তরবারি লইয়া দক্ষিণকে রক্তস্রোতে ডুবাইয়া ভ্রাতৃমন্ত্র জপাইল।

আর এক সম্প্রদায় বলেন, পণ্ডিত হও! আমি যাহা শিখাই শিখ, আমি যে শিকল পরাই পর, সকলে এক অবস্থায় দাঁড়াইবে—সকলেই ভাই ভাই হইবে। মধ্যকালে ইউরোপের রোমীয় পাদ্রীরা এই সম্প্রদায়ের লোক। যাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্ম না বুঝেন, তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মণগণকে এই দলভুক্ত করেন। আর একদল বলে, 'আমাদের বাহুবল নাই, বিদ্যাবল নাই—আছে কেবল বাক্যবল, আমরা পরের জন্য কাঁদিতেছি, তোমরা দাঁড়াইয়া একবার শুন দেখি। তাহা হইলেই তোমরা ভাই ভাই হইবে।' যীশু ও শাক্যসিংহের ন্যায় ধর্মবেত্তা, সোক্রেতিসের ন্যায় নীতিবেত্তা, আর স্কবিগণ এই দলভুক্ত। এই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্তি—এই তাঁহার বিশ্বামিত্র

ভাল। দুর্গাঠাকুরাণীকে গড়িতে পারি, তাই পূজা করিতে পারি। মানবদেবী কোথায়?

একথা অনেক দিন হইতে দেশে আছে—কোন্ কথা নাই? তিনটি force physical, intellectual, moral. ত্রিগুণ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; অথবা তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব, বহুকাল হইতে আছে। ক্রমে তিন গুণ ত্রিমূর্তিতে পরিণত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তিতে আর কাজ চলে না—ইহারা কেবল দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন; দুই জন মন্দিরে বসিয়া চাল কলা মহার্ঘ্য করেন, আর একজন কেবল দুর্গা প্রতিমার চাল চিত্রে। নমস্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং—আমরা অন্য ত্রিমূর্তির অনুসন্ধান করি।

যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যে দেখাইবে, সে গুরুদেব এক্ষণে সাগর পারে। ইউরোপ হইতে কর্ণরন্ধ্রে মন্ত্র প্রেরিত হইতেছে, পূজা কর এই ত্রিমূর্তি Physical, Intellectual, Moral!—'দেখ Physical —আমাদের এই বাহু সম্পদ! এই অতুল ঐশ্বর্য্য! এই অসংখ্য অজেয় সেনা!' Intellectual—সে এই সেক্ষপীয়রের নাটক, এই গেটের কাব্য, এই কাণ্টের দর্শন, এই ইউরোপীয় বিজ্ঞানসমুদ্র! আর Moral? বুঝি শুধু খ্রীষ্ট ধর্ম। এ ত্রিমূর্তিতেও আমাদের মন উঠিল না—আমরা আপনাদের জন্য ত্রিমূর্তি গড়িব। নমস্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং! দেখি চল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্তি কি প্রকার।

তুমি যেই হও না কেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কর কি? তুমি বলিবে—আমি আপনার অন্নবস্ত্রের যোগাড় করি। কে তোমাকে অন্নবস্ত্র দেয়? সমাজ। তুমি যেই হও, তুমি সমাজের খাটিয়া দাও—সমাজ তোমাকে খাইতে দেয়। যেই যাই করুক, সব পরের কাজ। সকল কাজের শেষ ফল সমাজের উপকার।

এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু সহস্র বৎসর হইতে, সমস্ত মনুষ্যবংশ চেষ্টা করিতেছে। সমাজের অনেক উন্নতিও হইয়াছে। কিন্তু এখনও মানুষের মন উঠে না। অনেকেই বলে সমাজ এখনও বড় অবনত। উন্নতির এক আধটা সোজা উপায় বাহির হয় না কি? সোজা উপায় গোটা কতক প্রথম ফরাসিস রাষ্ট্র বিপ্লবের সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহার একটার বীজমন্ত্র 'Faternity!' ভ্রাতৃভাব। যখন মনুষ্যে মনুষ্যে দ্বেষশূন্য হইবে, যখন কেহ কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না, যখন সকলেই সকলের উপকারে ব্রতী হইবে,

তখন সবাই অপর সবাইকে ভাল বাসিবে। যখন মনুষ্যে মনুষ্যে 'ভাই ভাই' সম্বন্ধ হইবে তখনই মনুষ্য সমাজ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইবে। এই 'ভাই ভাই' সম্বন্ধ যাহাতে ঘটিয়া উঠে, তাহাই সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

কথাটা বড় পাকা কথা বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। এদেশের অবস্থা আমরা যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে ভ্রাতৃভাবকে বড় একটা শান্তিময় পদার্থ বলিয়া বোধ হয় নাই। আমাদের ভয় হয় যে, যদি সকল বাঙ্গালীতে ভ্রাতৃভাব ঘটিয়া উঠে—তাহা হইলে ঘরাও বিবাদে আর শরিকী মামলা মোকদ্দমায় দেশটা পয়মাল হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে জেলায় জেলায় হাইকোর্ট আর গ্রামে গ্রামে সব জজ নহিলে চলিবে না। আমাদের দেশী পণ্ডিত চানক্য ঠাকুর ইহার অপেক্ষা সার বুঝিয়াছিলে; ভ্রাতৃভাবে হইবে না—আত্মভাব চাই। আত্মবৎ সর্বভূতেষু দেখিতে হইবে। আরও মধুর—সর্বভূতেষু!

যাই হউক, আমরা ধরিয়া লই যে, এই গ্রন্থে যেখানে 'ভাই ভাই' পড়িব সেখানে মনুষ্যে মনুষ্যে অবিচল পবিত্র প্রেম বুঝিব। এই পবিত্র প্রেম, এই ভ্রাতৃভাব কিসে হইবে? কেহ বলেন বাহুবলে। সব জয় করিয়া, এক ছত্রাধীন কর, এক খড়্গে শাসিত কর, এক আইনে বদ্ধ কর, সবাই একাচার, কাজেই একপ্রাণ হইবে। সে বৎসর লর্ড সালিসবরি, একটা সভায় বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের এক ছত্রাধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে একীভূত হইতেছে। বৎসর কত হইল, আমেরিকার দক্ষিণ ভাগ নিগ্রোকে ভাই বলিতেছে না দেখিয়া, উত্তর ভাগ তরবারি লইয়া দক্ষিণকে রক্তস্রোতে ডুবাইয়া ভ্রাতৃমন্ত্র জপাইল।

আর এক সম্প্রদায় বলেন, পণ্ডিত হও! আমি যাহা শিখাই শিখ, আমি যে শিকল পরাই পর, সকলে এক অবস্থায় দাঁড়াইবে—সকলেই ভাই ভাই হইবে। মধ্যকালে ইউরোপের রোমীয় পাদ্রীরা এই সম্প্রদায়ের লোক। যাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্ম না বুঝেন, তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মণগণকে এই দলভুক্ত করেন। আর একদল বলে, 'আমাদের বাহুবল নাই, বিদ্যাবল নাই—আছে কেবল বাক্যবল, আমরা পরের জন্য কাঁদিতেছি, তোমরা দাঁড়াইয়া একবার শুন দেখি। তাহা হইলেই তোমরা ভাই ভাই হইবে।' যীশু ও শাক্যসিংহের ন্যায় ধর্মবেত্তা, সোক্রেতিসের ন্যায় নীতিবেত্তা, আর সুকবিগণ এই দলভুক্ত। এই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্তি—এই তাঁহার বিশ্বামিত্র

বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকি। এই তিনকে 'Physical, Intellectual এবং Moral' নাম দেওয়া ঠিক হইয়াছে—এমত আমাদের বোধ হয় না।

যাহাই হৌক, এক্ষণে গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করি। লোকে বলে পুণ্যবান্‌ মনুষ্য মরিয়া স্বর্গে যায়, কিন্তু বেদমতে তাহারা স্বর্গে যায় না, তাহারা ঋভু হয়। ঋভুগণ, কোন দিব্য লোকে বাস করে। গ্রন্থের প্রথমদৃশ্য, ঋভুগণ এক রাত্রে, সংমিলিত হইয়া পৃথিবীদর্শনে আসিতেছে। কাব্যাংশে বাঙ্গালা ভাষায় এ দৃশ্যের তুল্য কোথাও কিছু নাই। সত্য ও ত্রেতা যুগের সন্ধিসময়ে এক অমাবস্যার রাত্রে 'সহসা ছায়া পথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইল—তাহার মধ্য হইতে অগণিত সংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। উক্ত শরৎ অমাবস্যারাত্রে সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তাহার মধ্য হইতে অগণিতসংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঋভুগণ মুহূর্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর ; কিন্তু যখন তীব্র জ্যোতির্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া—আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল, ধুমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল, নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে।'

ঋভুগণ হিমালয়ে অবতীর্ণ হইলেন। গ্রন্থারম্ভে হিমালয়ের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না—উহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ জন্য উদ্ধৃত করিলাম না। ঐ বর্ণনা পড়িয়া, যে অদ্বিতীয় হিমালয় বর্ণনা আজিও সাহিত্য সাগরে অতুল—তাহা স্মরণ কর। দেখিবে পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে বা গুণে দেশী ক্লাসিকে আর দেশী আধুনিকে কি প্রভেদ! কুমারসম্ভবের কবি—জগতের কবিকুলের আদর্শ—অতিপ্রকৃত সৌন্দর্যের (Ideal) অবতারণায় অদ্বিতীয়, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না। কিন্তু আধুনিক কবি প্রকৃতের (Real) বর্ণনায় কি সুচতুর! ইউরোপ হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি। আমাদের চিরমার্জিত পবিত্র অতিপ্রকৃত চরিত্র পরিত্যাগ করিয়া, আমরা ইউরোপীয় আদর্শ দেখিয়া পার্থিব অপবিত্র প্রকৃত চরিত্রের অনুসরণ করিতেছি। ইহাকে বলে উচ্চশিক্ষা। নীচশিক্ষা কাহাকে বলিব ?

ঋভুগণ হিমালয়শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া গান করিলেন। সে গানে বিশ্ব বিমো-

হিত হইল। গানের ধুয়া 'ভাই! ভাই! ভাই! সকলেই ভাই!' গান করিয়া ঋভুগণ আকাশপথে চলিয়া গেলেন—

'কিয়ৎক্ষণ পরে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল, রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে ঋভুগণ যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না। বোধ হইল, আকাশ প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে, দ্বাপরের শেষকালে অর্জুন যেমন বিরাটমূর্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেইপ্রকার বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে বিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল। বিশ্বসংসার আবার যেমন তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জ্বলিল, আবার আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল। পৃথিবীতে প্রভাত হইল, কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল।'

গান শুনিয়া পৃথিবীর সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিন জনের উপর এই গানের বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল। একজন বাহুবলে বলী দিগ্বিজয়ী রাজা বিশ্বামিত্র। দ্বিতীয় বিদ্যাবলে বলবান্ ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ। তৃতীয় নরহত্যাকারী দস্যু বাল্মীকি।

বিশ্বামিত্র সেই 'ভাই ভাই' মোহময় গীত শুনিয়া ভাবিতেছেন যে, তিনি মনুষ্যজাতিকে ভাই ভাই সম্বন্ধে মিলাইতে পারিবেন। 'অহং বিশ্বামিত্র। ভুবন জয় ত করি। তাতে কেহ বাধা দিতে পারিতেছে না। সব হাত ত করি। তার পর মিলাইব। কানে বাজিল ভাই ভাই। ভাবিলেন পৃথিবীতে এক দিন এইরূপ গাওয়াইতে পারি তবে আমি বিশ্বামিত্র—কিন্তু পারিব না কি? এ কাজে এ ভুজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না?'

বশিষ্ঠ ভাবিতেছেন —'বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়-দিগকে কি ফাঁকিই দিয়াছি। আবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, এমন কি অন্য জাতি মিলাইতে পারিব না? * * সর্বশাস্ত্র ত আয়ত্ত করিয়াছি। তেজ কি? শাস্ত্রে ত বলে 'স্বকার্যমুদ্ধরেৎ' তার আবার মান অবমান কি? পৌরোহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা ত সবই ব্রাহ্মণের। খুব খেলাই খেলিয়াছি। আবার সংহিতা করিতেছি। তারও এই মানে। যোগ শাস্ত্র, তারও ঐ

মানে। মান হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব, পারিব না কি? তেজঃ, সত্য। ধর্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারিব না কি? ঋভুরা কেন আসিলেন?'

বাল্মীকি ভাবিতেছেন—'কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই করিয়াছি, এ মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই। এই যে ঋভু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল। আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না! হায় কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম। কোথায় সব ভাই ভাই হব না আমায় দেখে সবাই পালায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল।'

গোড়াতেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রে একটা দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেল। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র উভয়ে প্রভাতে হিমালয় অবতরণ করিতেছিলেন— সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পরে পরিচিত হইলেন—এবং প্রথমে মিষ্টালাপ হইল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন—আপনার অতুল ঐশ্বয দেখাইলেন, বশিষ্ঠের বড় সমারোহে আতিথ্যসৎকার করিলেন, এবং রত্নরাশি তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ বিদায়কালে, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের তপোবনে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলেন। গিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—তাঁহার ঐশ্বর্যের অপেক্ষাও বশিষ্ঠের ঐশ্বয গুরুতর দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন—'মহাশয় আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্বর্য কোথা হইতে আসিল।'

বশিষ্ঠ বলিলেন—'মহারাজ, আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার নাম নন্দিনী, তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন।'

বিশ্বামিত্র বলিলেন—'তবে অল্প উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমায় সেই গোরুটি দিতে হইবে।'

বশিষ্ঠ বলিলেন—'আমি যখন তাহার মার কাছ হইতে তাহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে. উহাকে কখন কাহাকেও দিব না।'

বশিষ্ঠ গোরু দিলেন না—বিশ্বামিত্র আপনার সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন যে, গোরু কাড়িয়া লইয়া চল। তখন বশিষ্ঠ কি করেন—ব্রাহ্মণস্য বলং ক্ষমা। কিন্তু নন্দিনীকে কাড়িয়া লইয়া যায়, কার সাধ্য—নন্দিনীর

প্রতি হুঙ্কারে অগণিতসংখ্যক সেনা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। বশিষ্ঠ তাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইলেন।

বাহুবল, বিদ্যাবলের কাছে পরাজিত হইল। তার পর এখন, বিদ্যাবল ধর্মবলের কাছে পরাজিত হইলেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়—বাল্মীকির জয় ঘটিয়া যায়। কিন্তু নবীন গ্রন্থকার—অব্যয়িত প্রতিভার বলে মহাবলবান্—এ সোজা পথে যাইতে ঘৃণা করিলেন। আমরা এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে লেখকের গতিকে দৃপ্তসিংহের গতির সঙ্গে মনে মনে তুলনা করিয়াছি।

বিশ্বামিত্র দেখিলেন, 'ধিক বলং ক্ষত্রিয় বলং—ব্রহ্মতেজোবলং বলং'—তিনি তখন সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে তপস্যা করিতে গেলেন—তাঁহার কঠোর তপস্যায় দেবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—ব্রহ্মা বর দিতে আসিলেন। বিশ্বামিত্র চান, 'ব্রাহ্মণত্ব'। কিন্তু বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রেই হউক, আর যাই হউক, ব্রহ্মা কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব দিলেন না। বিশ্বামিত্র কিছুতেই অন্য বর পাইলেন না—ব্রহ্মাকে ও ব্রহ্মর্ষিগণকে হাঁকাইয়া দিলেন। বলিলেন—

'তোমরা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্ব প্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোসামোদ ও তপস্যা আর করিব না, আমি নূতন পৃথিবী নির্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। রাখ দেখি তোমরা কেমন পার।'

তপোবলে বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে দুঃখ রহিল না—ব্রাহ্মণ রহিল না। বিশ্বামিত্র তাহার নিয়ন্তা। পাঠক দেখিবেন যে, গ্রন্থকারের বিশ্বামিত্র এখন আর বিশ্বামিত্র নহেন—এখন তিনি বশিষ্ঠ। এখন তিনি বাহুবল নহেন—এখন বিশ্বামিত্র তপোবল, বিদ্যাবল। নন্দিনীর হুঙ্কারে সাগরবৎ সেনা সকল সৃষ্ট হইয়াছিল—বিশ্বামিত্রের ইচ্ছায় নূতন সৌরজগৎ—সৃষ্টি হইল। বিশ্বামিত্রকে বশিষ্ঠ করিয়া, গ্রন্থকার আবার তখনই তাঁহাকে বাল্মীকির পথে আনিতেছেন। বিশ্বামিত্র নূতন জগতের নিয়ন্তা—কিন্তু মনুষ্য। মনুষ্য বলিয়া, জন স্টুয়ার্ট মিল, একদিন কাঁদিয়াছিলেন, 'সব হইল—কিন্তু সুখ কই?' বিশ্বামিত্রও এখন কাঁদিলেন, 'সব হইল, কিন্তু সুখ কই?' সুখের জন্য পৃথিবী হইতে নিজ পুরী ও আত্মীয় স্বজন সহিত কান্যকুব্জনগর উঠাইয়া লইয়া আপনার সৃষ্টিতে চলিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবল ফুরাইয়া গিয়াছিল,

কিছুদূর গিয়া পুরী আর যায় না—পড়িয়া যায়—ব্রহ্মা ধরিয়ানামাইয়া লইলেন। তার পর, বিশ্বামিত্র নিজে স্বীয় সৃষ্টিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া অজ্ঞান অবস্থায় শূন্য হইতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন।

এদিকে বাল্মীকি, ঋভুদিগের গান শুনিয়া অবধি দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন তিনি পরের দুঃখে বড় কাতর। পরের দুঃখে কাতর বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে পবিত্রতা জন্মিল। সেই কাতরতাই নীতি—তাহার প্রকাশ কবিত্ব। পরের প্রতি প্রীতিমান হইয়া বাল্মীকি হৃদয়ে কবি হইয়াছিলেন—ভারতীর কৃপায় তিনি বাক্যেও কবি হইলেন। যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকি প্রতিভা'—পড়িয়াছেন, বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্ররাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।

বাল্মীকি এখন পৃথিবীর নীতিশিক্ষক—প্রথম কবি। তিনি পৃথিবীময় গান করিয়া বিচরণ করেন—সমবেদনা শিখান—তিনি ভাই ভাই মন্ত্রের প্রকৃত সাধক। সম্প্রতি কৌশাম্বীনগরে রাজা যজ্ঞ করিতেছেন—সেইখানে সমস্ত পৃথিবী আহুত ও সমবেত। একটা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে—একদল যজ্ঞ করিতে দিবে আর একদল দিবে না। দুইদলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। নিবারক একা বাল্মীকি। বাল্মীকির অস্ত্র—অশ্রুজল,—বাণীদত্ত বীণা। এই সময় অনন্ত শূন্য হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে চেতনাশূন্য বিশ্বামিত্র আসিয়া সেই যজ্ঞকুণ্ডে পড়িলেন। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া লোকে ভীত ও বিস্মিত হইল—বাল্মীকির বাক্যবল বাড়িয়া গেল—তাঁহার সকরুণ গানে সমস্ত চরাচর বিমুগ্ধ হইল—লোকের মন ফিরিল—বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া গেল—বাল্মীকির জয় হইল।

ব্রহ্মার কৃপায় বিশ্বামিত্র জীবন পাইলেন। বিশ্বামিত্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মার স্তুতি ও আপনার অপরাধ স্বীকার করিলেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকিতে মিল হইল। বাহুবল, বিদ্যাবল, ধর্মবল একত্রিত হইল। ব্রহ্মা ঋষিত্রয়কে আদেশ করিলেন যে—

'সর্বলোকমধ্যে ঐক্য স্থাপন মানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখ।' বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

তখন তিনজন ঋষি রামায়ণ 'Plot' নির্মাণ করিতে বসিলেন। বশিষ্ঠ

বলিলেন, 'রামকে ধার্মিক কর।' বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'তাঁহাকে রাজনীতিজ্ঞ কর।' বাল্মীকি বলিলেন, 'আমি রামকে আদর্শ মনুষ্য করিব।'

রামায়ণ প্রণীত হইল। তারপর রাম অবতীর্ণ হইলে রামায়ণ অভিনীত হইল। তার পর রামায়ণ গীত হইল—নারায়ণ বৈকুণ্ঠে গেলেন। শেষ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার আদেশে দেহত্যাগ করিলেন। বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিমধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন—বিশ্বামিত্র ঋভুদিগের নেতা হইলেন। ব্রহ্মা, বাল্মীকিকেও স্বর্গযাত্রার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বাল্মীকি তখন গেলেন না—তাঁহার কার্য শেষ হয় নাই, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব তখনও জন্মে নাই। শেষে ব্রহ্মার আদেশে তিনি নভোমণ্ডলে বিরাট মূর্তি দর্শন করিলেন। বাল্মীকি সেই বিরাট মূর্তির স্তুতিবাদ করিলেন।

'নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তুতে সর্বত এব সর্ব
অনন্তবীর্যো মিতবিক্রমস্তং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোসি সর্বঃ ॥'

'তখন ব্রহ্মা বলিলেন 'বাল্মীকি! তুমি দেখ সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও পৃথিবীময় এই সাম্য ভ্রাতৃভাব ও একতি গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।'

বিরাটের মুখ হইতে বিরাটস্বরে ধ্বনি হইল 'জয়!'

পাঠক গ্রন্থের পরিচয় পাইলেন, এখন ইহাকে যাহা বলিতে হয়, তিনি নিজেই বলুন। অনেকে বোধ হয় বলিবেন, এ সকল কেবল পৌরাণিক কথা—আমাদের জানা আছে। যাঁহারা আরও বাহাদুর তাঁহারা বলিবেন যে, এ কেবল গাঁজা। ছায়াপথ ফাটিয়া দ্বিধা হইল—নন্দিনীর প্রতিহুঙ্কারে সহস্র সহস্র সেনা সৃষ্ট হইতে লাগিল, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার ন্যায় দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এ সকল গাঁজা নয় ত কি? যাঁহারা আর একটু সুশিক্ষিত, তাঁহারা বলিবেন, এ রূপক। নন্দিনীর প্রতিহুঙ্কারে সৈন্যের সৃষ্টি, ইহার অর্থ সরস্বতীর অনুকম্পায় জড়বলের উপর মনুষ্যের আধিপত্য স্থাপন। নন্দিনীর এক হুঙ্কারে বারুদের সৃষ্টি, আর এক হুঙ্কারে ধূমযন্ত্র ষ্টীমের কল, বাষ্পীয়পোত, রথ, ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি কেহ রূপক বলিতে চান, আমরা তাঁর সঙ্গে বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করিব না। আমরা বলিব. ইহা যদি রূপক হয়, তবে স্পেন্সরের রূপকের মত, রূপক কাব্যে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার রূপকত্ব কেহ দেখিবে না।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অনেক দোষ আছে। কাব্যের গঠন সকল স্থানে কৌশলযুক্ত নহে। যথা, বিদ্যাবলের পরাজয়, বশিষ্ঠে নহে, বিশ্বামিত্রে। বাল্মীকির গীতগুলিতে কারিগরি নাই। কিন্তু আমরা এ সকলের কথা বলিব না। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন কিরণে ডুবিয়া যায়, এও তাই। ইহার গুণ সকল বলিয়া উঠি এমন সময়ও নাই। কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ—কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমাময়ী। ঋভুদিগের আগমন, বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি, বিশ্বামিত্রের অধঃপাত, কৌশাম্বীর যজ্ঞ, অন্তে বিরাট দর্শন,—যাহা দেখ সকলই মহিমাময়ী কল্পনায় সমুজ্জ্বল। সর্বাপেক্ষা এই বিশ্বামিত্রই ভয়ানক মূর্তি। রাবণ বা বৃত্রাসুর যে ছাঁচে ঢালা এ সে ছাঁচে ঢালা। আমরা রামায়ণের রাবণ বা পুরাণের বৃত্রের কথা বলিতেছি না। মধুসূদনের রাবণ—হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর। সে ছাঁচ বড় ভারি ছাঁচ। কিন্তু মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কাব্যের ধাত্রী ইংরেজি সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের পক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাপা জোকা বেড়া গোড়া। রাবণ ও বৃত্র প্রকাণ্ড মূর্তি হইলেও মাপা জোকা বেড়া গোড়া। কেবল সেই প্রাচীন পুরাণ প্রণেতারা অপরিমেয়, অনন্ত বিরাটমূর্তি সৃষ্টি করিতে জানিতেন, পৃথিবীতে আর কোথাও এমন কোন জাতি জন্মে নাই যে সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় মানসিকশক্তি ধরিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংরেজিতে সুশিক্ষিত হইয়াও প্রাচীন আর্যশাস্ত্রে অতিশয় সুপণ্ডিত, তাঁহার মানসিক শক্তির পরিপোষণে পাশ্চাত্য ও আর্য উভয়বিধ সাহিত্যই তুল্যরূপে প্রবেশ করিয়াছে। এবং এই বিশ্বামিত্র প্রণয়ণকালে তিনি প্রাচীন আর্যসাহিত্যের বশবর্তী হইয়াছিলেন। যাঁহাদের রুচি পাশ্চাত্য সমালোচকদিগের ব্যবস্থানুযায়ী, তাঁহাদের কাছে এ বিশ্বামিত্রের কোন আদর হইবে না।

যেমন কল্পনা তেমন বর্ণনা। বর্ণনার আমরা অনেক পরিচয় দিয়াছি। ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলি। এই বঙ্গদর্শনে অনেকবার এ পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, সুতরাং সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এমন আমাদের স্মরণ হয় না।

রুক্মপার্শ্ব নকুল

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সমাপন হইল। দ্বিজগণ, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, দীন, অন্ধ, দরিদ্র প্রভৃতি সকলে পরিতৃপ্ত হইল; যুধিষ্ঠিরের মহাদান সকল দিকে ঘোষিত হইল; যুধিষ্ঠিরের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এমন সময়ে সেখানে নীলচক্ষু রুক্মপার্শ্ব এক নকুল আসিয়া বজ্রতুল্য শব্দ করিল। সেই শব্দে পশু-পক্ষিসকল বিত্রস্ত করিয়া মনুষ্যবাক্যে সে গর্বিতবচনে বলিতে লাগিল—'হে রাজগণ! উঞ্ছবৃত্তি বদান্য কুরুক্ষেত্র নিবাসী এক ব্যক্তির শক্তুপ্রস্থ দানের তুল্য আপনাদিগের এই যজ্ঞ নয়।' সেই নকুলের এই বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ সকলে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন নকুলের নিকট সমাগত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ-গণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'তুমি কোথা হইতে এই সাধুসমাগম যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়াছ? তুমি এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ, কিন্তু তোমার বল ও শাস্ত্রজ্ঞান আমরা জানি না। আমরা শাস্ত্রানুগামী হইয়া বিবিধ যজ্ঞীয় কৃতের দ্বারা এই যজ্ঞ যথাশাস্ত্র ও যথান্যায় সম্পন্ন করিয়াছি। পূজার্হ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রানু-সারে বিধিবৎ পূজিত হইয়াছেন। অগ্নিতে মন্ত্রযুক্ত আহুতি প্রদান করিয়াছি এবং দেয় বস্তু অমৎসরতার সহিত দত্ত হইয়াছে। বহুবিধ দানের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ, সৎ যুদ্ধের দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ, শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণ, পালনের দ্বারা কৃষীবল, কামনা-পূরণের দ্বারা বরস্ত্রীগণ, অনুগ্রহের দ্বারা শূদ্রগণ এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ দত্তাব-শিষ্টের দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছেন। শৌচের দ্বারা জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও রাজগণ, পবিত্র হবির দ্বারা দেবগণ এবং রক্ষণের দ্বারা শরণাগত ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অতএব যাহা শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ তাহা আমরা কৌতূহলবশতঃ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইহার যথার্থ তথ্য যাহা, তাহা সত্য সত্য ব্রাহ্মণগণের নিকট ব্যক্ত কর। তোমাকে প্রাজ্ঞ এবং তোমার বাক্য শ্রদ্ধার উপযুক্ত বোধ হইতেছে এবং তুমি দিব্যরূপে শোভমান, এই জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।'

ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে সেই নকুল হাসিয়া বলিতে লাগিল—'হে দ্বিজগণ! আমি যে বলিয়াছি এবং তোমরাও শুনিয়াছ যে তোমাদের এই যজ্ঞ শক্তুপ্রস্থের তুল্য নয়, একথা আমি মিথ্যাও বলি নাই,

অথবা দর্পপ্রযুক্তও বলি নাই। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! তোমাদিগের নিকট আমার ইহা অবশ্য কথিতব্য। অতএব আমি উঞ্ছবৃত্তি বদান্য কুরুক্ষেত্রনিবাসী ব্রাহ্মণের যে অদ্ভুত উৎকৃষ্ট কর্ম দেখিয়াছি ও অনুভূত করিয়াছি, তাহা যথার্থ বলিতেছি তোমরা অব্যগ্রমনা হইয়া শ্রবণ কর। তন্নিবন্ধন সেই ব্রাহ্মণ ভার্যা, পুত্র, স্নুষা সহিত স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আমার এই শরীরের অর্ধভাগ কাঞ্চনময় হইয়াছে।'

নকুল বলিতে লাগিল—'হে দ্বিজগণ! আপনাদিগের নিকট সেই ব্রাহ্মণদত্ত ন্যায়লব্ধ অল্প সামগ্রীর উত্তম ফল কীর্তন করিতেছি। ধর্মক্ষেত্র ও ধার্মিকগণ পরিবৃত কুরুক্ষেত্রে কপোতের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ভার্যা, পুত্র, স্নুষা লইয়া বাস করিতেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্মাত্মা এবং অক্লিষ্টকর্মা ছিলেন। তিনি পরিবারবর্গের সহিত দিবসের ষষ্ঠকালে আহার করিতেন। কোনও দিন বা ষষ্ঠকালেও তাঁহার আহার জুটিত না। সুতরাং সেদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন ষষ্ঠকালে তাঁহাকে আহার করিতে হইত। একদা তথায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। সেই ব্রাহ্মণের কিছুই সঞ্চিত দ্রব্য ছিল না। এবং দেশের শস্য ফুরাইয়া গেল। এমন সময় উপস্থিত হইল যে, ব্রাহ্মণের আর কিছুই ভোজনীয় রহিল না।

সকলে ক্ষুধাপীড়িত হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিল। একদিন শুক্লপক্ষে মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধাপীড়িত এবং রৌদ্রপীড়িত হইয়া তিনি ভক্ষ্য দ্রব্যের আহরণে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা কিছু পাইলেন না। অতএব পরিবারবর্গের সহিত ক্ষুধাপীড়িত হইয়া কৃচ্ছ্রপ্রাণ সেই ব্রাহ্মণ কালযাপন করিতেছিলেন। এমত সময়ে দিবসের ষষ্ঠকাল গত হইলে যবপ্রস্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হইলেন। তখন তাঁহারা কৃতজপাহ্নিক হইয়া এবং যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিয়া সেই যবপ্রস্থ হইতে শক্তু প্রস্তুত করিলেন। পরে সেই শক্তুপ্রস্থকে চারিজনের আহারার্থ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া আহার করিতে প্রস্তুত হইতে ছিলেন, এমত সময়ে সেখানে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া অতিথি হইলেন। তাঁহারা অতিথি প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিতচিত্ত হইলেন। এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বিশুদ্ধমনা, দান্ত শ্রদ্ধাদমসমন্বিত, অসূয়াশূন্য, জিতক্রোধ, সাধু এবং নির্মৎসর। তাঁহারা ধর্মজ্ঞ এবং মানমদক্রোধপরিশূন্য। অতএব ব্রাহ্মণেরা পরস্পরের নাম গোত্র জিজ্ঞাসা করার পর সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ আপন কুটীর মধ্যে আনয়ন করিলেন এবং পাদ্য, অর্ঘ্য

ও আসন প্রদান করিলেন। এবং কহিলেন 'হে প্রভু! এই বিশুদ্ধ শক্তু আমি নিয়মানুসারে উপার্জন করিয়াছি। যে দ্বিজোত্তম! ইহা আপনাকে আমি দিতেছি, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ইহা প্রতিগ্রহ করুন।' এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই অতিথি ব্রাহ্মণ শক্তুর চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া তাহা ভক্ষণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার তুষ্টি জন্মিল না। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অতিথিকে ক্ষুধাপীড়িত দেখিয়া কি প্রকারে তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিবেন এবং কি প্রকারে আহার সংগ্রহ করিবেন, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ভার্যা বলিলেন—'আমার ভাগও ইঁহাকে দাও। ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া যেখানে ইচ্ছা গমন করুন।' কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সাধ্বী ভার্যাকে ক্ষুধাপ্রপীড়িতা জানিয়া তাঁহার ভাগ গ্রহণ করিলেন না। সেই বিদ্বান দ্বিজশ্রেষ্ঠ আপনার সেই বৃদ্ধা ভার্যাকে ক্ষুধার্তা, শ্রান্তা, গ্লানিযুক্তা, তপস্বিনী, অস্থিচর্মাবশিষ্টা, কম্পমানা বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন 'হে শোভনে! কীটপতঙ্গপশুদিগেরও স্ত্রীসকল রক্ষণীয়া এবং পোষণীয়া। অতএব তুমি এরূপ বলিও না। পত্নীর অনুকম্পাতেই পুরুষ পুষ্ট ও রক্ষিত হয়। পিতৃগণের এবং আপনার ধর্মকামার্থ কার্য, শুশ্রূষা, কুলসন্ততি এবং ধর্ম ভার্যার অধীন। যে ব্যক্তি ভার্যা রক্ষণে অক্ষম, সে কর্মজ্ঞ নহে। সে মহৎ অযশ প্রাপ্ত হইয়া নরকে গমন করে।'

ব্রাহ্মণী ইহা শুনিয়া বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ! তোমার আমার ধর্মার্থ এক। অতএব অনুগ্রহ করিয়া শক্তুর এই চতুর্থ ভাগ গ্রহণ কর। স্ত্রীলোকের সত্য, ধর্ম এবং গুণনির্জিত স্বর্গ এবং অভিলষিত বস্তু সমুদায়ই পতির অধীন। পতি স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। পতি পালন করেন বলিয়া পতি এবং ভরণ করেন বলিয়া ভর্তা। অতএব আমার শক্তু দান করুন। আপনি স্বয়ং জরাপরিগত, বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত, দুর্বল, এবং উপবাস পরিশ্রান্ত; আপনারও শক্তু দান করিয়াছেন।'

এই কথায় সেই উচ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সে শক্তু লইয়াও অতিথিকে বলিলেন যে 'হে ব্রাহ্মণ! এ শক্তুও আপনি পুনশ্চ গ্রহণ করুন।' অতিথি তাহা গ্রহণ করিয়া ভোজন করিলেন। কিন্তু পরিতুষ্ট হইলেন না। তাহা দেখিয়া উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ চিন্তাপর হইলেন।

তখন তাঁহার পুত্র বলিলেন—'মহাশয়। আমারও শক্তু গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। আমি ইহা পুণ্য জ্ঞান করি, এজন্য এরূপ করিতেছি। আপনি সর্বদা যত্নের সহিত আমার পরিপাল্য। বৃদ্ধ পিতার পালন সাধু ব্যক্তিগণ কামনা করিয়া থাকেন। বার্ধক্যে পিতার পরিপালন পুত্রের বিহিত কর্ম, ইহাই ত্রিলোকে চিরপ্রসিদ্ধা শ্রুতি।'

তাহার পিতা বলিলেন—'আমার সহস্র বৎসর বয়স হইলেও তুমি আমার কাছে বালক। বালকদিগের ক্ষুধা অতিশয় বলবতী হয়, ইহা আমি জানি। আমি বৃদ্ধ, ক্ষুধা সহ্য করিব। বৎস! তুমি বলবান হও। আমার প্রাচীন বয়স, এজন্য ক্ষুধা আমাকে পীড়িত করিতে পারে না। আর দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছি, এজন্য মরণকেও ভয় করি না।' তখন ব্রাহ্মণকুমার বলিল—'আমি আপনার পুত্র। ইহাই শ্রুতি যে, পুত্র রক্ষা করে বলিয়াই পুত্র। আপনিই পুত্র ইহা স্মৃতি। অতএব আপনি আপনার দ্বারাই আপনাকে রক্ষা করুন।' তখন তাহার পিতা বলিলেন, 'হে পুত্র! রূপে তুমি আমার সদৃশ এবং শীলে ও দমেও বটে। তোমাকে বহুধা পরীক্ষা করিয়াছি, অতএব তোমার শক্তু আমি গ্রহণ করিলাম।' ইহা বলিয়া, প্রীতমনে সেই দ্বিজসত্তম পুত্রের শক্তু লইয়া অতিথি ব্রাহ্মণকে সহাস্যে প্রদান করিলেন। সে শক্তু ভোজন করিয়াও অতিথি তুষ্ট হইলেন না। ধর্মাত্মা উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইলেন। তখন তাঁহার সাধ্বী পুত্রবধু ব্রাহ্মণের হিতকামনা করিয়া আহ্লাদপূর্বক আপনার শক্তু শ্বশুরকে দিয়া বলিতে লাগিলেন—'আমার এই শক্তু লইয়া অতিথিকে প্রদান করুন। আপনার প্রসাদে আমার অক্ষয়লোকপ্রাপ্তি হইবে।'

তাঁহার শ্বশুর উত্তর করিলেন—'তোমাকে বাতাতপশীর্ণাঙ্গী, বিবর্ণা এবং সুব্রতাচারে কৃশা ও ক্ষুধাবিহ্বল চেতসা দেখিতেছি। অতএব তোমার শক্তু আমি কি প্রকারে গ্রহণ করিব? তাহা করিলে আমি ধর্মোপঘাতক হইব। অতএব হে কল্যাণি! তুমি আর কিছু বলিও না। তুমি শৌচশীল-তপোন্বিতা, কৃচ্ছ্রবৃত্তি এবং ষষ্ঠকালীন ভোজনব্রতচারিণী; তোমাকে নিরাহারে থাকিতে কি প্রকারে দেখিব? তুমি বালিকা এবং ক্ষুধার্তা নারী, উপবাসে পরিশ্রান্তা এবং কুটুম্বকন্যা। অতএব তুমি আমার সতত রক্ষণীয়া।' স্নুষা বলিল—'আপনি আমার গুরুর গুরু, দেবতার দেবতা, দেবাতিদেব। অতএব হে প্রভু! আমার শক্তু গ্রহণ করুন। দেহ, প্রাণ ও ধর্ম গুরুশুশ্রূষার্থ। এবং আপনার প্রসাদে আমার শুভলোকপ্রাপ্তি হইবে। আমাকে দৃঢ়ভক্তিমতী জানিযা, অথবা আমি আপনারই, ইহা জানিয়া, আমার শক্তু গ্রহণ করুন।'

তখন শ্বশুর বলিলেন—'তুমি এই শীলবৃত্তের দ্বারা নিত্য সাধ্বীস্বরূপা প্রতিপন্না হইয়া থাক। তুমি ধর্মপরায়ণা ও গুরুর প্রতি ভক্তিমতী। অতএব হে মহাভাগে! তোমাকে ধর্মপরায়ণাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তোমার শক্তু গ্রহণ করিব। তুমি বঞ্চনার যোগ্যা নহ।' ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার

শক্তু লইয়া অতিথিকে প্রদান করিলেন। তাহাতে তিনিও সন্তুষ্ট হইলেন।

সেই অতিথি ব্রাহ্মণ স্বয়ং পুরুষরূপধারী ধর্ম। তিনি বাগ্মিতার সহিত দ্বিজশ্রেষ্ঠকে প্রীতমনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, 'হে দ্বিজসত্তম! তোমার ন্যায়োপার্জিত পবিত্র ধর্মতঃ যথাশক্তি দানে আমি প্রীত হইয়াছি। তোমার এই দান স্বর্গে স্বর্গনিবাসিগণ কর্তৃক ঘোষিত হইতেছে। ঐ দেখ, গগন হইতে পুষ্পবৃষ্টি ভূতলে পতিত হইতেছে। দেবর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্বগণ এবং দেবপুরঃসর দেবদূতগণ তোমার এই দানে বিস্মিত হইয়া তোমার স্তব করিতেছেন। ব্রহ্মলোকচারী! ব্রহ্মর্ষিগণ বিমানস্থ হইয়া তোমার দর্শনকামনা করিতেছেন। হে দ্বিজর্ষভ! তুমি স্বর্গে গমন কর। পিতৃলোকগত তোমার পিতৃগণকে তুমি তারিত করিলে। তুমি ব্রহ্মচর্য, দান, তপস্যা, অবিমিশ্র ধর্মে বহু যুগাতিপাত করিয়াছ। অতএব তুমি স্বর্গে গমন কর। হে সুব্রত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তোমার পরাশ্রদ্ধাযুক্ত তপস্যায় এবং দানে দেবগণ প্রীত হইয়াছেন। তুমি এই কৃচ্ছকালে বিশুদ্ধচিত্তে যে দান করিয়াছ, তাহাতে স্বর্গ বিজিত হইয়াছে। ক্ষুধাতে প্রজ্ঞা নষ্ট করে, ধর্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। যাহার জ্ঞান ক্ষুধাতে নষ্ট হইয়াছে, তাহার ধৈর্যও থাকে না। যে বুভুক্ষাকে জয় করে, সে নিশ্চিত স্বর্গ জয় করে। যেখানে দান প্রবৃত্তি থাকে, সেখানে ধর্ম কখনও অবসন্ন হয় না। তুমি সুতস্নেহ বা কলত্রস্নেহের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, ধর্মই গুরু বিবেচনা করিয়া তৃষ্ণাকে গণনা করিলে না। মনুষ্যের দ্রব্যার্জন সূক্ষ্ম ব্যাপার। উপযুক্ত পাত্রে দান করা, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। উপযুক্ত কালে দান তাহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রদ্ধাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বর্গদ্বার অতি সূক্ষ্ম। মনুষ্য মোহবশতঃ তাহা দেখিতে পায় না। লোভবীজ তাহার অর্গলস্বরূপ। ক্রোধ কর্তৃক তাহা রক্ষিত। অতএব তাহা অতি দুরাশদ। যে পুরুষেরা জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, যোগযুক্ত, তপস্বী, ব্রাহ্মণ এবং যাঁহারা যথাশক্তি দান করেন, তাঁহারাই তাহা দেখিতে পান। যাঁহার শক্তি সহস্র পরিমিত, তিনি শত দান করিলে যে ফল হয়, যাঁহার শক্তি শত পরিমিত, তিনি দশ দান করিলেই সেই ফল হয়। শক্তি অনুসারে কেবল জলদান করিলেও সেই ফল হয়। রন্তিদেব নামে রাজা দরিদ্রাবস্থায় শুদ্ধচিত্তে কেবল একটু জল দান করিয়াই স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। হে বৎস! মহামূল্য দানে ধর্ম প্রীত হন না, ন্যায়লব্ধ সামান্য বস্তু শ্রদ্ধাপূতচিত্তে দান করিলে সন্তুষ্ট হন। নৃগ রাজা ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গো দান করিয়াও, একটি পরকীয় গো দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নরকগমন হইয়াছিল। উশীনরপুত্র শিবিরাজা

আত্ম-মাংস দান করিয়া পুণ্যবানগণের প্রাপ্য যে লোক তাহা লাভ করিয়া আনন্দভোগ করিতেছেন। ঐশ্বর্য মনুষ্যের পুণ্যের কারণ নহে। সজ্জনগণ আপনার শক্তিতে যাহা সদুপায়ে উপার্জন করেন, বিবিধ যজ্ঞ সেই ন্যায়লব্ধ ধনের তুল্য পুণ্যের কারণ নহে। ক্রোধ দানফল নষ্ট করে। লোভ থাকিলে কেহ স্বর্গে যাইতে পারে না। ন্যায়বৃত্তি দ্বারাই দানবিৎ স্বর্গপ্রাপ্ত হন। বিপুল দক্ষিণাযুক্ত বহুতর রাজসূয় যজ্ঞ, অথবা বহুতর অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল তোমার এই কার্যের তুল্য নহে। তুমি এই শক্তুপ্রস্থের দ্বারা অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছ। অতএব হে বিপ্র! তুমি সুখে নির্মল ব্রহ্মভবনে গমন কর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমাদের সকলের জন্য দিব্যযান উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা যথাভিলাষ আরোহণ কর। আমি ধর্ম, আমাকে দর্শন কর। তুমি দেহের উদ্ধার করিয়াছ। ইহলোকে তোমার কীর্তি স্থিরা থাকিবে। ভার্যা, পুত্র, পুত্র-বধূ সঙ্গে তুমি স্বর্গে গমন কর।

ধর্ম এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণ ভার্যা, পুত্র ও স্নুষার সহিত দিব্যযানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে, আমি গর্তের ভিতর হইতে বাহির হইলাম। সেই শক্তুর গন্ধে, ক্লেদে ও জলে এবং সাধুর দানলব্ধ দিব্যপুষ্পের বিমর্দে এবং সেই ব্রাহ্মণের তপস্যাফলে, আমার শিরোদেশ কাঞ্চনময় হইল। এবং সেই সত্যাভিসন্ধ ব্রাহ্মণের শক্তুদানে আমার শরীরার্ধও স্বর্ণময় হইল। হে বিপ্রগণ! তোমরা তাঁহার সেই বিপুল তপস্যার ফল এই দর্শন করিতেছ! এক্ষণে আমার অন্য পার্শ্ব কি প্রকারে এইরূপ হইবে, তাহার জন্য আমি তপোবন সকল ও যজ্ঞ সকল দেখিয়া বেড়াইতেছি। ধীমান্ কুরুরাজের এই যজ্ঞের কথা শ্রবণ করিয়া আমার বিস্তর আশা হইয়াছিল। কিন্তু কই, আমি ত কাঞ্চনীকৃত হইলাম না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি তাই হাসিয়া বলিতেছিলাম যে, এই যজ্ঞ কোন প্রকারেই সেই শক্তুপ্রস্থের তুল্য নহে। আমি শক্তুপ্রস্থের কণায় কাঞ্চনীকৃত হইয়াছিলাম, অতএব আমার বিবেচনায় এই মহাযজ্ঞ তাহার তুল্য নহে।' ব্রাহ্মণগণকে এই কথা বলিয়া নকুল অদর্শন হইল। ব্রাহ্মণেরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

[এই অনুবাদে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—স্বর্ণের বদলে রুক্ম, যবাদিচূর্ণ বা ছাতুর বদলে শক্তু এবং পুত্রবধূর পরিবর্তে স্নুষা।]

PREFACE*

One of the objects kept in view in this compilation has been to place before the student as great a variety of style as is possible in a small volume like the present. I have admitted on this ground, a few short extracts from the older poets, whose quaint and now antiquated style is as superior to that of their modern successors in vigor and raciness, as it is inferior to it in elegance and refinement.

I have also taken care that the matter should be equally varied, and should enable the young student to form some idea of ancient as well as modern Hindu thought and culture. The passage specially translated from the 'Mahabharata', Pandit Iswar Chandra Vidyasagar's beautiful renderings from Kalidasa, Babu Bhudeb Mukherjee's masterly studies of modern Bengali life, and Babu Rajkrishna Mukherjee's lucid expositions of the most advancsd European thought in his singularly charming style, will present the student with reading as varied as useful, and with instruction which, although almost indispensably necessary to him, he cannot expect to obtain from his English Text-books.

There are many who do not accept the views put forward in some of these extracts, but it is impossible to find anything in Bengali Literature, or in any literature, to which all parties will subscribe. The best way of training the minds of young men is not to restrict them to any particular groove of thought. Among the results of education, scarcely any thing is more valuable than the capacity to consider

[* বঙ্কিমচন্দ্র সংকলিত ও সম্পাদিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষার বাংলা সংকলন গ্রন্থে তাঁর লেখা preface বা ভূমিকা।]

questions that arise from different and even opposite points of view. I have not therefore thought it proper to confine the extracts to what will meet with universal acceptance, to the exclusion of what will best benefit the student.

A word about Grammar. Bengali Grammar is still in some respects in an unsetteled state. Purists insist on a rigid adherence to the rules of Sanskrit Grammar in all cases to which they can be made applicable, while others contend that whatever is sanctioned by the usage of the best writers is admissible. In the present volume I have allowed each writer to retain his own Grammar, confining my own duty as Editor to the correction of obvious errors and misprints.

I have admitted extracts from my own writings with some reluctance. They had a place in all previous selections ; their exclusion now for the first time would have required some explanation, and I had none to offer.

The student will probably find the present volume of selections more difficult than any of its predecessors. But students who do not take the trouble of acquiring a classical language must be prepared to give to their own Vernacular, more time and attention than they have hitherto done. They have hitherto enjoyed an unfair advantage over those who take up a classical language, and they must not complain now that the balance is sought to be redressed.

Bankim Chandra Chatterjee

CASTE IN LOWER BENGAL

[Some time about 1872., Bankim Chandra Chatterjee wrote a note entitled 'Caste in Lower Bengal', evidently as his comment upon the view held on caste by the Inspector General of Registration who conducted the first census operation of 1872. This note was never published, but a small part of his note was incorporated in the census report of Bengal, 1872. The manuscript in Bankim Chandra's own handwriting lay unnoticed somewhere in Midnapur, where he was posted about that time as Deputy Magistrate. Eventually it reached the hands of Shri Sajani Kanta Das, formerly President of the Bangiya Sahitya Parishad and a well-known writer of Bengal.

It is of great significance that Bankim Chandra, at that early date, recognized that the mutual relationship of castes to one another was the most important element of that organization. He was also of opinion that the system had grown by the absorption of various tribal communities into Aryanised society. It was his opinion again that, after absorption, the different communities who formed the caste system were assigned special occupations. The occupational aspect of caste was, thus, in his opinion a secondary feature.

As the note of Bankim Chandra is of special historical significance, it is being printed in its entirety, accompanied by a photographic reproduction of the first page of his manuscript.*—*Editor*.]

The most important point in connection with Hindu castes is the question of their mutual relation to each other. The fact that each caste has a calling of its own is of less importance—it is not the cause that led to division of the

[* Man in India পত্রিকার সম্পাদক তাঁর পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত করলেও আমরা আর প্রতিলিপি এখানে দিলাম না।]

people into castes, but merely a consequence of that division. Caste, at least in its first stage, was merely the consequence of ethnical differences. Many of the great Hindu castes of Bengal represent *each a great aboriginal race*, absorbed into Hinduism and transformed into a Hindu caste. The transformation is an easy process, and can even now be seen going on in some places. The Koch and Rajbansis are a recent example.

A proper study of the Hindu castes ought therefore to enable us to identify them with the ancient historical tribes whose representatives they now are. I shall confine these notes to this aspect of the question.

Such identification is possible in a large number of cases. The first illustration which I shall offer of such possibility will be the case of the Pundras, referred to by Mr. Beverley in the last para of section 455 of the census report of 1872, with regard to which my remarks seem to have been to a certain extent misunderstood.

What I then meant and now mean to say is, that the Pundras were a great historical Indian tribe, and that they have been absorbed into the Bengali population, and now form a part of it. First as to their history. They were known to the Aryan conquerors of India as a hostile race, as early as the *Aitareya Brahmana*, in which they are enumerated with the Andhras, Pulindas and other aborigines. We find them described also in the *Kishkindhya Kanda* of the Ramayana, from which they would appear ro have been a Dravidian race inhabiting southern India. The tide of Aryan conquest pressed on them, as on other Dravidians, even in the Deccan ; and like other Dravidians they retired to the hills and plateaus of western Bengal (Sonthalia) pressing gradually eastwards under the pressure of other tribes. In the Mahabharata, we find the Pandavas passing across them into eastern Bengal. Hiouen-Thsang so late as the seventh century visited their capital Paundra Vardhana in western Bengal, possibly Pandua in Maldah. Wilson, in

a note to his translation of the Vishnu Purana, thinks that the country of the Pundra included the following districts, "Rajshahi, Dinajpoor and Rungpoor, Nadiya, Beerbhoom, Burdwan, part of Midnapoor and Jungle Mahals, Ramgarh, Pachete, Palamow, and part of Chunar."

Now it is precisely in this locality that we still meet with Hindu castes bearing the same name as the old tribe ; the same name, of course, changed by transliteration and phonetic corruption in (strict ?) accordance to known rules which govern such changes of Sanskrit words imported into the vernacular. Sanskrit words ending in *ṇda* (ণ্ড) change the *ṇda* ণ্ড into ḍ (ড়) the nasal sound being transferred to the preceding vowel. Thus Bhāṇda (ভাণ্ড) changes into Bhāñḍ (ভাঁড়), and Suṇda (শুণ্ড) into Suñḍ (শুঁড়). Following exactly the same process, we may expect the Sanskrit Pundra (পুণ্ড্র) to become পুড, for the r must drop after ḍ.

Now we find in western Bengal (Moorshidabad) a caste bearing this very name. In Mr. Beverley's Census Report the word is written Pura, but I have resided in the district for several years, and know that the name is Puñḍa (পুঁড) not Pura (পুর).

The same Sanskrit word may assume more than one form in the Bengali according to the source through which it is received, for it may be received direct from the Sanskrit, or through one of the Prakrits, or through a modern vernacular like the Hindi. Received direct from the Sanskrit, Chandra (the moon) becomes Chandar (চন্দর) in colloquial Bengali, received through the Hindi, it becomes Chānd (চাঁদ). Just as the Sanskrit Chandra becomes Chandar in colloquial Bengali, so Pundra becomes Pundar in colloquial Bengali. This is a second form which it may take according to known laws of phonetic change. Now, in many names derived from places etc. an *i* is added often quite unnecessarily, as Bengal-i, Santal-i. By the same process, we have from Mundra, first Mundar and then Mundari. This is another caste found inhabiting the same locality as the Pundar.

Lastly, just as Chandra in Sanskrit also changes into Chand in Bengali, Pundra in Sanskrit may change to Pod in Bengali, the *r* is dropped, and the penultimate vowel is broadened by 'Guna' (?). The only difference is in dropping the *n* in Pod, for special reasons.

Thus the Pund, (Puras), Pods, and Pundaris bear the same name, only modernized as the great aboriginal tribe inhabiting in ancient times the same locality as they do at present, and there ought to be no doubt of their identity. Pundarikaksha is only an euphemism for Pundari and Pod.

Another illustration is furnished by the Kaibartas, numerically one of the most important castes in Bengal. Amara Sinha gives 'Dasa' as one of the other names by which this caste is known. 'Dasa' is the name given in Manu to the race sprung from the Nishada and the Ayogavi. The Ayogavi was a cross between a Vaisya and a Sudra. The Nishada was an unmixed non-Aryan. The Kaibartas are thus a non-Aryan race, with some Aryan blood in their veins obtained through the mother's side.

I can only make suggestions in regard to the origin of some (of ?) other obviously non-Aryan castes. The affinities of the *Doms* of Bengal, with a tribe of the same name in Santhalistan, as well with the Dumis of Nepal need some attention.

The connection of the Bengali Kauras with a large number of non-Aryan tribes of nearly the. same name, viz. Korewa, Kharwar, Kharia, Kaur, Kirati, etc. may also be suggested. The Hindu Mals and Malos in spite of the difference in their present pursuits (are ?) offshoots of the same race—the aboriginal Mals and Mal Paharias, the Malii of Pliny. And so on.

When thus there are castes which are the direct representatives of pure aborigines absorbed into Hinduism, there are on the other hand mixed races, born of inter-mixture between Aryans and non-Aryans, a class of whom, the Chandal is a

well known example. Lastly, there are pure Aryans, like the Brahmans, Vaidyas, Kayasthas, etc. Any classification of Hindu castes in the Census report which may be accepted ?) in the Census report ought to be based upon this distinction of (1) Aryan, (2) non-Aryan and ( ) mixed castes. The division adopted by Mr, Beverley into (1) Aboriginal tribes, (2) Semi-Hinduized aborigines, and (3) Aryans was unscientific. As a scientific classification of caste on an ethnical basis is the very first step towards a proper understanding of castes, and as an unscientific classification in an official paper like the Census report would be misleading, I have drawn up this note mainly with a view to suggest its rectification. The corrected classification should stand thus :

I. Aboriginal tribes

II. Hindu castes

(1) Aryan.

(2) Mixed Castes.

(3) Non-Aryan.

APPENDIX

The Pods, who are so numerous in the 24-Pergunnahs, Baboo Bunkim Chunder Chatterjee indentifies with the Pauras or Puras of Moorshedabad. "Both Pods and Pauras", he writes, "exhibit in physical appearance a marked approach to the Turanian and aboriginal type. A Pod, when inclined to use fine language, calls himself a Pundari-kaksha, which is a compound Sanskrit word meaning lotus-eyed,—a name which is also used to designate Vishnu. As applied to the Pods, it is simply meaningless. I am inclined to derive the name and the caste from the Paundras, The Paundras were and ancient people inhabiting Lower Bengal from Mon-

ghyr to Jessore in the age of the Mahabharat. The Chinese traveller Hiouen-Thsang mentions Paundra Vardhana, evidently the capital of this region. General Cunnigham identifies it with Pubna, though there are perhaps better reasons for identifying it with Pandua in Maldah. In the Mahabharat this people is classed with wild and aboriginal races, such as Saka, Darada, Barbara, &c. Undoubtedly the tide of Aryan immigration had not flowed largely into Bengal at so remote a period as the compilation of the Mahabharat, and the Paundras were therefore as certainly an aboriginal people. I believe both the Pods and the Pauras to be remnants of this ancient people." As I have already remarked, there seems to be considerable doubt as to what the Pundaris really are, and further inquiry seems necessary to establish their relationship to the Pods,

Report on the Census of Bengal 1872 by Beverley, Inspector General of Registration, Bengal. Calcutta : Printed at the Bengal Secretariat Press. 1872.

বিভিন্ন সূত্রে সংগ্রহ করে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি রচনা আমি এখানে প্রকাশ করলেও অনুমান হয়, তাঁর এইরূপ আরও কিছু রচনা এখনও তাঁর গ্রন্থাবলীভুক্ত না হয়ে বাইরে পড়ে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে,' এমন কি সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' ও 'ভ্রমরে' অধিকাংশ লেখার সঙ্গেই লেখকের নাম থাকত না। ঠিক এমনি বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত তাঁর জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'প্রচারে'ও অনেক লেখার সঙ্গে লেখকের নাম ছিল না। এই পত্রিকাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখক হিসাবে নামহীন বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র পরে ঐ সব পত্রিকা থেকে তাঁর স্বাক্ষরহীন বহু রচনাকেই নিজের গ্রন্থভুক্ত করে গেলেও, আরও কিছু রচনা তাঁর গ্রন্থভুক্ত না হয়ে ঐসব পত্রিকার পৃষ্ঠায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে।

বঙ্কিম জন্ম-শত-বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়, তার 'বিবিধ' খণ্ডে 'সাময়িক পত্রে মুদ্রিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা' নাম দিয়ে এই সম্পাদকদ্বয় বঙ্গদর্শন, ভ্রমর ও প্রচার থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু রচনা সংগ্রহ করে গ্রন্থভুক্ত করে যান। কিন্তু এঁদের নির্বাচিত ঐ রচনাগুলি সবই যে বঙ্কিমচন্দ্রেরই তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সম্পাদকদ্বয় বইয়ের ভূমিকাতে বলেছেন—'এগুলির কয়েকটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা, তাহা অনুমান, কিংবদন্তী ও স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিতে হইয়াছে। কয়েকটি রচনা যে বঙ্কিমের তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। .. বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বৃত্রসংহার' সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র সেনের (আমার জীবন) .. 'পলাশীর যুদ্ধ' সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের (আমার জীবন) সাক্ষ্য আছে।'

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' কাব্যের সমালোচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবনে' স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তাছাড়া ঐ রচনাটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের হতে পারে না, এ সম্বন্ধে আমি আমার 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আমার ঐ আলোচনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হওয়ার আগে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমার লেখাটি পড়ে জনৈক অধ্যাপক প্রতিবাদ করে দেশ পত্রিকায় একটি চিঠি লিখেছিলেন। বৃত্রসংহারের সমালোচনা যে বঙ্কিমচন্দ্রের হতে পারে না, এ সম্বন্ধে আরও যুক্তি দেখিয়ে

৯-১-৮০ তারিখের দেশে আমি উত্তর দিয়ে ছিলাম। ঐ অধ্যাপক ত বটেই, তাছাড়া কেউই আমার যুক্তি সমূহকে খণ্ডন করে কোন উত্তর দিতে পারেন নি।

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের এই বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাময়িক পত্রে মুদ্রিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা' নির্বাচনের ব্যাপারে অনেকগুলির ক্ষেত্রে সঠিক, বেঠিক করে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করলেও কোনটার ক্ষেত্রে আবার কোন কথাই বলেন নি। যেমন—এঁরা কোন প্রমাণ বা সাক্ষ্য না দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা ব'লে 'মাসিক সংবাদ' নাম দিয়ে ১২৯৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রচারের ১৫৪-১৫৫ পৃষ্ঠার লেখাটা উদ্ধৃত করেছেন।

ঐ শ্রাবণ সংখ্যা প্রচারে ১৫৬, ১৫৭ ও ১৫৮ পৃষ্ঠাতেও 'মাসিক সংবাদ' প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রজেনবাবুরা ঐ তিনপাতা থেকে একটা কথাও উদ্ধৃত করেন নি। শুধু এই নয়, ১২৯৫ সালের প্রচার পত্রিকায় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন যুগ্ম সংখ্যায়ও 'মাসিক সংবাদ' প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রাবণ সংখ্যার ন্যায় ঐ সংখ্যাগুলিতেও 'মাসিক সংবাদ' লেখার সঙ্গে লেখকের নাম ছিল না। ব্রজেনবাবুরা ঐ সংখ্যাগুলি থেকেও মাসিক সংবাদের কোন কাহিনীই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে সংগ্রহ করেন নি। তাই এঁদের সংকলিত এই 'মাসিক সংবাদ'টিকে বিনা প্রমাণে বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা বলে মেনে নেওয়া যায় না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় কলকাতার বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকেও বঙ্কিমচন্দ্রের যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও দেখা যায় ঐ গ্রন্থাবলীর সম্পাদক (বইয়ে অবশ্য সম্পাদকের নাম নেই) 'প্রচারে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু অজ্ঞাত রচনা গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই সম্পাদক ঐ রচনাগুলি নির্বাচনের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে কোন সাক্ষ্য, প্রমাণ বা কৈফিয়ৎ দেন নি। এঁরও নির্বাচিত কয়েকটা রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের কিনা সন্দেহজনক হলেও, 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' রচনাটি যে, বঙ্কিমচন্দ্রেরই তা ইনি ঠিকই নির্বাচন করেছেন। এটি ১২৯২ সালে প্রচারের ফাল্গুন-চৈত্র যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনাবলীর সম্পাদক যোগেশচন্দ্র বাগল বঙ্কিমচন্দ্রের এই অজ্ঞাত রচনা নির্বাচনের ব্যাপারে ব্রজেনবাবুদেরই নির্বাচনকে মেনে নিয়েছেন। ব্রজেনবাবুদের মত তিনিও বসুমতীর বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর দিকে বিচার দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে দেখেন নি। তাই এঁরা কেউই এই

'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' প্রবন্ধটি বঙ্কিম রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেন নি।

প্রচার পত্রিকার ভিতরে এই প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের নাম না থাকলেও পত্রিকার মলাটে সূচীপত্রে এই প্রবন্ধের লেখক বলে বঙ্কিমচন্দ্রেরই নাম রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' প্রবন্ধে প্রথম দিকেই লিখেছিলেন—'আমরা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'নব্য বঙ্গের উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি' বিষয়ক প্রবন্ধ (তত্ত্বোধিনী, চৈত্র) ও কটন সাহেব প্রণীত New India নামক নব প্রচারিত পুস্তকের কথা বলিতেছি।'

ভবতোষ দত্ত তাঁর 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই প্রবন্ধটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' প্রবন্ধ ('প্রবন্ধমালা'র অন্তর্ভুক্ত) এবং হেনরী কটনের সদ্য প্রকাশিত New India গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে লেখেন।—এই বলে তিনি পাদটীকায় লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ (বসুমতী)।

ভবতোষবাবু বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী দেখে দেখেই এই কথা লিখলেও, এই সামান্য কথাটা লিখতে গিয়েই একাধিক ভুল করেছেন। প্রথমতঃ—প্রবন্ধটি 'বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ' নামক গ্রন্থে নেই। আছে—বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলীর ২য় ভাগে। বসুমতী সাহিত্য মন্দির তিন ভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী, আর অপর তিন ভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের নাম 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' নয়। এটা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের প্রবন্ধে তাঁর দেওয়া নাম। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের নাম—নব্য বঙ্গের উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি।

তৃতীয়তঃ—ভবতোষবাবু 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' বলেই দ্বিজেন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধমালা' গ্রন্থের নাম করেছেন—এতে এক তো 'প্রবন্ধমালা'য় ঐ নামের প্রবন্ধ নেই, তাছাড়া ভবতোষবাবুর লেখা পড়ে অনেকেই মনে করবেন, বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধমালা'র অন্তর্গত প্রবন্ধ পড়েই তাঁর সমালোচনাটি লিখেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তা নয়। তিনি সেই সময়কার অর্থাৎ ১২৯২ সালের বা ১৮০৭ শকের (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সালের পরিবর্তে শকাব্দ আছে) চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়ে তাঁর প্রবন্ধটি লিখে ছিলেন।

কয়েকটি পত্র ও পত্রাংশ

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলির ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কোর্টের অদূরেই চুঁচুড়ায় সপরিবারে বাস করতেন, সেই সময় সাধারণী-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'গোচারণের মাঠ' নামে একটি কবিতার বই লিখেছিলেন। বইটি প্রকাশিত হলে বইটি সম্বন্ধে একটি অভিমত চেয়ে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে একটি বই পড়তে দিয়েছিলেন। তারই ফলে বঙ্কিমচন্দ্র তখন অক্ষয়চন্দ্রকে এই চিঠিটি লিখে-ছিলেন—

১

আশীর্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ

তোমার গোচারণের মাঠ পড়িয়াছি। ২৪ পৃষ্ঠা কাব্যখানির মধ্যে একটিও যুক্তাক্ষর নাই—বাঙ্গালা ভাষা তোমার আজ্ঞাধীন, যদি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য লিখিয়া থাক, তবে তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

তোমার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, যুক্ত অক্ষর ছাড়িয়া দেওয়াতে একটা বড় সুফল ফলিয়াছে। অতি সরল বাঙ্গালা ভাষায় কাব্যখানি লিখিতে হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল শব্দে যুক্ত অক্ষর আছে, সেগুলি প্রায় সংস্কৃত-মূলক। অতএব যুক্ত অক্ষর পরিত্যাগ করিলে কাজে কাজেই কট মট সংস্কৃত বহুল ভাষাও পরিত্যাগ হয়; যে সরল বাঙ্গালায় লোকে কথা বার্তা কয়, সেই ভাষা আসিয়া পড়ে। ভাষা সম্বন্ধে ইহা সামান্য লাভ নহে। যতদিন না প্রচলিত বাঙ্গালায় বহি লেখার পদ্ধতি চলিত হয়, ততদিন সাধারণ লোকে বহি পড়িবে না। সাধারণ লোকে বহি না পড়িলে, লেখার উদ্দেশ্য সফল হইবে না, আর ভাষারও প্রকৃত পুষ্টিলাভ হইবে না।

এমন কথা বলি না যে, প্রচলিত বাঙ্গালায় যুক্ত-অক্ষর নাই, বা যুক্ত অক্ষর বিরল। যুক্ত অক্ষর ছাড়িয়া দিলে, এমন কি অধিকক্ষণ কথাবার্তা চলে না। তবে চলিত বাঙ্গালায় যুক্ত অক্ষর কম, কেতাবি বাঙ্গালায় বেশী। তুমি দেখাইয়াছ যে, যুক্ত-অক্ষর একেবারে ছাড়িয়া দিয়াও ভাল ভাষায় ভাল কাব্য লেখা যায়।

যুক্ত-অক্ষর ছাড়িয়া দিয়া কবিতা লেখা এই প্রথম নহে, তাহা আমি জানি। 'পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল' প্রভৃতি সকলেরই মনে আছে। আর তার-পরও কোন কোন লেখক অসংযুক্ত বর্ণে কবিতা লিখিয়াছেন, এমনও স্মরণ হইতেছে। কিন্তু সে সকলের সঙ্গে তুলনায় 'গোচারণের মাঠে'র একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। সেগুলি ছন্দোবিশিষ্ট হইলেও, কবিতা নহে। কবিত্ব সে-গুলিতে প্রায় নাই। যে সকল শিশুরা যুক্ত অক্ষর ভাল পড়িতে পারে না, তাহাদিগের কাব্য পাঠের জন্যই সেগুলি লেখা হইয়াছে। কিন্তু ছেলেদের কবিত্ব হীন কাব্য পড়াইয়া কোন লাভ আছে কি না—আমার সন্দেহ। লোকের বিশ্বাস আছে যে, ছন্দ ও মিল বিশিষ্ট রচনায় ছেলেদের মন হরণ করে, সেই জন্য গদ্য অপেক্ষা পদ্য পড়িতে ছেলেরা ভালবাসিতে পারে। কিন্তু ফলে কি তাই? আমি ত কোন শিক্ষকের মুখে শুনি নাই যে, ছেলেরা গদ্য পাঠ অপেক্ষা পদ্য পাঠে অধিক মনোযোগী হয়। বোধ হয়, যতদিন ছেলেরা পাঠ্য পদ্যে কর্কশ উপদেশ, আর নীরস বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই পাইবে না, ততদিন গদ্যে পদ্যে তাহাদের সমান আদর বা অনাদর থাকিবে। ফলে, কবিত্ব শূন্য কাব্য ছেলেদের পড়ান বিড়ম্বনা মাত্র। বিদ্যালয়ে কাব্য গ্রন্থ পড়াইবার উদ্দেশ্য কি? সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, কাব্যে ভাষা শিক্ষা ভাল হয়। পোপের প্রাচীন কথার দ্বারা অনেকে এ সংস্কার সমূলক বলিয়া প্রমাণ করিতে চান। বিদেশীয় ভাষার পক্ষে ইহা সত্য হইলেও হইতে পারে, দেশীয় ভাষার পক্ষে তত সত্য কিনা—আমার সন্দেহ। বালককে কাব্য পড়াইবার একমাত্র উদ্দেশ্য—আমি স্বীকার করি—কাব্যের উন্নত ভাবের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি। ইহা কেবল পদ্যের দ্বারা সিদ্ধ হয় না—কবিত্বের প্রয়োজন। তোমার এই 'গোচারণের মাঠ' অতি সরল ভাষায় লিখিত হইলেও কবিত্ব-পূর্ণ। অনেক স্থানে উঁচু দরের কবিত্ব ইহাতে দেখিয়াছি। ছেলেদের যদি কাব্য পড়াইতে হয়, তবে এই খানিই তাহার উপযোগী। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা যে এদেশের পাঠশালা স্কুলে চলিবে এমন ভরসা আমি করি না। যদি চলে তবে আমি বিস্মিত হইব। যাহা চলিবার যোগ্য তাহা চলিবে, শিক্ষা বিভাগের এমন নিয়ম নহে। শিক্ষা বিভাগে কেন; যাহা চলিবার যোগ্য তাহা তুমি কোথায় চলিতে দেখিয়াছ?

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চুঁচুড়া
২২শে বৈশাখ ১২৮৭

২

বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরে থাকাকালে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁর বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। পূর্বোক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারও প্রথম থেকেই বঙ্গদর্শনের লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভা স্বীকার করে সুপণ্ডিত ও সাহিত্য-রসিক বন্ধু জগদীশনাথ রায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

J have got a lot of contributors, who have promised to write and can write. Dinabandhu, Hemchandra, Krishna-kamal Bhattacharya, Tarapraosad Chatterjee and a young man whom you don't know, but whose intellectual life, I think, I have greatly influenced, for good or for evil, and whose inherent gifts presage something great for him in future. His name is Akkhay Sarkar.

বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হলে অক্ষয়চন্দ্র এই পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নানা প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বঙ্গদর্শনে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'ও লিখতেন।

৩

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের খরচে নিজের বই ছেপে কলকাতার কয়েকজন পুস্তক বিক্রেতাকে বই বিক্রি করতে দিতেন। এজন্য তাঁরা কমিশন নিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বই তখন কোন্ কোন্ দোকানে পাওয়া যেত, এ সম্পর্কে তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন এখানে উদ্ধৃত করছি—

বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তক সকল নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়—

কলিকাতা ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রিট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ঠনঠনিয়া পিপলস্ লাইব্রেরী, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরী, চীনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী গুরুদাসবাবুর নিকটে, কর্ণ-

ওয়ালিশ ষ্ট্রিট বি ব্যানার্জির দোকানে, সোমপ্রকাশ প্রেস ডিপজিটরিতে, কলেজ ষ্ট্রিটে শীল কোম্পানীদের দোকানে।'

এই লেখার পর বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলির নাম এবং প্রতিটি বইয়ের পাশে তার দাম দেওয়া আছে।

শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বই থেকে মাসে আয় হ'ত প্রায় সাত শ টাকার মত। তাঁর কর্মচারী উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বই ছাপানো ও বিক্রির ব্যাপারে দেখাশুনা করতেন। উমাচরণ পূর্বোক্ত দোকানগুলিতে বই দিয়ে আসতেন এবং মাস কাবারে গিয়ে হিসাব করে বই বেচার টাকা নিয়ে আসতেন।

এই পুস্তকবিক্রেতাদের সকলেই কিন্তু ভাল লোক ছিলেন না। কেউ কেউ টাকা দিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে রীতিমতই ভোগাতেন। এইরূপ একজন পুস্তক বিক্রেতাকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি—

নমস্কার নিবেদন,

আপনি যে সকল লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা বড় গোলযোগ করিতেছে। দুই মাস হাঁটাহাঁটি করিয়া উমাচরণ চৈত্র মাসের হিসাব মিটাইতে পারিল না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের তো কথাই নাই। উমাচরণ একা। তাহার অনেক কাজ, একটা সামান্য বিষয়ের জন্য তাহার দুই বেলা হাঁটাহাঁটি করিলে আমার কাজ চলে না। অতএব আপনি নিজে এ বিষয়ে কিছু মনোযোগী হইবেন। এই অনুরোধ। ইতি তাং ১২ আষাঢ়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এখানে চিঠিতে দোকানের কর্মচারীরা গোলযোগ করছে, বঙ্কিমচন্দ্র একথা লিখলেও, আসলে তিনি মালিককে লক্ষ্য করেই ঐ কথা বলেছিলেন। কারণ, উমাচরণ দু মাস হাঁটাহাঁটি করে ব্যর্থ হওয়ার মূলে মালিক নিজেই ছিলেন।

চিঠিটিতে প্রাপকের নাম নেই। তাই যেসব পুস্তক ব্যবসায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের বই বেচতেন, তাঁদের মধ্যে ইনি যে কে তা ঠিক জানা গেল না। তবে তিনি কোন বড় দোকানদারই ছিলেন বলে মনে হয়। কেন না বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিতেই দেখা যাচ্ছে, দোকানে মালিক ছাড়া বেশ কয়েকজন কর্মচারীও ছিলেন।

এই চিঠিটি কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় রয়েছে। ঐ সংগ্রহশালায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি আছে, এই সংবাদটি আমাকে দেন পরিষদের কর্মী সুনীল দাস। পরিষদের সৌজন্যে চিঠিটি নকল করে আনি।

৪

নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন—'একবার বঙ্কিমবাবু কবিতা চাহিয়া পত্র লিখিলে আমি 'পলাশীর যুদ্ধে'র রচনার কথা লিখিলাম। তিনি উহা চাহিয়া পাঠাইলেন এবং পাইয়া লিখিলেন—বঙ্গদর্শনে ছাপিলে উহার অগৌরব হইবে। উহা পুস্তকাকারে ছাপিতে উপদেশ দিলেন এবং লিখিলেন যে, সমালোচনার সময়ে তিনি প্রমাণিত করিবেন যে, পলাশীর যুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান কাব্য—next, if at all, to Meghnad—মেঘনাদ-বধের সমকক্ষ না হইলেও তাহার পরবর্তী স্থান পাইবার যোগ্য। আমি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইলে; তিনি লিখিলেন—উহা বঙ্গদর্শন প্রেসে মুদ্রিত করিবেন। আরও প্রায় ছ মাস চলিয়া গেল। তখন বঙ্কিমবাবু লিখিলেন—তাঁহার প্রেসে ছাপিবার সুবিধা হইল না; অতএব সাধারণী প্রেসে ছাপিতে হস্তলিপি অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে দিয়াছেন।'

নবীনচন্দ্র তাঁর এই 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য প্রসঙ্গে 'আমার জীবনে' আরও লিখেছেন—পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হলে 'বঙ্গ-সাহিত্য জগতে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর 'সুর' ফিরিয়াছে। তিনি আমাকে লিখিলেন—It is unfortunate Hem should have made his debut before you.—তোমার দুর্ভাগ্য যে হেম তোমার পূর্বে আসরে নামিয়াছেন। কথাটা বুঝিলাম। পরে শুনিলাম, হেমবাবুর বৃত্রসংহারের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে। উহা পড়িলাম এবং যখন বঙ্গদর্শনে উহার, পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—সংবলিত দীর্ঘ সমালোচনা পড়িলাম এবং শুনিলাম এমন একটা লাইন সেক্সপীয়ার কি মিলটনও লিখিতে পারেন নাই, তখন বুঝিলাম। কিন্তু বঙ্কিমবাবু ভুল বুঝিয়াছিলেন। আমি তো কখনই হেমবাবুর প্রতিযোগিতা করি নাই।'

এখানে উদ্ধৃত নবীনচন্দ্রের লেখাটি থেকে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র এক সময়

বঙ্গদর্শনের জন্য লেখা চেয়ে এবং 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য নিয়ে নবীনচন্দ্রকে কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন। নবীনচন্দ্র সেই চিঠিগুলির মধ্যে মাত্র একটি চিঠির একটি বাক্য, আর একটি চিঠির একটি বাক্যাংশ তাঁর লেখাটির মধ্যে উদ্ধৃত করেছেন।

নবীনচন্দ্র লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধকে বাংলা সাহিত্যের সর্ব প্রধান কাব্য বলেও, আবার বলেছিলেন—মেঘনাদবধের সমকক্ষ না হ'লেও তার পরেই স্থান পাবার যোগ্য—অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় প্রধান কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র একই সময়ে এই ধরণের পরস্পর বিরোধী কথা বলেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।

নবীনচন্দ্র লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গ-দর্শনে ঐ বইয়ের উচ্চ প্রশংসা করবেন বলেও, পরে আবার লিখেছিলেন—তোমার দুর্ভাগ্য, তোমার আগে হেম দেখা দিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরণেরও কথা বলেছিলেন কিনা সন্দেহ হয়। আর নবীনচন্দ্রের এই সব কথা থেকেও এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, বঙ্কিমচন্দ্রই বঙ্গদর্শনে পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনা করেছিলেন।

বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যের ১ম ভাগের সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক এক জায়গায় লিখেছিলেন—

'বৃত্রাসুর সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন—

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।

পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—ইহা প্রথম শ্রেণীর উক্তি।—মিলটনের যোগ্য।'

বঙ্গদর্শনের এই লেখা, আর শোনা কথা বলে নবীনচন্দ্রের লেখা—'এমন একটা লাইন সেক্সপীয়ার কি মিলটনও লিখিতে পারেন নাই'—এই দুটায় কত তফাৎ!

নবীনচন্দ্রের এইরূপ শোনা কথার যে তেমন কোন মূল্য নেই, সে কথাও বলা যেতে পারে। যেমন, তিনি তাঁর আমার জীবনেই তাঁর 'রঙ্গমতী' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'দ্বিতীয় পর্যায় বঙ্গদর্শনে 'রঙ্গমতী'র একটা সামান্য সমালোচনা বাহির হইল। শুনিলাম, উহা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা।'

বঙ্গদর্শনে রঙ্গমতীর সমালোচনাটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের নয়, এবং ঐ সমা-

লোচনা যে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সে কথা আমি সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা প্রফুল্লবাবুর চিঠিসহ আমার 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য' বইয়ে দেখিয়েছি।

বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের সমালোচনার প্রসঙ্গে আলোচনায় আমি আমার ঐ বইয়ে এবং ২৬-১-৮০ তারিখের 'দেশে' লেখা একটি চিঠিতে দেখিয়েছি যে নবীন সেন কবিতার ব্যাপারে হেমচন্দ্রকে ঈর্ষাই করতেন।

এই বইয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা' অধ্যায়ে আমরা আগে দেখেছি, বঙ্কিমচন্দ্র এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য বাংলা সংকলন গ্রন্থে হেমচন্দ্রের কয়েকটা কবিতা দিলেও নবীনচন্দ্রের একটা কবিতাও দেন নি। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্র এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্রের উপরও নবীনচন্দ্রের একটা ক্ষোভও থেকে যেতে পারে। যার ফলে নবীনচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে পরে হেমচন্দ্রের কবিতা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে জড়িয়ে ঐ সব কথা লিখেছিলেন বলেই মনে হয়।

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিপত্র সম্বন্ধে এখানে কয়েকটা কথা বলছি—

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাঁদের সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের মাত্র ১১ খানি চিঠি মুদ্রিত করেছেন। এছাড়া তাঁদের সম্পাদিত Essays and Letters: Bankimchandra Chatterji গ্রন্থে কিছু ইংরাজি চিঠি দিয়েছেন।

এই দুটি বইয়ের চিঠিগুলি সহ আমার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে সংগৃহীত বঙ্কিমচন্দ্রের আরও অসংখ্য চিঠি নিয়ে 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বা চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নামে একটি বই করেছি। ঐ বইয়ে বহু পত্রাংশ, এমন কি হারানো চিঠিরও হদিস দিয়ে সর্বত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

এখানে প্রদত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের এই পত্র ও পত্রাংশ ক'টি তখন আমার ঐ বইয়ে দিতে পারিনি, তাই এখন এই বইয়ে দিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল পত্র, পত্রাংশ ও লুপ্ত পত্রের হদিস থেকে সাহিত্যের খবর ছাড়াও তাঁর জীবনের নানা দিকের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। আমার ঐ 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বা চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বইয়ে এমন ক'টি চিঠি আছে, যাতে সমসাময়িক ধর্মবেত্তা ও দেশনেতাদের চিন্তাকে ছাড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের

উদার ও সঠিক দূরদৃষ্টির সুন্দর পরিচয় রয়েছে। যেমন—সমুদ্রযাত্রা নিয়ে কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লেখা দীর্ঘ তথ্য-বহুল চিঠি, সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি প্রভৃতি। তাছাড়া বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য সম্ভব ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় ইংরাজি শব্দের প্রচলন নিয়ে কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, কিংবা ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশকে সত্য পথে চলা ও পরিশ্রম করা প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে লেখা চিঠিটি।

রবীন্দ্রনাথেরও অগণিত চিঠি আছে, যাতে সাহিত্যের খবর না থাকলেও কবির জীবনের অন্যান্য নানাদিকের পরিচয় রয়েছে। তাই বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের চিঠিসমূহ 'চিঠিপত্র' নাম দিয়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে এবং সাহিত্য-প্রেমীরা সাগ্রহেই সে সব চিঠিপত্র পড়ছেন।

আমার ঐ 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বা চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বইটি প্রকাশিত হলে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত ভবতোষ দত্ত 'দেশ' পত্রিকায় বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন —'সাহিত্য-সম্রাটের সাহিত্য সম্পর্কিত কোন প্রসঙ্গ ও কথা এতে অতি সামান্যই আছে—সুতরাং সাহিত্য-প্রেমীরা বিরক্ত হয়ে বলতেই পারেন—এ বই কোন্ কাজে লাগবে ?...এমন একটা চিঠি পেলাম না যাতে... বঙ্কিমের জীবনদৃষ্টি বা দৃষ্টি জিজ্ঞাসার কোন ব্যাখ্যা পাই।'

অথচ ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় এই বইটিরই সমালোচনা প্রসঙ্গে আমার অপরিচিত ভাস্কর বসু (রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অরুণ বসু) লিখেছিলেন...

'(বঙ্কিমচন্দ্রের) এ সব চিঠি গোপালবাবুর দ্বারা সম্পাদিত হয়ে ১৯৭৭ এর ডিসেম্বর থেকে কয়েক মাস ধরে 'দেশ' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রণকালেই আমাদের চমৎকৃত করেছিল। এখন প্রাসঙ্গিক অজ্ঞাতপূর্ণ তথ্য ও পরিশিষ্টসহ পূর্ণ গ্রন্থে প্রকাশিত।

এই চিঠিগুলি একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশকাল, সমসাময়িক সাহিত্য পরিবেশ, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের আখ্যানে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি বঙ্কিম চরিত্রের ঔদার্য, ধর্মপরায়ণতা, স্বজনবাৎসল্য, নৈয়ায়িকতা বিষয়েও বহু অজানা সংবাদে পূর্ণ। এই গ্রন্থে প্রাপ্ত, লুপ্ত, উদ্ধৃত, উল্লেখিত, পূর্ণ, ছিন্ন প্রায় সব চিঠিরই হদিস আছে—টীকা টিপ্পনী, পটভূমি তথা বিবরণসহ।

মনীষী জীবনের উপকরণ সন্ধানে ছিন্নপত্রের মূল্যও কতখানি গোপালবাবু তা প্রমাণ করে সমগ্র সারস্বত সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন।'

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কাহিনী বহুকাল ধরেই নির্বাধায় চলে আসছে। চলতে চলতে এখন এমন হয়েছে যে, এটা প্রায় প্রবাদ হয়েই দাঁড়িয়ে গেছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে হ'ল এই—

রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হলে রামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন—মানুষের কর্তব্য কি? উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—আহার, নিদ্রা, মৈথুন। —এই উত্তর শুনে রামকৃষ্ণ ঘৃণায় বঙ্কিমচন্দ্রকে খুব তিরস্কার করেছিলেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আজ পর্যন্ত কেউই এই কাহিনীটির উৎস অনুসন্ধান তো করেনই নি, এমন কি এর সত্যাসত্য নিয়েও যাচাই করেন নি। এই কাহিনীটি সম্বন্ধে অনেক দিন থেকেই আমার একটা দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এইরূপ বলা তো দূরের কথা, রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কোন দিন দেখাই হয়েছিল কি না সন্দেহ। এখন সে সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা করছি—

রামচন্দ্র দত্ত, স্বামী সারদানন্দ, অক্ষয়কুমার সেন ও শ্রীম (মহেন্দ্র গুপ্ত) রামকৃষ্ণের এই চারজন পার্ষদভক্তই এঁদের রামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় নিজ নিজ গ্রন্থে লিখেছেন—কলকাতার বেনেটোলা-নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অধরলাল সেনের বাড়িতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা হয়েছিল। রাম দত্তই সর্বপ্রথম তাঁর বইয়ে মাত্র দুটি ছোট্ট বাক্যে ঐ সাক্ষাতের কথাটি লিখেছিলেন। সারদানন্দ রাম দত্তের ঐ লেখাটি নিয়ে তাতে নিজের একটু মন্তব্য জুড়ে সেটিকে বাড়ান। কিন্তু 'মনে ময়লা'ধারী, 'বিদ্যাবুদ্ধিহীন' অক্ষয় সেনই প্রথম রাম দত্ত বর্ণিত রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ সাক্ষাতের কথার উপর নিজের কল্পনা জুড়ে ব্যাপারটাকে নোংরা করে তোলেন। শেষে শ্রীম এঁদের সকলেরই লেখা নিয়ে তাতে নিজের অবাধ কল্পনা মিশিয়ে ঐ সাক্ষাৎকারের কথাটিকে সেই নোংরা তো বটেই, তাছাড়া আরও জটিল করে তাঁর বইয়ে ২৬ পাতা ধরে লিখেছেন।

পরে অনেকেই এ সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর না নিয়ে শ্রীমর কথাকেই অভ্রান্ত বিবেচনা করে নিজেদের বইয়ে ঐ কথা হুবহু লিখেছেন। সাহিত্যিক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আবার শ্রীমর কথা নিয়ে তাঁর উপরেও টেক্কা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে আরও ছোট করেছেন।

এখন রামকৃষ্ণের ঐ চার পার্ষদভক্ত ও অচিন্ত্য সেনগুপ্তর এই রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ বিষয়ক লেখাটি নিয়ে পর পর আলোচনা করছি—

রাম দত্ত তাঁর বইয়ে লিখেছেন—'কলিকাতার ভূতপূর্ব ডেপুটি কালেক্টর অধরলাল সেন ইনি শাক্ত ছিলেন। অধরবাবুর বাড়িতে একদিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরমহংস দেবের সাক্ষাৎ হয়। পরমহংস দেব তাঁহাকে বঙ্কিম (বাঁকা) বলিয়া রহস্য করিয়াছিলেন।' —শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবন বৃত্তান্ত।

রাম দত্ত এ সম্পর্কে শুধু এই কথাটাই লিখেছিলেন। এর অতিরিক্ত একটি শব্দও আর কোথাও বলেন নি। এই রাম দত্ত ছিলেন রামকৃষ্ণের একেবারে প্রথম দিকের শিষ্য বা ভক্ত।

রাম দত্ত রামকৃষ্ণেব সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাতের কথা লিখলেও, তিনি নিজে ঐ সাক্ষাৎকার প্রত্যক্ষ করেছেন, তা কিন্তু বলেন নি। তাছাড়া তিনি কার কাছ থেকে শুনে ঐ কথা লিখেছেন, তাও বলেন নি। তা তিনি নাই বলুন, আসলে তাঁর এই লেখাটি সত্য কি না তাই দেখা যাক। রাম দত্তের বইয়ের সকল লেখাই যে সত্য নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর লেখায় কি রকম অসত্য আছে, তার কিছু নমুনা দেখাচ্ছি—

রাম দত্ত তাঁর 'বক্তৃতাবলী'তে লিখেছেন—'একদা…ভক্তিভাজন ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটিতে রামকৃষ্ণদেব আগমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণির নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি গমন করেন। ··চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে, 'হ্যাগা, তুমি যে ধর্মপ্রচার করিতেছ, তোমার চাপবাশ আছে?' চূড়ামণি মহাশয় কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। ··ঠাকুর পুনরায় কহিলেন—'দেখ, যখন রাস্তায় অনেক লোক গোলমাল করে, তখন পাহারাওয়ালা আসিবা মাত্র সকলে সরিয়া পড়ে। লোকে কেন সরিয়া যায়? …তাহার যে চাপরাশ আছে।…সেইরূপ ভগবানের আদেশ বা ইচ্ছা না হইলে…কেহ কখন লোকের মন হরণ করিতে পারে না।'

রাম দত্তের এই লেখার প্রতিবাদ করে শশধর তর্কচূড়ামণি তখন লিখে

ছিলেন—'রামকৃষ্ণের সহিত আমার অনেক দিনই দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রথমে তিনি আমার কলিকাতার বাসায় গিয়াছিলেন। তৎপর আমিও তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। শেষে তিনিও মধ্যে মধ্যে আসিতেন, আমিও মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট যাইতাম। ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে তোমার কোন চাপরাশ আছে কিনা আমাকে এতটুকু জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমি তাঁহাকে দিই নাই। সুতরাং ঐভাবে আমাকে ঐকথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না এবং তিনি করেনও নাই। তিনি যে লেখাপড়া কিছু জানিতেন না এবং শাস্ত্রও পড়েন নাই, এ বিষয়ে তিনি বেশ ধারণা রাখিতেন এবং আমি যে তখন ২৫।৩০ বৎসর পর্যন্ত যথাশক্তি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছি, তাহাও তিনি জানিতেন। আমাকে তিনি নিতান্ত অপাত্র বা তাঁহার অনুচরগণের একতম বলিয়াও মনে করিতেন না। কাজেই আমাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।'
—সাহিত্য, পৌষ-মাঘ ১৩২৭

এখন তর্কচূড়ামণির এই কথা যদি সত্য হয়, তাহলে রাম দত্তের রামকৃষ্ণ বিষয়ক ঐ লেখাকে আর সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।

তর্কচূড়ামণির ঐ কথাকে অসত্য বলে মনে করারও কোন কারণ দেখি না। কেন না, ভূধর চট্টোপাধ্যায় নামে রামকৃষ্ণের আর এক ভক্ত যিনি রামকৃষ্ণ-তর্কচূড়ামণির এই প্রথম সাক্ষাতের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন (রাম দত্ত কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না) তিনিও যা লিখেছেন, তাতে 'তোমার চাপরাশ আছে?' এ ধরণের কোন কথাই নেই। বরং রামকৃষ্ণের আরাধ্যা দেবী স্বয়ং কালীই তাঁর প্রিয় ছেলে শশধরের কাছে রামকৃষ্ণকে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন এই কথাই আছে। ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের সেই লেখাটি এখন এখানে উদ্ধৃত করছি—

'একদিন আচার্যদেব (অর্থাৎ তর্কচূড়ামণি মহাশয়) তাঁহার কলিকাতায় আপন ভবনে বহুতর ধর্মপিপাসু শ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ পরমহংসদেব একজন শিষ্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্যদেব ইতিপূর্বে তাঁহাকে কখন দেখেন নাই।...পরমহংসদেব...তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'ভাই শশধর, দেখ, আজ মায়ের কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় মা আমায় বলিলেন যে, হ্যাঁরে রামকৃষ্ণ, আমার শশ-ধরের সঙ্গে তুই একবার দেখা করলি নি? সেও যে আমার প্রিয় ছেলে।

আজ তাহার কাছে যা। গিয়ে দেখা করে আয় গে। মা বললেন, আর থাকিতে পারিলাম না। অনেক দিন আসিব আসিব করিতে ছিলাম, আজ তা হইয়া গেল।'—বেদব্যাস ১০ম সংখ্যা, ১২৯৪ সাল।

রামকৃষ্ণ-তর্কচূড়ামণির প্রথম সাক্ষাতের এই বিবরণই ভূধরবাবু তাঁর 'সাধু দর্শন' গ্রন্থেও অবিকল দিয়েছেন।

এখানে একথা বলা বাহুল্য যে, ভূধরবাবুর লেখার মধ্যে রামকৃষ্ণের যে মায়ের কথা আছে, তিনি হলেন রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দেবী ভবতারিণী বা কালী।

এখন এই আলোচনা থেকে রাম দত্ত বর্ণিত রামকৃষ্ণ-তর্কচূড়ামণি বিষয়ক কথাটিকে অসত্য বলে অনুমান করাই স্বাভাবিক।

রাম দত্ত তাঁর 'পরমহংস দেবের জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থে রামকৃষ্ণের গলায় অসুখের সময় রামকৃষ্ণের সঙ্গে তর্কচূড়ামণির সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার বর্ণনা দিয়েছেন। রাম দত্ত তাঁর বইয়ে রামকৃষ্ণ-তর্কচূড়ামণির ঐ সময়কার কথোপ-কথন যা লিখেছেন, তা ঠিক নয় বলে তর্কচূড়ামণি তারও প্রতিবাদ করে ছিলেন। (সাহিত্য, পৌষ-মাঘ ১৩২৭)।

অতএব যে রাম দত্ত তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে এহরূপ বানানো কাহিনী লিখতে পারেন, তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও কোন বানানো কাহিনী লিখতে পারবেন না, তাতে আর আশ্চর্য কি !

এখন কেউ হয়ত বলবেন—তর্কচূড়ামণির ব্যাপারে রাম দত্তের লেখায় কল্পনা থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কীয় লেখাটিতে কল্পনা তো নাও থাকতে পারে।

আমার বক্তব্য—থাকতেও তো পারে। তাছাড়া এই রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাতের কথাটা নিয়ে আমার সন্দেহের আরও কয়েকটা কারণ আছে—

প্রথমত :—বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোথাও একটি কথাও লেখেন নি। অথচ দু জনে সমসাময়িক ছিলেন। (রামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বছর দেড় এর বড় ছিলেন।)

দ্বিতীয়ত :—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসি-কের কাছে নিজের জীবনের কথা এবং সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন। তাঁরা তাঁদের স্মৃতি-কথায় বঙ্কিম-চন্দ্রের মুখের ঐ সকল কথা লিখে গেছেন। কিন্তু কেউই বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে

রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা শুনেছেন, এমন কথা কোথাও লিখে যান নি।

তৃতীয়তঃ—শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে রামকৃষ্ণের যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার বিবরণ কেশব সেনের 'দি ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজে ২৬-৭-৮৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে যে দেখতে গিয়েছিলেন, তার সংবাদ তখন ১৭-১২-৮১ তারিখের 'সুলভ সমাচারে' এবং ১১-১২-৮১ তারিখের 'দি ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজেও প্রকাশিত হয়েছিল। আবার রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে যে দেখতে গিয়েছিলেন, সে খবরও তখনকার 'দি নিউ ডিসপেনসেশন' কাগজে ৩-৯-৮২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। রেভারেণ্ড যোসেফ কুক, মিস পিগট প্রভৃতি দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণকে দেখতে গেলে সে খবর ২৬-২-৮২ তারিখের দি নিউ ডিসপেনসেশনে বেরিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে এঁদের কারও চেয়েই অখ্যাত ছিলেন না। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হলে, সে খবর 'দি ইণ্ডিয়ান মিরার' প্রভৃতি যে কোনও কাগজে প্রকাশিত হ'ত। আর ঐ সংবাদ প্রকাশে বাধাও ছিল না এইজন্য যে, ঐ সব কাগজের কর্তৃপক্ষের কারও সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের অসদ্ভাব ছিল না। বরং কেশব সেনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বই ছিল।

চতুর্থতঃ—শ্রীম লিখেছেন, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তখন তো 'ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত'। এরও ৮ বছর আগে যখন তিনি শুধুই ঔপন্যাসিক, তখনই তিনি কিরূপ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তার একটা পরিষ্কার ছবি পাই, রবীন্দ্রনাথের লেখায়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ রি-ইউনিয়ন নামক ছাত্রদের এক বার্ষিক উৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেন। সেদিনের কথায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'বঙ্কিমবাবুর খড়্গ নাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল।

বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতে ছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁহার কিছু মাত্র গা-ঘেঁষাঘেষি ছিল না। এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়া ছিল। তাঁহার যে কেবল মাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব, তাহা নহে, তাঁহার কপালে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটা ছোট ঘটনা ঘটিল। তাহার ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত

হইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাঙ্গলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু ঘরে ঢুকিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় যেমন সেইটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি বঙ্কিমবাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।' —জীবন-স্মৃতি

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখের 'ধর্মতত্ত্ব' রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখেছিল—'রামকৃষ্ণ লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই। লেখাপড়া শিখিলে পৌরোহিত্য ব্যবসা করিতে হইবে, এই ভয়ে সেদিকে কখন যাইতে চাহিতেন না। ··অনেক ভাল ভাল গভীর ধর্মকথা তাঁহাব মুখে শুনিতে পাওযা যায়, কোন কোন দৃষ্টান্ত কথা যদিও আমাদের কর্ণে অতি অশ্লীল এবং কুৎসিত ভাবব্যঞ্জক বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোন মন্দ ভাব না থাকায় সে সকল তিনি অম্লান বদনে বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন, শরীরের সকল অঙ্গই সমান, তাহার মধ্যে মন্দ কি আছে। ·আবশ্যক হইলে দুই একটি গালাগালিও দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা শুনিতে তত কষ্ট বোধ হয় না। ধর্মবিষয়ে মতামত তাঁহার যাহাই হউক, তিনি একজন সরল সাধক ও প্রেমিক ভক্ত।'

'ধর্মতত্ত্ব' রামকৃষ্ণের জীবিত কালেই, তাঁর মৃত্যুর ১১ বছব আগে তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলেছিল।

রামকৃষ্ণ কিরূপ 'অশ্লীল' কথা বলতেন, এগন তারই একটা উদাহরণ তাঁর পার্ষদ ও শিষ্যর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি--

সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন—'স্ত্রী শরীরের বিশেষ গোপনীয় অঙ্গ, যাহার নাম মাত্রেই সভ্যতাভিমানী জুয়াচোর আমাদের মনে কুৎসিত ভোগের ভাবই উদিত হয় বা ঐরূপ ভাব উদিত হইবে নিশ্চিত জানিয়া আমাদের ভিতর শিষ্ট যাঁহারা, তাঁহারা 'অশ্লীল' বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্বক পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন, সেই অঙ্গের নাম করিতে করিতেই এ অদ্ভুত ঠাকুরকে কতদিন না সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি।'
—গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ৭১

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'র পূর্বোক্ত লেখা এবং সারদানন্দের এই লেখা পর পর পড়লে, বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণকে দেখতে গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

শ্রীম লিখেছেন — 'শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) —···শিবলিঙ্গ বোধে নিজের লিঙ্গ পূজা করতাম। জীবন্ত লিঙ্গ পূজা। একটা আবার মুক্তা পরানো হতো। এখন আর পারি না।'—রামকৃষ্ণ কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পঞ্চদশ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

শ্রীম আরও লিখেছেন—

'[শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মযোনি দর্শন।]

···স্বয়ং কৃষ্ণ রাধাযন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন। যন্ত্র ব্রহ্মযোনি—তাঁরই পূজা ধ্যান। এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্ছে

অতি গুহ্য কথা। বেলতলায় দর্শন হতো—লক্ লক্ করতো।

···বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল।·· সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন ফুলচন্দন দিয়ে পূজো না করলে থাকতে পারতাম না।'—রামকৃষ্ণ কথামৃত —৪র্থ ভাগ, ২৩ খণ্ড, ৯ পরিচ্ছেদ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের বিংশতিতম অধ্যায়ের এক জায়গায় প্রসঙ্গতঃ ভাগবতের ২ স্কন্দের ৩ অধ্যায়ের ২০ থেকে ২৪ নং শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এই উদ্ধৃতির ২২ নং শ্লোকের প্রথম পংক্তিটি হ'ল এই—'বর্হায়িতে তে নয়নে নরানাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।'

অপরের লেখা এর অর্থ বঙ্কিমচন্দ্র যা উদ্ধৃত করেছেন, তা হচ্ছে—'মনুষ্য-দিগের চক্ষুর্দ্বয় যদি বিষ্ণুমূর্তি নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা ময়ূরপুচ্ছ মাত্র।'

বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্ধৃতির 'বিষ্ণু মূর্তি' শব্দটির পাশে তারকাচিহ্ন দিয়ে পাদ-টীকায় লিখেছেন—'এখানে 'লিঙ্গানি বিষ্ণোঃ' অর্থে বিষ্ণুর মূর্তি সকল। অতি সঙ্গত অর্থ। তবে শিবলিঙ্গের কেবল সেই অর্থ না করিয়া কদর্য উপন্যাস ও উপাসনাপদ্ধতিতে যাই কেন?'

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র শিবলিঙ্গ অর্থে বিষ্ণুমূর্তির ন্যায় শিবমূর্তিই চেয়েছেন এবং প্রচলিত শিবলিঙ্গ পূজার কাহিনীকে ও শিবলিঙ্গ পূজাকে 'কদর্য উপন্যাস ও উপাসনাপদ্ধতি' বলেছেন।

যে বঙ্কিমচন্দ্র শিবলিঙ্গ পূজাকেই বলেছেন, 'কদর্য উপাসনা পদ্ধতি', রামকৃষ্ণ

কর্তৃক শিবলিঙ্গ বোধে এবং জীবন্ত লিঙ্গপূজা বোধে নিজের লিঙ্গ পূজা এবং ফুলচন্দন দিয়ে ছেলেদের ধন পুজোর কথা শুনলে সেই বঙ্কিমচন্দ্র একেও যে 'কদর্য উপাসনা পদ্ধতি' বলতেন, তাতে আর সন্দেহ কি।

শ্রীম-র লেখা অনুযায়ী দেখছি, রামকৃষ্ণ যে 'রাধাযন্ত্র' 'ব্রহ্মযোনি' ইত্যাদির কথা বলতেন, বঙ্কিমচন্দ্র এ সবও বিশ্বাস করতেন না। শ্রীম লিখেছেন—রামকৃষ্ণ বলতেন—'স্বয়ং কৃষ্ণ রাধাযন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন।'

কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' পড়লেই জানতে পারবেন, বঙ্কিমচন্দ্র রাধাতত্ত্ব বা ব্রজগোপীতত্ত্বে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—'আমি ভূরি ভূরি প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়াছি যে, এ সকল পুরাণকার কল্পিত উপন্যাস মাত্র, ইহার মধ্যে কিছু সত্যতা নাই।'

রামকৃষ্ণ বলতেন—ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হচ্ছে। তিনি বেলতলায় সেই ব্রহ্মযোনি দেখতেন লক্ লক্ করতো।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞান রহস্য' বইটি পড়লে দেখা যায়, তিনি কি গভীর ভাবে বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এসব ব্যাপারে তিনি অন্ধ বিশ্বাসে চালিত না হয়ে, যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তার দ্বারাই চালিত হতেন।

এই জন্যই তিনি তাঁর 'বিজ্ঞান রহস্য' গ্রন্থে 'কতকাল মনুষ্য' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন—'খ্রীষ্টানদিগের প্রাচীন গ্রন্থানুসারে মনুষ্যের সৃষ্টি এবং জগতের সৃষ্টি ··যেদিন জগদীশ্বর কুম্ভকাররূপে কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া ছয়দিনে তাহাতে মনুষ্যাদি পুত্তল সাজাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টানেরা অনুমান করেন যে, সে ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে। একথা খ্রীষ্টানেরাও আর বিশ্বাস করেন না। আমাদিগের ধর্মপুস্তকের কথার প্রতি আমরাও সেইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়াছি। বিজ্ঞানের প্রবাহে সর্বত্রই ধর্মপুস্তক সকল ভাসিয়া যাইতেছে।'

এখন কথা হচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণের ঐরূপ পূজা পদ্ধতির কথা বা তাঁর মুখে 'অশ্লীল' কথা বেরোয় একথা শুনে ছিলেন কি না? এটা খুবই স্বাভাবিক যে, বঙ্কিমচন্দ্র লোক মুখে রামকৃষ্ণের কথা এবং তিনি কি বলেন ও কি করেন, তা শুনে থাকবেন। কেননা বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়া ও আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে কয়েক বৎসর কলকাতাতেই ছিলেন। কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর বেশী দূর নয়। কলকাতা থেকে অনেক লোকই তখন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে এবং কেউ কেউ রামকৃষ্ণের কাছেও যেতেন।

অতএব যে রামকৃষ্ণ বেলতলায় ব্রহ্মযোনি দর্শন হতো ইত্যাদি বলতেন—তাঁকে দেখবার জন্য যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-ভিত্তিক চিন্তায় চিন্তিত, পণ্ডিতাগ্রগণ্য ও নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্র গিয়েছিলেন, এ সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।

এখন একটা কথা। প্রশ্ন উঠবে—'সরল সাধক' পরমহংস দেব আপন সাধন পদ্ধতিতে কোন এক সময়ে লিঙ্গপূজা করে থাকলে বা নিজের নির্মল মনে, আমাদের কানে 'অশ্লীল' শোনায় এমন কথা কখন উচ্চারণ করে থাকলেও, তিনি তো অন্য সকল সময়ে ভাল কথা বা ধর্ম কথাই বলতেন এবং গভীর নিষ্ঠার সহিত দেব-দেবীর উপাসনাও করতেন। অতএব সেই সময়ে বা সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাতে বাধা ছিল কোথায়?

এরও অন্তত একটা উত্তর—রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে পরমহংস দেবের সাক্ষাতের কথা কাগজে বেরোল, রামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সাক্ষাতের কথা বেরোল না কেন? অক্ষয় সেন ও শ্রীমর লেখায় তো আছে, অধর সেনের বাড়িতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে এবং বেশ সমারোহের মধ্যেই উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা—শিকাগো ধর্ম-সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে ব্রাহ্ম-নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দেশে ফিরলে হাওড়া স্টেশনে তাঁকে অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সমুৎসুক হয়েছিলেন। অথচ এ ব্যাপারে রামকৃষ্ণের প্রধান-শিষ্য বিবেকানন্দকে অভিনন্দন তো নয়ই, এমন কি তাঁর সম্বন্ধে তিনি একটা কথা কোথাও বলেন নি। এ থেকেও বলা যেতে পারে রামকৃষ্ণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন আকর্ষণই ছিল না।

পঞ্চমতঃ—রাম দত্ত প্রভৃতি যে-অধর সেনের বাড়িতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা হয়েছিল বলে লিখেছেন, আমার অনুমান সেই অধর সেনের সঙ্গে হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের কোন সাক্ষাৎ পরিচয়ই ছিল না।

শ্রীম লিখেছেন—অধর সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণকে দেখাবার জন্য।

অধর সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সত্য। কিন্তু

তাই বলে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব তো ছিলই না, এমন কি পরিচয়েরও সুযোগ হয়নি বলেই মনে হয়।

দীনবন্ধু মিত্র, জগদীশনাথ রায় প্রভৃতি দু এক জন ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে কোন বন্ধুই ছিল না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন—'আমরা তাঁহার কি ছিলাম? যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে থাকিতেন, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে কিভাবে দেখিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। তাঁহাকে সখা বলিবেন, সে স্পর্ধা কেহ রাখিতেন না।'—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

অধর সেন বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা ১৭।১৮ বছরের ছোট ছিলেন। অধর সেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ৭ম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর হয়ে চট্টগ্রামে নিযুক্ত হন। পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ চাকরিরই ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে যশোহরে আসেন। এরপর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে থেকেই কলকাতায় কালেক্টরের অধীনে এসে কাজ করতে থাকেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে থেকে তিনি কলকাতায় কাজ করেন।

শ্রীম লিখেছেন, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর শনিবার কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে অধর সেনের বাড়ীতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা হয়েছিল। অক্ষয় সেন কিন্তু তাঁর বইয়ে লিখেছেন, সেদিন কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি ছিল না, সেদিন ছিল অমাবস্যা তিথি।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দেখা যায়, অধর সেন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে থেকে কলকাতার কালেকটরের অধীনে কাজ করছেন এবং মাহিনা পাচ্ছেন ৩০০ টাকা, আর বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় ১ম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর হয়ে হাওড়ায় আছেন এবং মাহিনা পাচ্ছেন ৮০০ টাকা।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সংশোধিত গবর্ণমেণ্টের উচ্চ চাকুরে-দের সিভিল লিষ্টে দেখা যায়, ঐ সময় বাঙ্গলায় ১ম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর ৭ জন, ২য় শ্রেণীর ১১ জন, ৩য় শ্রেণীর ২০ জন, ৪র্থ শ্রেণীর ৪১ জন, ৫ম শ্রেণীর ৭২ জন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ৬১ জন এবং ৭ম শ্রেণীর ৩৮ জন ছিলেন। এঁরা ছাড়া প্রবেশনারী বা অফিসিয়েটিং অফিসার ৩১ জন, স্পেশ্যাল ডেপুটি কালেকটর ১৪ জন এবং বিভিন্ন গ্রেডের সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর ছিলেন প্রচুর।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সময় এই শত শত দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটরদের, এমন কি বহু সাহেব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটেরও উপরে ছিলেন।

ঐ সময় প্রথম শ্রেণীর যে ৭ জন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁদের প্রথম ৫জন ছিলেন ইউরোপীয়, এঁদের পরেই ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

একজন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর নবীন কর্মচারীর সঙ্গে একজন ১ম শ্রেণীর প্রবীণ কর্মচারীর, তাও আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মত গম্ভীর ও রাসভারী প্রকৃতির মানুষের কি করে যে বন্ধুত্ব হ'তে পারে. তা বুঝা কঠিন। বন্ধুত্ব তো দূরের কথা, সেকালে একজন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর কর্মচারী একজন ১ম শ্রেণীর ঐরূপ কর্মচারীর সামনে যেতেই সাহস পেত না। আর গেলেও গিয়ে 'স্যার' 'স্যার' করেই সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত।

চাকরিতে ঐ গ্রেডের বা শ্রেণীর বিরাট পার্থক্য থাকলেও, উভয়ে যদি কখন একই জায়গায় কাজ করতেন, তাহলেও অন্তত পরিচয় হতে পারত। কিন্তু উভয়ে এক জায়গায় কখনই কাজ করেন নি। অধর সেন ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম, যশোহর ও কলকাতায় কাজ করেছেন; আর বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় হুগলী, হাওড়া, কলকাতা (অস্থায়ী আসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি), আলিপুর. বারাসত, আলিপুর, জাজপুর ও হাওড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। অতএব এ থেকেও অনুমান হয়, উভয়ের মধ্যে পরিচয় ছিল না।

এখন আর একটা কথা, অধর সেন কর্ম-জীবনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হলেও তিনি একজন কবিও ছিলেন। তিনি দু একটা কবিতার বইও লিখেছিলেন। এই সাহিত্য সূত্রেই কি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল?

সাহিত্যিক হলেই যে সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাত্তা পেতেন তা মোটেই নয়। তিনি সাহিত্য নিয়ে কারও ছেলেখেলাকে আদৌ বরদাস্ত করতেন না। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণ করলে জানা যায় যে, তিনি অক্ষম সাহিত্যিকদের কখন ক্ষমা করেন নি বা তাঁদের প্রতি কৃপাও দেখান নি।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র তৃতীয় বৎসরের ৪র্থ সংখ্যায় (১২৮১ সালের শ্রাবণ) দেখছি, অধরলাল সেনের 'ললিতা সুন্দরী' (১ম সর্গ) নামক একখানি কবিতার বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বইটির সমালোচনা প্রকাশিত হলেও, লেখাটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের তা সঠিক বলা যায় না। কেন না, আজও মাসিক পত্রে নূতন গ্রন্থের সমালোচনা সম্পাদকের চেয়ে অন্য লোকেই বেশী করে থাকেন। যাঁরই লেখা হোক, ঐ লেখায় কিন্তু অধর সেনের মোটেই প্রশংসা করা হয় নি।

বরং তাঁকে তিরস্কৃতই করা হয়েছে। লেখাটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বলে ধরলেও এই লেখা থেকে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, অধর সেনকে বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষাৎ ভাবে চিনতেন।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে অধর সেনের নাম আর কোথাও পাওয়া যায় না। পরে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে (সঞ্জীবচন্দ্র ঐ সময় বঙ্গদর্শনের মালিকও ছিলেন) ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অধর সেনের 'নলিনী' কবিতা বইয়ের একটি অতি ছোট্ট সমালোচনা বেরিয়েছিল। তাতে কিছু প্রশংসা, কিছু নিন্দা ছিল।

যাই হোক্, বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ গম্ভীর ও রাসভারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং অপরের রচনা সম্পর্কে যেরূপ তীব্র ও নিরপেক্ষ সমালোচক ছিলেন, তাতে তরুণ বয়স্ক এবং সাহিত্যে ঐরূপ অল্প প্রতিভা-সম্পন্ন অধর সেন পরে যে সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন, তা মনে হয় না। সে যুগের কারও লেখা থেকেও এরূপ কথা জানা যায় না।

অতএব অধর সেনের সাহিত্য জীবন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জীবন উভয়ই আলোচনা করে এখন বলা যেতে পারে যে, অধর সেনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুত্ব তো দূরের কথা, হয়ত পরিচয়ই ছিল না।

এখন কেউ হয়ত বলবেন—রাম দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালেই ১২৯৭ সালে (বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩০০ সালে) তাঁর বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা লিখেছিলেন, ঐ লেখা যদি ভুল হ'ত তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রই তো আপত্তি করতেন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—রাম দত্ত ১২৯৭ সালে তাঁর রামকৃষ্ণ জীবনীতে এবং ১৩১২ সালে তাঁর বক্তৃতাবলীতে শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে লিখেছিলেন। তর্কচূড়ামণি রামকৃষ্ণের বিশেষ পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও রাম দত্তের ঐ লেখা বহু বৎসর তাঁর নজরেই পড়ে নি। পরে একজন (পদ্মনাথ ভট্টাচার্য) তর্কচূড়ামণিকে রাম দত্তের ঐ লেখার কথা বললে, তখন তিনি ১৩২৭ সালে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। তেমনি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন আগ্রহ না থাকায় রাম দত্তের বই তাঁর নজরে না আসারই কথা। এখন অন্য কেউ যদি ঐ বই পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে জানান। এমনও হতে পারে, তাঁর জীবিতকালে অন্য কেউ তাঁকে জানান নি। আর যদি জানিয়েই থাকেন, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিবাদ নাও করতে পারেন। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কিছু লিখলে তিনি সাধারণতঃ

তার প্রতিবাদ করতেন না। আবার হতে পারে, হয়ত তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন ; কিন্তু তাঁর কথা গ্রহণ করা হয় নি। কেননা, রামকৃষ্ণ-ভক্তদের কারও কারও লেখার মধ্যে দেখা যায়, তাঁদের ভুল লেখার প্রতিবাদ জানালে, তার সংশোধন হয় নি।

স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে কি রামকৃষ্ণ-শশধর তর্কচূড়ামণি প্রসঙ্গ, আর কি রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই মূলতঃ রাম দত্তর লেখাকেই অনুসরণ করে লিখেছেন। কেবল রাম দত্তর লেখার উপর বাড়তি একটু আধটু মন্তব্য বা কিছু অতিরিক্ত যোগ করেছেন। যেমন, তিনি রামকৃষ্ণ-শশধরের প্রথম সাক্ষাতের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'এ বৎসর (১৮৮৫ খ্রীঃ) রথের দিনে…পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাইয়া ঠাকুর সেদিন পণ্ডিতজীকে নানা অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে 'চাপরাশ' বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া ধর্মপ্রচার করিতে যাইলে উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় এবং কখন কখন প্রচারকের অভিমান অহংকার বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, এ সকল কথা ঠাকুর পণ্ডিতজীকে এই প্রথম দর্শন কালেই বলিয়া ছিলেন। এই সকল জ্বলন্ত শক্তি-পূর্ণ মহাবাক্যের ফলেই পণ্ডিতজী কিছুকাল পরে প্রচার কার্য ছাড়িয়া ৺কামাখ্যাপীঠে তপস্যায় গমন করেন, ইহা আর বলিতে হইবে না।'—রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ. গুরুভাব, উত্তরার্ধ।

চাপরাশ পাওয়া সম্বন্ধে স্বয়ং তর্কচূড়ামণির প্রতিবাদের কথা আগেই বলেছি। এখন সারদানন্দের লেখার শেষাংশে তাঁর মন্তব্যটা সম্বন্ধে কিছু বলছি।

সারদানন্দের ঐ মন্তব্য সম্বন্ধে আসামের গৌহাটি-নিবাসী পদ্মনাথ দেবশর্মা তখন প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন—'লীলা প্রসঙ্গকার কিরূপে অবগত হইলেন যে, পণ্ডিতজী বক্তৃতা ছাড়িয়া ৺ কামাখ্যায় তপস্যার্থ গমন করিয়া ছিলেন? চূড়ামণি মহাশয় ধর্মবক্তৃতা প্রসঙ্গেই কামরূপেও আসেন এবং ৺ কামাখ্যা দর্শনাদি করিয়া যান। আমরা জানি, তিনি ১৮৮৮-৮৯ অব্দে শ্রীহট্ট, কাছাড় অঞ্চলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই সকল লেখক যে কত অসত্য

এভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?' —সাহিত্য, মাঘ ১৩২৮।

সারদানন্দ লিখেছেন, ১৮৮৫ সালে তর্কচূড়ামণির সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এ কথাটাও ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে একটা অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছি—২৬-৭-৮৪ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজে দেখছি, রামকৃষ্ণ-শশধর তর্কচূড়ামণির এক সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। কথাবার্তার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাতে আছে—তর্কচূড়ামণি রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা উঠে যাওয়া উচিত কিনা? উত্তরে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন—ফল পাকলে আপনা হতেই গাছ থেকে পড়ে যায়। কাঁচা ফল তোলা ভাল নয়।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-তর্কচূড়ামণির ঐ সাক্ষাতের কথা রাম দত্ত কোথাও বলেন নি। আর সারদানন্দ, অক্ষয় সেন, শ্রীম প্রভৃতি যাঁরা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখেছেন, তাঁরাও রামকৃষ্ণ-তর্কচূড়ামণির কথা বলতে গিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ-তর্কচূড়ামণির ঐ সাক্ষাতের কথা কোথাও বলেন নি। এঁরা কেবল রাম দত্তের লেখা ঐ রামকৃষ্ণ-তর্কচূড়ামণির কথাকেই (আমার আগের আলোচনায় যা সত্য নয় বলেই প্রতিভাত হয়েছে) ফেনিয়ে ফেনিয়েই লিখে গেছেন।

সারদানন্দ তাঁর গ্রন্থে রামকৃষ্ণ-তর্কচূড়ামণির প্রথম সাক্ষাতের কথাটা যেমন রাম দত্তের লেখা থেকে নিয়েছেন, তেমনি তিনি রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গের বেলাতেও মূলতঃ রাম দত্তকেই অনুসরণ করেছেন।

সারদানন্দ তাঁর গ্রন্থের এক জায়গায়, কোন এক প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের বলা স্যাকরাদের সোনা চুরি করার একটা গল্প বলেই পাদটীকায় লিখেছেন—"ঠাকুরের পরম ভক্ত অধর সেনের ভবনে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যেদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেদিন বঙ্কিমবাবু সন্দেহবাদীর পক্ষাবলম্বন পূর্বক ঠাকুরকে ধর্মবিষয়ে নানা কূট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ সকলের যথাযথ উত্তর দিবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে পরিহাসপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'তুমি নামেও বঙ্কিম কাজেও বঙ্কিম।' প্রশ্ন সকলের হৃদয়স্পর্শী উত্তর লাভে প্রীত হইয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আপনাকে একদিন আমাদের কাঁটালপাড়ার বাটীতে যাইতে হইবে, সেখানে ঠাকুর সেবার বন্দোবস্ত আছে এবং আমরা সকলেও হরিনাম করিয়া থাকি।' ঠাকুর তাহাতে

রহস্যপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'কেমনতর হরিনাম গো, স্যাকরাদের মত নয় তো ?' বলিয়াই পূর্বোক্ত গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন এবং সামান্য হাস্যের রোল উঠিয়াছিল।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, রাম দত্তের লেখা ঐ 'বঙ্কিম (বাঁকা)' কথাটা নিয়েই সারদানন্দও লিখেছেন—'তুমি নামেও বঙ্কিম কাজেও বঙ্কিম।' তবে রামকৃষ্ণ কেন বঙ্কিম (নামে এবং কাজেও) বলতে পারেন, সারদানন্দ তারই একটা কারণ দেখিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহবাদীর পক্ষাবলম্বনপূর্বক রামকৃষ্ণকে ধর্মবিষয়ক নানা কূট প্রশ্ন করেছিলেন এবং রামকৃষ্ণও সে সকলের যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন—সারদানন্দ একথা লিখলেও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একটাও প্রশ্ন এবং রামকৃষ্ণের একটাও উত্তর, উল্লেখ করতে পারেন নি। এ থেকেও বলা যেতে পারে যে, তিনি রাম দত্তের কথাটার উপরেই শুধু মন্তব্য করেছেন বা ঐ কথাটার একটা কারণ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আর বাকি কথাগুলো নিজের।

এবার সারদানন্দের লেখায় বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক তাঁদের কাঁটালপাড়ার-বাড়িতে রামকৃষ্ণের যাওয়ার নিমন্ত্রণের কথা। এ কথাটিও সারদানন্দ কোথা থেকে জেনে লিখেছেন, তা বলেন নি। অনুমান হয়, তর্কচূড়ামণি প্রসঙ্গের শেষাংশের মত এটিও তাঁর নিজস্ব সংযোজন। সারদানন্দের এ কথাকে অবিশ্বাস করার হেতু, প্রথমতঃ—বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় কাঁটালপাড়ার সঙ্গে একরূপ সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। কারণ, তিনি নিজেই লিখেছেন—'পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের (১৮৮১) পর আমরা দুই জনের দুইটি সংকল্প কার্যে পরিণত করিলাম। আমি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম—সঞ্জীবচন্দ্র চাকুরি ত্যাগ করিলেন।' —সঞ্জীবনী সুধা।

শ্রীম যিনি রাম দত্ত, অক্ষয় সেন ও সারদানন্দের লেখা নিয়ে নিজেব বইয়ে দিয়েছেন, তিনি সম্ভবতঃ এ কথা জানতেন বলেই, তাঁর বইয়ে আর কাঁটালপাডার কথা লেখেন নি। শুধু লিখেছেন—'বঙ্কিম—একটি প্রার্থনা আছে। অনুগ্রহ করে কুটীরে একবার পায়ের ধুলো—'

সারদানন্দের এই কাহিনী অবিশ্বাস করার আরও হেতু, তাঁর বইয়েও কিছু বানানো এবং বিকৃত কাহিনী রয়েছে বলেই। যেমন—আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি—সারদানন্দ তাঁর বইয়ে অভেদানন্দকে নিয়ে কাশীপুর বাগান বাড়ির একটি ঘটনা বিকৃত করে লিখেছেন বলে অভেদানন্দ তাঁর 'আমার জীবন কথা'

গ্রন্থে সারদানন্দের ঐ লেখার প্রতিবাদ করে গেছেন। অভেদানন্দ এই নিয়ে সারদানন্দকে একটি চিঠি দিলে, তিনি ভুল স্বীকার করে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেবেন বলে অভেদানন্দকে একটি চিঠিও দিয়ে ছিলেন। সারদানন্দের মৃত্যুর পর 'রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' বইয়ের সে ভুল আর সংশোধন হয় নি। ফলে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ তাঁদের 'মন ও মানুষ' গ্রন্থে সারদানন্দের সেই ভুল স্বীকার করা চিঠির কথা এখন মুদ্রিত করে দিয়েছেন।

অতএব, সারদানন্দের বইকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা 'অভ্রান্ত' বললেও, এর সকল কথাই সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় না।

১৩৫২ সালে রাম দত্তের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবন কথা' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই ৬ষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকায় রাম দত্তেরই কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানের সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ লিখেছেন—'পুস্তকখানির পঞ্চম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ইহাই ঐ বিষয়ে একমাত্র পুস্তক ছিল।'

মাধবানন্দ তাঁর লেখা ঐ ভূমিকায় পরবর্তীকালে লেখা হয়েছে বলে শ্রীমর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' এবং স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' বই দুটির নাম করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য যে, তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৩০৭।৮ সালে প্রকাশিত ৫৭৯+২ পৃষ্ঠার বই অক্ষয় সেনের রামকৃষ্ণ পুঁথির কোথাও নামই করেন নি। এর কারণ মনে হয়, মাধবানন্দ জানতেন যে, অক্ষয় সেনের ঐ বই মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং ঐ বইয়ে বহু বানানো অসত্য কাহিনী রয়েছে। তাই তিনি এই বইয়ের নাম পর্যন্তও উল্লেখ করেন নি।

অক্ষয় সেনের রামকৃষ্ণ পুঁথিতে যে ভুল বা বানানো কাহিনী আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী অভেদানন্দও সে কথা তাঁর 'আমার জীবন কথা' গ্রন্থে লিখে গেছেন।

যোগোদ্যান আশ্রমের মাধবানন্দ বা বেদান্ত মঠের অভেদানন্দই শুধু নন, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরাও অক্ষয় সেনের বইয়ের বহু কাহিনীকে, এমন কি তাঁর নিজের জীবনের ঘটনা বলে বর্ণিত কাহিনীকেও বিশ্বাস করেন নি।

অক্ষয় সেন তাঁর বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন, কলকাতায় দেবেন্দ্র মজুমদার নামে রামকৃষ্ণের এক ভক্তের বাড়িতে তিনি রামকৃষ্ণের পদ সেবা করেছিলেন। অক্ষয় সেন লিখেছেন—

·· দক্ষিণেতর শ্রীপাদ শ্রীগুণধর
প্রসারণ কৈলা মম কোলে,
কমলার সেব্য পাদ সেবিয়া মিটানু সাধ
জনম সফল ধরাতলে।

স্বামী গম্ভীরানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা' গ্রন্থে অক্ষয় সেনের কথা লিখতে গিয়ে এই ঘটনাটি সম্বন্ধে লিখেছেন—ভক্ত-গোষ্টিতে ইহা বিদিত ছিল যে, ঠাকুর তাঁহাকে ঐভাবে শ্রীঅঙ্গ স্পর্শের অধিকার সাধারণতঃ দিতেন না। বলিতেন 'মনের ময়লা কাটুক তারপর হবে।'*

অক্ষয় সেন লিখেছেন—রামকৃষ্ণের পা কমলারও সেব্য।

গম্ভীরানন্দ নিজে রামকৃষ্ণ ভক্ত হলেও, অক্ষয সেনের এতটা বাড়াবাড়ি হয়ত বরদাস্ত করতে পারেন নি। তাই তিনি তাঁর বইয়ে অক্ষয় সেন সম্বন্ধীয় লেখায় অক্ষয় সেনের পুঁথি থেকে অক্ষয় সেনের 'বানর বানর খেলা' প্রভৃতি উদ্ধৃত করলেও, পুঁথি থেকে এ কাহিনীটার একটা কথাও উদ্ধৃত করেন নি।

অক্ষয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁর বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রকাশক রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আত্মবোধানন্দ লিখেছেন—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। …এই সংস্করণে স্থানে স্থানে সামান্য সংশোধন করা হইয়াছে।'

আত্মবোধানন্দের লেখা এই ভূমিকা থেকেও দেখা যাচ্ছে, ইনিও স্বীকার করেছেন, অক্ষয় সেনের বইয়ের ১ম ও ২য় সংস্করণে ভুল ছিল এবং ইনি এঁর বিবেচনা মত সে সব ভুল 'স্থানে স্থানে সংশোধন' করে দিয়েছেন।

আত্মবোধানন্দ পুঁথির স্থানে স্থানে সামান্য সংশোধন করলেও রামকৃষ্ণ মিশনেরই অন্যান্য সন্ন্যাসীরা (গম্ভীরানন্দ ছাড়াও) ঐ বইয়ের অসংশোধিত বহু ঘটনাকেও বিশ্বাস করেন না। যেমন, সারদানন্দ অক্ষয় সেনের সকল কথাকে বিশ্বাস করেন নি বলেই, তিনি তাঁর রামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ বইয়ে অক্ষয় সেন বর্ণিত বহু কাহিনীকেই তাঁর গ্রন্থভুক্ত করেন নি।

অক্ষয় সেন রচিত এ হেন মনগড়া কাহিনীতে ভরা রামকৃষ্ণ পুঁথি বইয়ের এক জায়গায় আছে—

একবার মহোৎসব অধরের ঘরে
অনেক সম্ভ্রান্তবর্গে একত্রিত করে ॥
ইদানীর নব্য সভ্য সবে পাশ করা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত তাঁরা ॥
চাটুজ্যে বঙ্কিম পদে মাজিষ্টর।
নব্য সভ্যদের মধ্যে ভারি নাম তাঁর ॥
সবান্ধবে উপনীত আজিকার দিনে।
একদিকে সমাসীন ব্রাহ্ম ভক্ত গণে ॥
তাঁহাদের মধ্যে বড় মিষ্ট-কণ্ঠ যিনি।
ত্রৈলোক্য সান্যাল নামে সুবিদিত তিনি ॥

এর পরেই অক্ষয় সেন যা লিখেছেন, তার সারাংশ হচ্ছে এই—সেদিন ছিল অমাবস্যা তিথি এবং রাত্রি তখন প্রায় ছয় দণ্ড। অমাবস্যায় রামকৃষ্ণের 'ক্রিয়া-কাণ্ড আচরণ তান্ত্রিক বিধানে' হ'ত বলে, সেদিন তিনি বোতলে কিছু মদ নিয়ে এসেছিলেন এবং সে মদ তাঁর ভক্ত নিরঞ্জন 'গাত্রবস্ত্র আবরণে' বগলে লুকিয়ে রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণ অমাবস্যায় কোন 'ক্রিয়ায়' কপালে মদের ফোঁটা পরতেন।

এরপর অক্ষয় সেন তাঁর পুঁথিতে লিখেছেন—

শ্রীপ্রভুর বেশভুষা-সজ্জা নিরীক্ষণে।
প্রথমে অবজ্ঞাভাব বঙ্কিমের মনে ॥
ধনমান বিদ্যামদে হয় যে রকম।
অহঙ্কারে ধরাবোধ সরার মতন ॥
শ্রীপ্রভু অন্তর্যামী বুঝিয়া অন্তরে।
সাদরেতে সম্ভাষণ করিলেন তাঁরে ॥
কি মধুর শ্রীপ্রভুর বাক্যের মাধুরী।
বর্ণে বর্ণে খেলে তায় রসের লহরী ॥
পরে জিজ্ঞাসিলা তারে গুণধর রায়।
মানুষের কার্য কিবা আসিয়া ধরায় ॥

উত্তরে মার্জিত-বুদ্ধি কহিল বঙ্কিম।
মৈথুন আহার আর নিদ্রা এই তিন ॥
অতি ঘৃণা সহকারে প্রভু তাঁয় কন।
সাজে না তোমার মুখে এ হেন বচন ॥
তুমি ত ছেঁছড়া লোক হীন বুদ্ধি ভারি।
যে কার্য করিতে চিন্তা দিবা বিভাবরী,
কিংবা যেই কর্ম নিজে কর আচরণ,
তাহাই সভায় তুমি কৈলা উচ্চারণ ॥
উপমা সহিত পরে কহেন ঠাকুর।
খাইলেই মুলা উঠে মূলার ঢেঁকুর ॥
স্বভাব না থাকে চাপা স্বভাবের জোরে।
উপরেতে উঠে তাই যেমন ভিতরে ॥
বঙ্কিমে দেখিয়া প্রভু সলজ্জ বদন।
ঈশ্বরীয় কথা পরে কৈলা উত্থাপন ॥
তত্ত্বকথা আলাপনে কিছুক্ষণ যায়।
ব্রাহ্মগণে সঙ্গীতে ইঙ্গিত কৈলা রায় ॥
একতারা খোল আর করতাল সনে।
সঙ্গীত আরম্ভ কৈলা ব্রাহ্ম ভক্ত গণে ॥

এর পরেই আবার অক্ষয় সেন লিখেছেন—

ত্রৈলোক্যের মিষ্ট কণ্ঠে সকলে মোহিত হ'ল। এদিকে রামকৃষ্ণ আবেশ ভরে কীর্তন ও নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁর 'জগ বিমোহন নর্তন' দেখে সকলে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। নিরঞ্জন রামকৃষ্ণের সঙ্গে নাচতে নাচতে তাঁর বগলে যে মদের বোতল লুকানো ছিল, তা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। বোতলে কি ছিল, দেখবার জন্য সকলে শুঁকলে, তাঁরা মদের গন্ধের বদলে ডি. গুপ্তর পাঁচনের গন্ধ পেলেন। এই মদ পাঁচন হওয়ার কথাটা একজন পরের দিন গিরিশ ঘোষকে বলে। গিরিশ ঘোষ তখন মদ খাচ্ছিলেন। তিনি এই কথা শুনে অবিশ্বাস করলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমস্ত বোতলের মদই ডি. গুপ্তর পাঁচন হয়ে গেল। এর পরেই অক্ষয় সেনের বইয়ে গিরিশ ঘোষের সমস্ত মদের বোতলের মদ কেবল জল হয়ে যাওয়ায় আরও এক কাহিনী আছে। সারদানন্দ এমন কি শ্রীমও অক্ষয় সেনের এই মদ জল বা পাঁচন হওয়াব কথাকে আজগুবি বলে

ধরেন। তাই তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে এ কথার আর উল্লেখই করলেন না। তবে শ্রীম একথা না লিখলেও অক্ষয় সেনের লেখা থেকে 'উত্তরে মার্জিত বুদ্ধি কহিল বঙ্কিম। মৈথুন আহার আর নিদ্রা এই তিন।' এবং 'তত্ত্বকথা আলাপনে কিছুক্ষণ যায়।' এই কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করে অনেক ফুলিয়েছেন। শ্রীম তাঁর বইয়ের পৃষ্ঠা বাড়াবার জন্য রাম দত্ত এবং সারদানন্দের বই থেকেও রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গের কথাগুলি নিয়েছেন এবং নিজের দেওয়া অনেক কাহিনী রচনা করেছেন।

সারদানন্দ অক্ষয় সেনের লেখায় এই বঙ্কিম ও গিরিশ প্রসঙ্গের সমস্তটাকেই অবিশ্বাস্য ও আজগুবি বলে বুঝেছিলেন। তাই তিনি তাঁর বইয়ে এঁর লেখার কোন কথাই দেন নি।

রাম দত্ত তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—রামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিম (বাঁকা) বলে পরিহাস করেছিলেন।

সারদানন্দ রাম দত্তের এই লেখা পড়ে তার উপর নিজের কথা কিছু যোগ করে তাঁর বইয়ে রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গটা লিখেছেন।

রাম দত্তের এই লেখা ভিত্তি করেই অক্ষয় সেন (যাঁর মনের ময়লা কাটেনি) স্থির করেন—রামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে যখন বাঁকা বলে পরিহাস করে ছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণের কোন প্রশ্নের বাঁকা উত্তর দিয়ে ছিলেন। অতএব রামকৃষ্ণের মুখে 'মানুষের কাজ কি?' প্রশ্ন এবং বঙ্কিম-চন্দ্রের মুখে বাঁকা উত্তর 'মৈথুন, আহার আর নিদ্রা এই তিন' দাও বসিয়ে।

মূল রাম দত্তের একই কথাকে নিয়ে সারদানন্দ এবং অক্ষয় সেন উভয়েই লিখলেও, অক্ষয় সেন যে এমনটা লিখতে পেরে ছিলেন, তার কারণ, তাঁর নিজের 'মনে ময়লা' ছিল বলেই।

শ্রীম তাঁর গ্রন্থের প্রতিটি ভাগের প্রথমেই লিখেছেন—'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভক্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত যাহা বলিয়াছেন,—আর যাহা ভক্তেরা সেইদিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত এই জাতীয় উপকরণ। শ্রীম নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে

শুনিয়াছিলেন, তিনি সেইদিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেইগুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diaryতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।…

ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্তেরা নিজে যাহা শুনিয়াছিলেন, আর এক্ষণে স্মরণ করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল।…তবে চব্বিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। লিপিবদ্ধ থাকতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবনা।…

শ্রীশ্রীকথামৃত প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন।…ইং ১৯১০।'

শ্রীম নিজেই বলেছেন—রামকৃষ্ণের কাছে বসে যে সব শুনেছেন, পরে সে সব লিখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কাছে বসে লেখেন নি। শ্রীমর বইয়ে ৩০।৪০ পৃষ্ঠা করে লেখা রাম-কৃষ্ণের এক এক সময়ের দীর্ঘ আলোচনা বা কথাবার্তা সঙ্গে সঙ্গে না লিখে পরে লিখলে, তাতে যে শ্রীমর নিজের অনেক কথাই ঢুকবে, তা বলাই বাহুল্য। কেন না শ্রীম এমন শ্রুতিধর ছিলেন না যে, পরে ঐ অত কথা লিখবার সময় তিনি স্মৃতি থেকে হুবহু সেই কথাগুলোই লিখেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—'লিপিবদ্ধ থাকাতে যে ভুলের সম্ভাবনা' এই কথা বলে শ্রীম নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর ডায়রির লেখাতেও ভুল ছিল।

তৃতীয়তঃ—প্রথম জাতীয় উপকরণের (রামকৃষ্ণের মুখের কথা শুনে সেই দিনই শ্রীম বা অন্য কোন ভক্তের লেখা ডায়রি) উপর নির্ভর করে কথামৃত লেখা, শ্রীম একথা বললেও তাঁর বইয়ের অনেক লেখার ন্যায় রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গটিও কিন্তু মোটেই তা নয়। কেন না, এক তো শ্রীম নিজে সেদিন উপস্থিত ছিলেনই না, দ্বিতীয়তঃ কারও ডায়রি থেকেও নেওয়া নয়। এটা আসলে অক্ষয় সেন (মনের ময়লাওয়ালা), রাম দত্ত ও সারদানন্দের সকলের লেখা থেকেই নেওয়া। তার উপর শ্রীমর আরও কিছু নিজের লেখা।

সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি তাঁর ডায়রি অবলম্বন করে (ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নয়, একই বিষয় নিয়ে) কোন গ্রন্থ লিখলে, পর পর দিনের ঘটনাই পর পর লিখে যান। এইটাই স্বাভাবিক। শ্রীম কিন্তু এই অতি স্বাভাবিক পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন নি। যেমন—তিনি ২৭-১২-৮৩ তারিখের ঘটনা তাঁর বইয়ের তৃতীয় ভাগে, ২৪-১২-৮৩ তারিখের ঘটনা তৃতীয় ভাগের ক' বৎসর পরে প্রকাশিত

চতুর্থ ভাগে, আবার ২৬-১২-৮৩ তারিখের ঘটনা চতুর্থ ভাগের ২২ বৎসর পরে প্রকাশিত পঞ্চম ভাগে প্রকাশ করেছেন। কেহ হয়ত বলবেন, তিনি অপরের কাছ থেকে পরে পরে যেমন সংগ্রহ করেছেন, তেমনি পরে পরে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একথা শ্রীমর বই সম্বন্ধে আদৌ চলে না। কেননা শ্রীম তাঁর ডায়রি থেকে একই দিনের এক সময়ের ঘটনা একভাগে, আবার সেই দিনের অন্য সময়ের ঘটনা অন্য ভাগে প্রকাশ করেছেন। অথচ বিষয় বস্তুর দিক থেকে যে তেমন কিছু পার্থক্য রয়েছে, তাও নয়। যেমন—শ্রীম তাঁর ডায়রি থেকে ২৮-৭-৮৫ তারিখের রাত্রি ৮টার পরের কথাগুলি তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে (১৯ খণ্ড ২ পরিচ্ছেদ) দিয়েছেন। আবার ঐ তারিখেরই বিকাল ৫।। টার কথাগুলো ক' বৎসর পরে প্রকাশিত তৃতীয় ভাগে দিয়েছেন। শ্রীম বলেছেন, ঐদিন রাত্রি ৮টার পর ও বিকাল ৫।। টায় উভয় সময়েই তিনি রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন। প্রথম বারে এক শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়িতে রাম-কৃষ্ণের উপস্থিতির কথা শ্রীম লিখেছেন। আর দ্বিতীয় বারে গন্নুর মার বাড়িতে রামকৃষ্ণের উপস্থিতির কথা বলেছেন। শ্রীম প্রথমবারে লিখেছেন, ব্রাহ্মণীর বাড়িতে রামকৃষ্ণ গেলে ব্রাহ্মণীর ভাবোল্লাস হয়েছিল। আর পরে লিখেছেন —রামকৃষ্ণ গন্নুর মার বাড়িতে ঐক্যতান বাজনা ও ছোকরাদের গান শুনে ছিলেন।

শ্রীম শুধু যে একই দিনের এক এক সময়ের ঘটনা এক এক গ্রন্থে দিয়েছেন, তা নয়, তিনি একই দিনের একই সময়ের ঘটনার কিছুটা এক ভাগে, আবার কিছুটা অন্যভাগে, এমনও করেছেন। যেমন—১৯-১২-৮৩ তারিখে বেলা ৯টার সময়ের রামকৃষ্ণের কথা (কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ ও সমাধি সম্বন্ধে) শ্রীম তাঁর বইয়ের চতুর্থ ভাগে (৭ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ) লিখেছেন, আবার ঐদিন ঐ বেলা ৯টার সময়েরই ঐ একই ব্যক্তির সহিত কথা (জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে) শ্রীম বহু বৎসর পরে প্রকাশিত তাঁর পঞ্চম ভাগে লিখেছেন (১২ শ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)।

শ্রীমর এইরূপ লিখন পদ্ধতি দেখে এইটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি তাঁর বইয়ের বিক্রি দেখে বইয়ের সংখ্যা বাড়াবার জন্যই পরে পরে এক এক দিনের বা এক এক সময়ের ঘটনা ঐ ভাবে চিন্তা করে করে লিখেছেন। এরূপ লেখা যে খুব কষ্টকর তা মোটেই নয়। কেননা, রামকৃষ্ণের কথা বা উপদেশা-বলীর সঙ্গে যিনি কিছুটা পরিচিত তাঁর পক্ষে রামকৃষ্ণের কথা নিয়ে এই ভাবে

ফেনিয়ে লেখা খুব কষ্টসাধ্য নয়। এরূপ ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণের কথা বা উপদেশাবলীর পুনরাবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীমর কথামৃতে তাই-ই হয়েছে। এ সম্বন্ধে শ্রীমর পক্ষ থেকে হয়ত যুক্তি হবে যে, রামকৃষ্ণ একই কথা বা উপদেশ পুনরাবৃত্তি করতেন বলে, তাঁর বইয়েও তাই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু, শ্রীম একই দিনের ঘটনার কিছুটা একভাগে, আবার কিছুটা বহু বৎসর পরে প্রকাশিত অপরভাগে লিখলেন কেন? এতেই তো মনে হতে পারে, পরে তিনি তাঁর গ্রন্থের এই অপর ভাগটি রচনা করবার জন্যই আগের দিনের লেখার জের টেনে বাড়িয়ে এই ভাগ রচনা করেছেন। এবং এরূপ সন্দেহ বা অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক।

যাক, এখন শ্রীমর লেখার বঙ্কিম প্রসঙ্গে আসা যাক্। রাম দত্ত, সারদানন্দ, অক্ষয় সেন এঁরা এঁদের বইয়ে রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গটা যেখানে দু এক কথা বা অল্প কথায় লিখেছেন, সেখানে শ্রীম লিখেছেন তাঁর বইয়ে ২৬ পাতা। শ্রীম তাঁর রামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থের পঞ্চম ভাগে প্রধানতঃ অক্ষয় সেনের লেখা অংশটি নিয়েই (অবশ্য মদের প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে) ফেনিয়ে ফেনিয়ে এতটা লিখেছেন। অমাবস্যায় রামকৃষ্ণের মদের তিলক নেওয়া এসে যেতে পারে বলেই হয়ত, অক্ষয় সেন ঐদিন অমাবস্যা তিথি ছিল লিখলেও, শ্রীম কিন্তু ঐ তিথিটা করেছেন, কৃষ্ণা চতুর্থী।

শ্রীম লিখেছেন—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে অধর সেনের বাড়িতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেদিন সেখানে বহু ব্রাহ্ম, কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় রামকৃষ্ণ মানুষের কর্তব্য কি বঙ্কিমচন্দ্রকে এই প্রশ্ন করলে, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—'আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।'

এই ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র, 'নবজীবন'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ভাষায়—'সাহিত্য-সম্রাটরূপে তখন তিনি কলকাতায় কলুটোলায় অবস্থান করিতেছেন।' আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'এই সময় অক্ষয় সরকার মহাশয় নবজীবন মাসিক পত্র বাহির করিয়াছেন।···বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রচার বাহির হইতেছে।'

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় একরূপ হিন্দুধর্মের প্রচারকের ভূমিকা নিয়েই 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকায় নিয়মিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই ভাষায়—'নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম—যে হিন্দুধর্ম আমি গ্রহণ করি

তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতে ছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম।'

শ্রীম যে ৬ই ডিসেম্বর বা অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাতের কথা বলেছেন, ঠিক ঐ অগ্রহায়ণ মাসেই রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় 'একটি পুরাতন কথা' নামে এক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করে লিখেছিলেন—'আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে, অসংকোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।'

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমদিকে ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, এই প্রবন্ধ পড়ে ঐ অগ্রহায়ণ মাসেরই শেষভাগে প্রকাশিত প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেব প্রবন্ধের উত্তর দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব ঐ প্রতিবাদ প্রবন্ধের নাম 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়।'

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মূল প্রবন্ধে তাঁর নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একজনের সম্বন্ধে বলেছিলেন—'তিনি যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীর কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোক-হিতার্থ মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।'

এই কথাটা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন তুলে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর প্রবন্ধে ঐ 'কৃষ্ণোক্তি' সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

'ঐ কৃষ্ণোক্তির মর্ম পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া কৃষ্ণার্জুন সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন, ভাবিতে ছিলেন, অর্জুন এতক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে। অর্জুন আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ণ বধ হইয়াছে কি না। অর্জুন বলিলেন, না হয় নাই। তখন যুধিষ্ঠির বাগান্ধ হইয়া অর্জুনের অনেক নিন্দা করিলেন, এবং অর্জুনের গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করিলেন। অর্জুনের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল—যে গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক্ষণে 'সত্য' রক্ষার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নহিলে

'সত্য'-চ্যুত হবেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন—মনে করিলেন, তারপর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য লঙ্ঘনই ধর্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।'

যাই হোক, পাঠক-পাঠিকারা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধটি পড়লে দেখবেন, কি ভদ্র ও সংযত ভাষায় এবং আক্রমণকারী রবীন্দ্রনাথের উচ্চ প্রশংসা করেই তিনি তাঁর প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঐ প্রবন্ধেই এক জায়গায় প্রসঙ্গতঃ বলেন—'যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারিবার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ। গড় পড়তায় মাসে একটি। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পরদা পরদা উঠিতেছে।'

এখন আমার কথা হচ্ছে, ব্রাহ্মরা যখন গড়পড়তায় মাসে একটি করে এবং একটু করে পরদা পরদা উঠে বঙ্কিমচন্দ্রকে তীব্রভাবে আক্রমণ করছেন এবং যেদিন বঙ্কিমচন্দ্র সত্য-অসত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আক্রমণাত্মক প্রবন্ধের উত্তর লিখছেন বা লেখা সবে শেষ করেছেন, সেই সময়েই ব্রাহ্মদের সমক্ষেই এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি তো ছিলেনই, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে ঐ উত্তর দিয়েছিলেন, এ অসম্ভব। ঐ উত্তর দিলে উপস্থিত ব্রাহ্মদের মুখ থেকে শুনে লেখক ব্রাহ্মরা আবার বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করতেন।

শ্রীম তাঁর বইয়ের তৃতীয় ভাগেও রামকৃষ্ণের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এমনি আর একটা অসম্ভব কথা বসিয়েছেন। শ্রীম লিখেছেন—

'একজন ভক্ত বলিলেন--শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ চরিত্র লিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।

কাপ্তেন···ঈশ্বর মনুষ্য হয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন, রাধাকৃষ্ণলীলা, তা মানেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—(সহাস্যে) ও সব কথা যে খবরের কাগজে নেই, কেমন করে মানা যায়?

একজন তার বন্ধুকে এসে বললে, ওহে কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন

সময় দেখলাম সে বাড়িটা হুড় মুড় করে পড়ে গেল। বন্ধু বললে, দাঁড়াও হে, একবার খবরের কাগজখানা আনি। এখন বাড়ি হুড়মুড় করে পড়ার কথা কাগজে তো কিছুই নাই।—'ও সব কাজের কথা নয়।' সে লোকটা বললে—আমি যে দেখে এলাম। ও বললে, তা হোক, যে কালে খবরের কাগজে নাই, সে কালে ও কথা বিশ্বাস করলুম না।' ঈশ্বর মনুষ্য হয়ে লীলা করেন, এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করবে? ও কথা যে ওদের ইংরেজি লেখাপড়ার ভিতর নেই। পূর্ণ অবতার বোঝান বড় শক্ত, কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর অনন্ত আসা।' ১৭ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

শ্রীমতী মানা না মানা সে অন্য কথা, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু 'ঈশ্বর মনুষ্য হয়ে লীলা করেন' ইংরাজি বিদ্যার মধ্যে একথা নেই বলেই, বঙ্কিমচন্দ্র একথা বিশ্বাস করতেন না, তা ঠিক নয়। যেমন—

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ মজুমদারকে ১০-১০-৮৫ তারিখে এক চিঠিতে লিখেছিলেন —'কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্য চরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথমেও লিখে গেছেন—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ...আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করি। পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, ইংরাজি বিদ্যালাভ করেই বরং ঈশ্বরের মানুষ হতে পারা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা দৃঢ়ীভূত হয়েছিল।

রাম দত্ত মাত্র একটি কথা—অধর সেনের বাড়িতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা হলে রামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিম (বাঁকা) বলে রহস্য করেছিলেন —এই কথাটিকে নিয়ে সারদানন্দ, মনে ময়লা ওয়লা অক্ষয় সেন, এবং শ্রীম কি ভাবে নিজেদের ইচ্ছামত লিখে লিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে হেয় বা ছোট করেছেন, তা দেখাবার চেষ্টা করলাম। এঁদের সকলেরই বিশেষ করে শ্রীমর কথাগুলিকে নিয়ে ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আবার কল্পনা বিস্তারে সকলকেই ছাড়িয়ে গেছেন। অচিন্ত্যবাবু শ্রীমর বই থেকে রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র

প্রসঙ্গের এক একটা কথা উদ্ধৃত করেছেন. আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিজে কল্পনায় নানা মন্তব্য করেছেন।

অচিন্ত্যবাবু কর্মজীবনে বিচারক ছিলেন। কিন্তু তিনি একজন অতি সাধারণ বিচারকের ন্যায়ও শ্রীম প্রভৃতির লেখার সত্য মিথ্যা যাচাই করেন নি। অধিকন্তু নিজে আবাব ওঁদের কথার উপর নানা মন্তব্য করে বঙ্কিমচন্দ্রকে আরও ছোট করেছেন। অচিন্ত্যবাবুর এই ধরণের লেখাগুলি নিয়ে বেশী আলোচনার প্রয়োজন নেই। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। অচিন্ত্য-বাবু লিখেছেন—

'ঠাকুব—বিশেষ করে তাকালেন আবার বঙ্কিমের দিকে, কোমল স্বরে বললেন, 'আপনি যেন কিছু মনে কোরো না।'

সরল সপ্রতিভের মত বঙ্কিম বললে, 'আজ্ঞে মিষ্টি শুনতে আসি নি।'

কিন্তু বঙ্কিম জানে তার অন্তরের মধ্যে এর চেয়ে আর মিষ্টি নেই। শক্তি-শালী ওষুধের নাম জানি না, খেতে খুব ঝাঁঝালো. কিন্তু মধুরের মত কাজ করে আত্মগুণে,আরোগ্য এনে দেয়। তেমনি অর্থ জানি না মন্ত্রের, উচ্চারণও হয়তো ঠিক হয না, কিন্তু আত্মগুণে কাজ করে, এনে দেয় নৈরুজ্য। তেমনি তির-স্কারের মধ্য দিযেই আসুক সেই নামের পুরস্কার।

ভক্ত ঈশ্বরের কাছে বিষয় চাইলেও ঈশ্বর তাকে তাঁর পাদপল্লবই উপহার দেন।

হে প্রভু তোমাকে ত্যাগ কবে স্বর্গ চাই না। ব্রহ্মলোক চাই না। সার্বভৌম রসাধিপত্যও চাই না। চাই না যোগ সিদ্ধি। চাই না অপুনর্ভব। ক্ষুধার্ত শিশু বা অজাতপক্ষ বিহঙ্গ যেমন তার মা'র জন্যে উৎকণ্ঠিত, বিরহিণী স্ত্রী যেমন প্রবাসগত পতির জন্যে উৎকণ্ঠিত, হে মনোহর অরবিন্দ নেত্র, তোমাকে দেখ-বার জন্যে আমিও তেমনি উৎকণ্ঠিত হয়েছি।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, অচিন্ত্যবাবু রামকৃষ্ণের বেলায় ঠাকুর তাকালেন, বললেন, লিখেছেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বেলায় বঙ্কিম বললে, বঙ্কিম জানে, লিখেছেন। রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে অচিন্ত্যবাবু বরাবর বঙ্কিমচন্দ্রকে (শুধু বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন, অচিন্ত্যবাবু তাঁর বইয়ে বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি সকলকেই) এই ভাবে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তারতম্য করে লিখে গেছেন।

যাই হোক, অচিন্ত্যবাবু যে লিখলেন—বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনেই

বলেছিলেন, হে প্রভু, তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গ, ব্রহ্মলোক, যোগসিদ্ধি প্রভৃতি কিছুই চাই না। তোমাকে দেখবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত।

রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের যদি অতই আগ্রহ এবং তাঁকে ছেড়ে স্বর্গ বা মোক্ষও চান না, তাহলে এরপর বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণের সঙ্গে আর দেখা করলেন না কেন? বঙ্কিমচন্দ্র তো শেষ জীবনে কলকাতাতেই ছিলেন, আর রামকৃষ্ণও তো কলকাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন। সব চেয়ে বড় কথা, বঙ্কিমচন্দ্র যদি রামকৃষ্ণের অত বড় ভক্ত ছিলেন তো তিনি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কখন কোথাও একটি কথাও বললেন না কেন? আসলে বঙ্কিম-চন্দ্রের, তাঁর সমসাময়িক ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনদিন কোন আগ্রহই ছিল না এবং কোনদিন তিনি রামকৃষ্ণকে হয়ত দেখেনও নি।

এই সঙ্গে আর একজনের কথা। 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের লেখক ভবতোষ দত্ত ইনিও কোনরূপ চিন্তা না করেই অচিন্ত্য সেনগুপ্তর মত শ্রীমকে অবলম্বন করে তাঁর বইয়ে লিখেছেন—'মানুষের কর্তব্য কি হওয়া উচিত, এ বিষয়ে পরমহংস দেব বঙ্কিমচন্দ্রের মত জিজ্ঞাসা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে জৈবক্রিয়াগুলিরই উল্লেখ করে ছিলেন বলে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করেন।' ইত্যাদি

অক্ষয় সেন থেকে শুরু হয়ে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত পর্যন্ত এঁরা সকলেই বঙ্কিমের মুখে তিনটি জৈবক্রিয়ার কথাই বসিয়েছেন। ভবতোষবাবু দেখছি, 'জৈব-ক্রিয়াগুলি' বলে সব জৈবক্রিয়াকেই বলিয়েছেন।

এখন কথা হচ্ছে—একজন অতি বড় মূর্খকেও কেউ যদি কখন জিজ্ঞাসা করে, মানুষের কর্তব্য কি হওয়া উচিত? —তাহলে সেই মূর্খও তখন ভাবে, প্রশ্নকর্তা নিশ্চয়ই ঈশ্বর চিন্তা, পরোপকার, জীবে দয়া, গুরুভক্তি বা সৎ জীবন যাপন—এই ধরণেরই কোন কথা জানতে চাইছেন?

মানুষের কর্তব্য কি হওয়া উচিত? এর উত্তরে খাওয়া, ঘুমনো প্রভৃতি জৈবক্রিয়ার কথা সেও কখনই বলে না। কারণ, সেও জানে—এগুলো জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ সবারই অত্যন্ত সহজাত ব্যাপার।

অতএব, মানুষের কর্তব্য কি হওয়া উচিত? এর উত্তরে বঙ্কিমের মত

মানুষ কখনই আহার, নিদ্রা, মৈথুন বলতে পারেন না বা বলেনও নি। আসলে যে অক্ষয় সেনের কথা গম্ভীরানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ, মাধবানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা বিশ্বাস করতেন না, সেই বিকৃতমনা অক্ষয় সেনেরই এটি বানানো কথা বা 'ময়লা' মনের কথা। আর তাঁর মনে যে 'ময়লা' ছিল, সে তো স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেবই বলে গেছেন।

আমি আগে বলেছি—রামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল, এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মুখে শুনে তাঁর পরিচিত কেউই তাঁর বঙ্কিম-স্মৃতি কথায় লেখেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত শ্রীশ মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর ৮ বছর পরে ১৩০৮ সালের মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যা 'সমালোচনী'তে তাঁর 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ —তৃতীয় প্রস্তাব' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত বাবু অধরলাল সেনের গৃহে একদিন বঙ্কিম-বাবুর সাক্ষাৎ ঘটে। পরমহংস কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—শুনিয়াছি আপনার বড় বিদ্যার অভিমান। বঙ্কিমবাবু তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং ধর্মোপদেশ শুনিতে চাহিয়া ছিলেন। তাহাতেও পরমহংস নরম হন নাই। বঙ্কিমবাবু হাসিয়া সকল উড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাদের অতঃপর আর কখন দেখাশুনা হইয়া ছিল কিনা, আমি অবগত নহি।'

এখানে দেখা যাচ্ছে—শ্রীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবশতঃই হয়ত, বঙ্কিমচন্দ্রের বরং বেশ প্রশংসাই করেছেন।

অধর সেনের বাড়িতে পরমহংস রামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল—শ্রীশবাবু লিখলেও, তিনি একথা বলেন নি যে, তিনি ঐ কথা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে শুনেছেন।

শ্রীশবাবু তাঁর 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নিজের কথাবার্তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অপরের কাছে শোনা কথাও লিখেছেন।

সেই হিসাবে রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষাতের কাহিনী রাম দত্ত কি অক্ষয় সেনের বই-পড়া কারও মুখে শুনে, সেই কথাকে নিজের পছন্দ মত করে নিয়ে শ্রীশবাবু লিখে থাকতেও পারেন।

এখন কেউ যদি বলেন, শ্রীশবাবু যখন লিখেছেন—'পরে আর দেখা হয়ে-

ছিল কিনা আমি অবগত নহি'—তখন এ থেকে তো বলা যেতে পারে—রাম- কৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাতের কথাটা তিনি জানতেন।

জানতেন। কিন্তু তাঁর এই জানাটা তো রাম দত্ত কি অক্ষয় সেনের বই পড়া কোন ব্যক্তির কাছে শুনেও হতে পারে! তিনি নিজে ঐ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেন নি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে শুনেও সে কথা লেখেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে শুনে থাকলে, তিনি তাঁর প্রবন্ধের অপর ঘটনাগুলির ন্যায় এটার সম্পর্কেও নিশ্চয় লিখতেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে ঐ কথা বলেছিলেন।

তাছাড়া শ্রীশবাবুর প্রবন্ধে তাঁর জানা বলে বর্ণিত অনেক কথা আছে, যা ঠিক নয়। যেমন, দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) শ্রীশবাবু লিখেছেন—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এলবার্ট কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বক্তৃতা শোনা' কালে একজন 'দেশ বিশ্রুত' ব্যক্তি হেসে হেসে এবং মাথা নেড়ে নেড়ে বক্তার প্রতিটি কথা অনুমোদন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন সভামঞ্চেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি সভার ঐ 'দেশ বিশ্রুত' ব্যক্তিকে দেখেই সম্ভবতঃ পরে তাঁর মুচিরাম গুড়ের জীবনী লিখেছিলেন।

শ্রীশবাবুর একথা আদৌ ঠিক নয়। কারণ, ১৮৮৫র অনেক আগেই মুচি- রাম লেখা হয়েছিল।

(২) শ্রীশবাবু লিখেছেন—সত্য সত্যই বঙ্কিমবাবু কয় বৎসর দুই বার করিয়া প্রমোশন পাইয়া ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত প্রতিভাধর ছাত্র ছিলেন সত্য। তবুও তাঁর ছাত্রজীবন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, শ্রীশবাবুর ঐ কয় বৎসর দুবার করে প্রমো- শনের কথা সত্য নয়।

(৩) শ্রীশবাবু লিখেছেন—নবজীবন বেরোবার দু মাস মধ্যে প্রচারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

শ্রীশবাবুর একথাও ঠিক নয়। কারণ, নবজীবন বেরোবার ঠিক ১৫ দিন পরে প্রচার প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীশবাবুর জানা বলে বর্ণিত এইরূপ অসত্য কাহিনী তাঁর প্রবন্ধে আরও আছে। অতএব শ্রীশবাবুর জানা কথার উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া চলে না।

এবার আমার শেষ কথা—

আমি আমার এই প্রবন্ধে আমার বক্তব্যের সমর্থনে যে সব যুক্তি দেখিয়েছি, সে সব সত্ত্বেও কেউ যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারই করেন যে, অধর সেনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল এবং অধর সেনের বাড়িতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেখাও হয়েছিল ; তাহলেও বলবো—মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত—আহার, নিদ্রা, মৈথুন—বঙ্কিমচন্দ্র একথা বলতেই পারেন না।

এ সম্পর্কে আমার আগের সমস্ত যুক্তির সঙ্গে আবার ক'টা কথা বলছি—

(১) বঙ্কিমচন্দ্র এত অবিবেচক ছিলেন না যে, কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক মিথ্যাও কখন কখন সত্য হয় লিখে যখন ফ্যাসাদে পড়েছিলেন, তাঁর সেই ফ্যাসাদের দিনেই বহু ব্রাহ্ম ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সামনে ঐ কথা বলে আবার নতুন ফ্যাসাদ ডেকে আনবেন।

(২) আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহ কিছুটা অশ্রদ্ধেয় ভাষায় 'নব্য ভারতে' বঙ্কিমচন্দ্রের একটা প্রবন্ধের সমালোচনা করলে বঙ্কিমচন্দ্র কৈলাসচন্দ্রের ভাষাকে 'মেছোহাটার গালি' বলেছিলেন। এই কথা ঐ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়' প্রবন্ধে লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে অপরের ভাষাকে 'মেছোহাটার গালি' বলছেন, ঠিক সেই সময়েই নিজে বহু সুধীজন সমক্ষে ঐ কথা বলবেন, এ সম্ভব নয়।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার সম্বন্ধে লিখেছেন—'ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।'

সভ্য সমাজে অহেতুক 'মৈথুন' শব্দটা উচ্চারণ করা যে 'অশ্লীল' তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কথা বলতে পারেন না।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্র যে কিরূপ নীতিবাগীশ ও আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন, তার বিশেষ পরিচয় পাই তাঁর লেখা 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধ থেকেও। এই প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন বিদ্যাসাগর মশায়ের রচিত 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার—দ্বিতীয় পুস্তক' এর সমালোচনা প্রসঙ্গে। তাঁর সেই প্রবন্ধ থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

'বিদ্যাসাগর মহাশয় উদাহরণ স্বরূপ প্রবোধচন্দ্রিকা নামক অশ্লীলতার ভাণ্ডার হইতে একটি অশ্লীল উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় গ্রন্থকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। সে উপাখ্যানটি এরূপ অশ্লীল যে, বোধ হয় সামান্য ইতর

লেখকও তাহা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিতেন না।...বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহার একটি শব্দ পরিবর্তিত করিয়া লজ্জানুরোধের প্রমাণ দিয়াছেন—আর একটি শব্দ মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের লজ্জাহীনা লেখনী হইতে যেমন বাহির হইয়াছিল, বোধ হয় তেমনই আছে।' —বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮০

যে-বঙ্কিম বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও একথা লিখতে পারেন, সেই-বঙ্কিম নিজে বহু সম্ভ্রান্ত ও গুণীজন সমক্ষে অম্লান বদনে ঐ কথা বলেছিলেন, এ একেবারেই অবিশ্বাস্য।

(৫) আরও একটা কথা—বঙ্কিমচন্দ্রকে উচ্চশিক্ষিত ভেবে সহজ সরল সাধক রামকৃষ্ণ দেব যদি জিজ্ঞাসাই করে থাকেন—মানুষের কর্তব্য কি বা কি হওয়া উচিত? —তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কথা বললে বুঝতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র সর্বজন সমক্ষে একদিকে নিজেকে যেমন অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন, অপর দিকে তেমনি সকলের সামনেই সবার শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ দেবের প্রতি রীতিমত অবজ্ঞাও প্রকাশ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কোন মতেই নিজেকে কোথাও হেয় প্রতিপন্ন করার মানুষ ছিলেন না।

তাঁর নিজের দিক থেকে সাধুসন্তদের প্রতি আকর্ষণ না থাকলেও তাঁদের প্রতি তাঁর বরাবরই শ্রদ্ধার ভাব ছিল। কারণ—তাঁদের গৃহ-দেবতা, যাঁর প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি ছিল, সেই রাধাবল্লভ এক সাধুর দান। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র প্রথম যৌবনে এক সাধুর কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করেছিলেন। যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর আগেও এক সাধু তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। এসে তিনি যে সব ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ সমস্তই জানতেন। তিনি নিজেও বহু সাধুসন্ত, এমন কি হঠযোগী সাধুও দেখেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করেন নি। তাঁর রচনার মধ্যেও সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ভাবই দেখা যায়।

দানশীলা ও ধর্মপরায়ণা রাণী রাসমণির বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন এবং সেই মন্দিরের পুরোহিত বা সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই ভালই জানতেন। কারণ, ১৮৮৪র ডিসেম্বর (যে সময়টাকে শ্রীম রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমের সাক্ষাতের সময় বলেছেন), তার আগেই কোন কোন কাগজে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন পদ্ধতি ও তাঁর সহজ সরল উপদেশাবলী প্রকাশিত

হয়েছিল এবং লোকমুখেও প্রচারিত হয়েছিল। তাছাড়া, রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু কেশব সেনের যে রীতিমত যোগাযোগ ছিল, এ কথাও বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন। তাই রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র সেই শ্রদ্ধেয় সাধুকে অতি অবজ্ঞা ভরে ঐ উত্তর দেবেন, এ একেবারেই অসম্ভব।

অতএব রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা হয়েছিল, একথা যদি কেউ একান্তই মানতে চান, তাহলে এ প্রসঙ্গের প্রথম লেখক রাম দত্তর লেখাটাই বরং তাঁর স্বীকার করা ভাল। কারণ, যে ঘটনা কারও প্রত্যক্ষ করা নয় বা নির্ভর যোগ্য সূত্রেও পাওয়া নয়, তখন কেবল অক্ষয় সেনের মত মানুষের রুচি মাফিক ঐ লেখা এবং তার উপর আবার অপরের কল্পনার জাল বোনা কথা, মেনে নেওয়া মোটেই যুক্তি সঙ্গত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী নিগমানন্দ

স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীর 'জ্ঞানী গুরু' নামে একটা বই আছে। এই বইয়ে 'ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিব অভিমত' নামক একটি চোট্ট প্রবন্ধে নিগমানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রেব ধর্মমত নিয়ে আলোচনা কবেছেন। নিগমানন্দ তাঁর ঐ প্রবন্ধের একরূপ ভূমিকা হিসাবেই প্রবন্ধেব পাদটীকায় লিখেছেন—

'লেখক বর্তমান প্রবন্ধ লিখিয়া অন্তরে একটু অশান্তি ভোগ করিতে ছিলেন। সেইজন্য যেদিন প্রবন্ধটি ছাপা আরম্ভ হয়, সেই দিন (১৩১৪ সালের ১৯শে চৈত্র বুধবার রাত্রি দেড ঘটিকার সময়) যোগনিদ্রা (Hypnosis) সাহায্যে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'আত্মা' আনয়ন করিয়া ছিলেন। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত যে কথাবার্তা হয়, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

প্রঃ আপনি কেমন আছেন ?

উঃ সুখে আছি। পৌরাণিক ভাষায় স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছি।

প্রঃ আপনার আর জন্ম হইবে কি ?

উঃ ভোগান্তে জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

প্রঃ আপনার লিখিত 'ধর্মতত্ত্ব' বইখানা পড়িয়া আপনার নিজের ধর্মজ্ঞান ঠিক করিতে পারি কি ?

উঃ না—না। আমি ধর্মোপদেষ্টা গুরু বা ধর্মপ্রচারক নহি। সুতরাং কোন ধর্মমত প্রচারও আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল এক শ্রেণীর লোকেব হিন্দুধর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। শিক্ষিত ব্যক্তির প্রকৃতি পর্যালোচনায় আমার প্রতীতি হয় যে, ইহাদের মনের মধ্যে ধর্মব্যাখ্যা করিতে না পাবিলে কেহই হিন্দুধর্মে আকৃষ্ট হইবে না। ধর্মকে তাহাদের মুখরোচক করিতে গিয়াই আমাকে শ্লোকের অঙ্গ কর্তন, কুসংস্কাব খণ্ডন বা স্থল বিশেষে শাস্ত্রভাগকে অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে।

প্রঃ আমি আপনার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি। এক্ষণে প্রতিবাদ প্রবন্ধটি ছাপা বন্ধ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি।

উঃ প্রতিবাদ প্রবন্ধটি প্রচারিত হইলে সমাজের উপকার হইবে।

আমার ভ্রম কেহ সমাজকে জানায় না বলিয়া আমি অশান্তি ভোগ করিতেছি। আজি তোমার দ্বারা সে অশান্তি দূর হইল। নিশ্চিন্ত মনে যথাস্থানে গমন করিলাম।'

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র তারিখে। যোগনিদ্রার সাহায্যে ১৪ বৎসর পূর্বে-মৃত বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মাকে আনা সম্ভব হয়েছিল কিনা এবং সেই আত্মার সঙ্গে সামনা সামনি কথাবার্তাও হয়েছিল কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয়ে বা তর্কাতর্কিতে যেতে চাই না। আর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সবল যুক্তি সহ কৃষ্ণচরিত্র এবং ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করলেও সকলেই যে তা মেনে নেবেন তাও বলছি না। এখন আমার শুধু আলোচ্য—'প্রচার' পত্রিকায় এবং গীতার ব্যাখ্যা গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি বলে নিগমানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে যে আক্রমণ করেছেন, সেই সম্বন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি বলে নিগমানন্দ কি বলেছেন, আগে তাই দেখা যাক্। নিগমানন্দ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন—

'...তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) আত্মমত প্রচারার্থ অনেক স্থলে শ্লোকের পাঠান্তর সংযোজন করিয়া শাস্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। আবার অনেক স্থলে শাস্ত্রভাগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যথা—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। গীতা ৪।৮

এই শ্লোক বাক্যটির অঙ্গ কর্তন করিয়া 'ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়' এই স্থলে 'ধর্ম-সংরক্ষণার্থায়' বসাইয়া দিয়াছেন। আবার প্রচারে লিখিয়াছেন—'সংস্কৃত অনভিজ্ঞেরাই ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়' এই পাঠ ব্যবহার করেন।' বড়ই হাস্যজনক কথা।'

একথা সত্য যে 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র 'ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব?' এ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ধর্ম-সংরক্ষণার্থায় লিখেছেন। তবে 'ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়' হবে, না 'ধর্ম-সংরক্ষণার্থায়' হবে তা নিয়ে কোন কথা বলেননি। তাঁর যা প্রতিপাদ্য বিষয় ঈশ্বর মানুষরূপে অবতীর্ণ হতে পারেন কিনা, সেই নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি সমূহকে খতম করবার চেষ্টা করেছেন।

নিগমানন্দ লিখেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারে লিখেছিলেন, সংস্কৃত

অনভিজ্ঞরাই 'ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়' লিখে থাকেন। প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও একথা আদৌ বলেন নি। নিগমানন্দ অযথা এই কথা বলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর দোষারোপ করেছেন।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়' না লিখে কেন 'ধর্ম-সংরক্ষণার্থায়' লিখলেন? এটা কি তাঁর লিপি বিভ্রাট? এ০যে লিপি বিভ্রাট নয়, তা জোর করেই বলা যেতে পারে। কেন না, বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্লোকটি ১২৯১ সালের ভাদ্র সংখ্যা নবজীবনে 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে একবার এবং ১২৯১ সালের কার্তিক সংখ্যা প্রচারে 'ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব' নামক প্রবন্ধে আর একবার উদ্ধৃত করেছেন। এবং দুবারই তিনি 'ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় না লিখে ধর্ম-সংরক্ষণার্থায়' লিখেছেন। আর শুধু তাই নয়, ঐ দুটি প্রবন্ধই আবার যখন তিনি যথাক্রমে তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করলেন, তখনও 'ধর্ম-সংরক্ষণার্থায়'ই লিখলেন। লিপি বিভ্রাট একবার হতে পারে, এই ভাবে বার বার কখনই হতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাহলে কি গীতার কোন সংস্করণে 'ধর্ম-সংরক্ষণার্থায়' দেখে, তা থেকেই ঐরূপ উদ্ধৃত করেছিলেন? গীতায় যদিও বহু পদের পাঠান্তর রয়েছে, কিন্তু 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়'এর জায়গায় যে 'ধর্ম-সংরক্ষণার্থায়' পাঠ হবে, এরূপ উল্লেখ করতে গীতার কোন টীকাকার বা ভাষ্যকারকে দেখি নি। তবে ১২৯২ সালের কার্তিক সংখ্যা প্রচারে দেখছি, প্রচারের আর একজন ধর্ম-বিষয়ক পণ্ডিত লেখক কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ব্রহ্ম ও ঈশ্বর' নামক প্রবন্ধে এক জায়গায় গীতার এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনিও ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় না লিখে ধর্ম-সংরক্ষণার্থায় লিখেছেন। কিন্তু কৃষ্ণধনবাবু যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে পড়ে ঐরূপ লেখেন নি বা প্রচারের মালিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র (বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও নামে প্রচারের সম্পাদক ছিলেন আসলে বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন প্রচারের সর্বময় কর্তা) কৃষ্ণধনবাবুর লেখা নিজের ইচ্ছামত সংশোধন করে ছাপেন নি, তাই বা কে বলতে পারে! তাহলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজের ইচ্ছাতেই 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' না লিখে 'ধর্মসংরক্ষণার্থায়' লিখে ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি স্বেচ্ছায়ই লিখে থাকেন, তাহলে প্রশ্ন ওঠে কি কারণে এবং কোন্ যুক্তির বলে তিনি এরূপ পরিবর্তন করতে সাহস করেছিলেন? বঙ্কিম-

চন্দ্র এ সম্বন্ধে নিজে যদিও কিছু লিখে যান নি, তবে তাঁর পক্ষের যুক্তি হিসাবে এইরূপ অনুমান করা যেতে পারে—

(১) শ্রীভগবান যখন বলছেন যে, ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হলে আমি আবির্ভূত হই, তখন দেখা যাচ্ছে, ধর্ম আছে তবে গ্লানি যুক্ত। ধর্ম একেবারে নেই এরূপ কথা বলছেন না। তাহলেই ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হন, নূতন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য নয়, যে ধর্ম আছে তাকেই গ্লানিমুক্ত করে সংরক্ষণের জন্যই।

শ্রীভগবান আরও বলছেন, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য বা রক্ষার জন্য আমি আবির্ভূত হই। এখানেও দেখা যাচ্ছে, সাধুরা যখন আছেন, তখন নিশ্চয়ই ধর্মও আছে। তাহলেই ভগবান ধর্ম সংস্থাপনের জন্য নয়, ধর্মের বিঘ্নকারী দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে এবং সাধুদের রক্ষা করে যে ধর্ম আছে তাকেই সংরক্ষণের জন্য আবির্ভূত হন।

(২) বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, গীতার বহু পদের পাঠান্তর আছে।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র এ কথাও জানতেন যে, শঙ্করাচার্যের গীতাভাষ্যই গীতার উপর চরম বা শেষ ভাষ্য নয়। গীতার বিভিন্ন ভাষ্যকার ও টীকাকার নিজ নিজ মত অনুযায়ী গীতার ব্যাখ্যা করে গেছেন।

(৪) গীতার মধ্যে যা কিছু আছে, সে সবই যে ভগবদুক্তি বঙ্কিমচন্দ্র একথা মানতেন না। কৃষ্ণকথিত ধর্ম পরে অন্য কর্তৃক সংকলিত হয়েছে এবং মূল গীতা সংকলনের সময় সংকলন কর্তা নিজেরও কিছু কিছু শ্লোক চালিয়ে দিয়ে থাকতে পারেন, এ বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্র করতেন। এ কথার সমর্থনে তিনি গীতার অন্যতম বিখ্যাত টীকাকার শ্রীধর স্বামীর বচন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন—'শ্রীধর স্বামীর ন্যায় টীকাকারও সংকলনকর্তা সম্বন্ধে 'প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ' ইহা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে 'কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ।' শ্রীধর স্বামীর সংস্কৃত বচন দুটির অর্থ হচ্ছে—প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণ মুখ হইতে নিঃসৃত শ্লোকগুলিকেই লিখেছেন। কোন কোন শ্লোক অর্থ সঙ্গতি বা ভাব সামঞ্জস্যের জন্য নিজেও রচনা করেছেন।

(৫) পরবর্তীকালেও যে গীতার মধ্যে অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, এরূপ বিশ্বাসও বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল।

এখানে যেসব কথা আলোচনা করলাম, এই সব তাঁর জানা ছিল এবং বিশ্বাস ছিল বলেই হয়ত তিনি ধর্মসংরক্ষণার্থায় লিখতে সাহস করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারে গীতার যে টীকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন, তাতে মাত্র গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর আর কোথাও প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকের পর্যন্ত টীকা পাণ্ডুলিপি অবস্থায় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারে প্রকাশিত এবং পাণ্ডুলিপি অবস্থায় প্রাপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের গীতার টীকার সঙ্গে গীতার অবশিষ্টাংশ মূল সংস্কৃত এবং কালী-প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ দিয়ে সম্পূর্ণ গীতা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। দিব্যেন্দুবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের গীতার পাণ্ডুলিপিখানি যদি যথাযথ ছেপে থাকেন, (ছেপেছেন বলেই বিশ্বাস,) তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আলোচ্য শ্লোকটিতে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ধর্মসংরক্ষণার্থায় না লিখে ধর্মসংস্থাপনার্থায় লিখে গেছেন। কৃষ্ণচরিত্র এবং ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত হবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসেও এই শ্লোকটি ধর্মসংস্থাপনার্থায় দিয়েই উদ্ধৃত করেছেন। তাহলে এখন স্থির হল যে, বঙ্কিমচন্দ্র একবার ধর্ম-সংরক্ষণার্থায় লিখে থাকলেও আবার 'ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়'ও লিখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা গীতার আলোচনা দিব্যেন্দুবাবু যদি যথাযথ ছেপে থাকেন, তাহলে বলা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র শেষে ধর্মসংস্থাপনার্থায় পাঠ মেনে নিয়ে ছিলেন ; না হলে বলতে হয়, তিনি উভয় পাঠই স্বীকার করতেন।

নিজের মত পরিবর্তন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন—'মত পরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার মত পরি-বর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।...মত পরিবর্তন বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল।'

বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে যে ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধান, ভাবনা, অধ্যয়ন, অধ্যবসায় এবং মনীষার পরিচয় দিয়েছেন, তা অসাধারণ। দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃষ্ণচরিত্র রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে তো প্রত্নতাত্ত্বিকই বলেছেন। তিনি লিখেছেন—'প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অবদান—কৃষ্ণচরিত্র। 'কৃষ্ণচরিত্র' একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব।'

প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে, আজ যেটাকে তাঁরা গবেষণা করে ঠিক বলে স্থির করলেন, কাল হয়ত আরও গবে-ষণার ফলে সেটা ঠিক নয় বলে, প্রমাণিত হ'ল। এরূপ ভুল হওয়া তাঁদের পক্ষে

খুবই স্বাভাবিক। প্রত্নতাত্ত্বিক বা গবেষকদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কোন সাধারণ লোকেও যদি একবার একটা বিষয়ে ভুল বুঝে থাকেন এবং পরে যদি নিজেই তা সংশোধন করে নেন. তাহলে তাঁর ভুল সংশোধনের পরেও সংশোধনের কথা গোপন করে বা এড়িয়ে গিয়ে, তাঁর সেই এক সময়ের ভুল বোঝাকেই শুধু নিয়ে গালাগালি দেওয়া বা আক্রমণ করা ঠিক নয় বলেই মনে করি।

নিগমানন্দ এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাই করেছেন। অথচ নিগমানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে যে হিসাবে আক্রমণ করেছেন, ঠিক সেই হিসাবে তাঁকেও আক্রমণ করা যায়। নিগমানন্দ নিজেই এক সময় বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যা ভাল বলে (যদিও একথা তিনি এখানে বলেন নি), এখন আবার সুর বদলে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন। অবশ্য নিগমানন্দ যখন বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের সমর্থন করেন, তখন তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। কিন্তু তাহলে কি হয়, নিগমানন্দের তো 'আশৈশব দৈবঘটনা দিব্যদর্শন একপ্রকার দৈনন্দিন ঘটনা' ছিল। আর তাঁর জীবনীতেও দেখছি, তিনি তো সেই বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র কিছু বললে বলতেন—'না তা হতে পারে না, আপনি ভুল বুঝছেন, ওটা এরূপ হবে।' এবং বঙ্কিমচন্দ্রও নাকি তাঁর কথা শুনতেন। যাই হোক্, নিগমানন্দের ঐ জীবনীতেই (যার পাণ্ডুলিপি নিগমানন্দ নিজে দেখে সংশোধন করে দিয়েছিলেন) লেখা আছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র নিগমানন্দের এক সময় খুব ভাল লেগেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় 'ধর্মসংরক্ষণার্থায়' লিখেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি তা সংশোধন করে নিয়েছিলেন অথবা দু রকম পাঠই ব্যবহার করতেন। তবুও নিগমানন্দ সেকথা আদৌ উল্লেখ না করে, একটা কথা নিয়েই শুধু তাঁকে আক্রমণ করেছেন। অথচ নিগমানন্দ নিজের বেলায়, একসময় কৃষ্ণচরিত্র ভাল বলে, এখন কিন্তু সেকথা না বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করেছেন।

নিগমানন্দ লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গীতার মধ্যে উইলসন সাহেবকে ঠাট্টা করে লিখেছেন, উইলসন সাহেব মনে করেন তিনি শঙ্করাচার্য (যাঁর চারি বেদ কণ্ঠস্থ) অপেক্ষাও ভাল সংস্কৃত জানেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরের বেলায় এরূপ লিখলেও নিজের বেলায় কিন্তু এ কথা স্মরণ করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র গীতার যে অনুবাদ করেছেন, তা আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

পড়ে দেখলাম। কিন্তু কোন উইলসন সাহেবকে তিনি ঠাট্টা করে কিছু যে বলেছেন, এমন কথা কোথাও খুঁজে পেলাম না। তবে একটা জায়গায় দেখলাম, এক সাহেবের কথা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র শঙ্করাচার্যের উল্লেখ করেছেন, এবং সেইখানেই শঙ্করাচার্যের যে চারি বেদ কণ্ঠস্থ সে কথাও বলেছেন। কিন্তু সে সাহেবের নাম উইলসন নয় ডেবিস্, আর বিষয়টাও অন্যরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে ডেবিসকে ধরলেও বরং শঙ্করাচার্যের কৃত ব্যাখ্যাই যে ঠিক নয়, তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই—গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৯ম, ১০ম, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ রয়েছে। ১১শ ও ১৬শ শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ না থাকলেও এই শ্লোক দুটিও পূর্বোক্ত ঐ শ্লোকগুলির সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। শঙ্করাচার্য ম শ্লোকের 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ করেছেন ঈশ্বর, আর পরের শ্লোক-গুলির 'যজ্ঞ' শব্দ সাধারণ যজ্ঞ অর্থেই লিখেছেন। এ সম্বন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'এক শ্লোকে এক অর্থে একটি শব্দ কোন অর্থ বিশেষে ব্যবহৃত করিয়া, তাহার পরছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এজন্য অনেক আধুনিক পণ্ডিত নবম শ্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ স্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে sacrifice লিখিয়াছেন। তাহার পর দশম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—'Probably the sacrifices spoken of in that passage (নবম শ্লোকে) must be taken to be the same as those refarred to in this passage'. ডেবিস সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের ভাষ্য দেখিয়াও গ্রাহ্য করেন নাই, নোটে এহরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এদিকে কামধুকের স্থানে Kamduk লিখিয়া বসিয়াছেন। একবার নহে বার বার।…

এতক্ষণ ভগবান সকাম কর্মের নিন্দা ও নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা করিতে ছিলেন। কিন্তু যজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভগবান সকাম কর্ম করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান শঙ্করাচার্য বেদ হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর্বেদ তাঁহার কণ্ঠস্থ।'

কামধুক শব্দের অর্থ হচ্ছে, যিনি কামনা বা ইচ্ছাপূরণ করেন। সাহেব তাঁর জিহ্বার উচ্চারণ অনুযায়ী ইংরাজি অক্ষরে কামধুক লিখতে গিয়ে বানান ভুল করেছেন।

এখানে ডেবিস সাহেবের Kamduk লেখার কথা এবং শঙ্করাচার্যের চার

বেদ কণ্ঠস্থ, এই লেখা আছে দেখেই নিগমানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের উইলসন সাহেবকে ঠাট্টা করার গল্পটি রচনা করেছেন বলেই মনে হয়!

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গীতার টীকায় এই শ্লোকগুলির যজ্ঞ শব্দের অর্থ নিয়ে সকল দিক থেকেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। ১০ম হইতে ১৬শ পর্যন্ত শ্লোকগুলি যে এখনকার দৃষ্টিতে অবৈজ্ঞানিক বঙ্কিমচন্দ্র তাও দেখিয়েছেন এবং এই শ্লোকগুলি যে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে একথাও তিনি বলেছেন।

পরে তিনি শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে লিখেছেন—

'শঙ্করাচার্যের ন্যায় পণ্ডিত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাঁহার পাদুকা বহন করিবার যোগ্য। তবে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আদ্যন্ত সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে বাধ্য। কাজেই এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে বা জোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তিনি মুখেও আনিতে পারেন না। পক্ষান্তরে যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন তাহা হইলে বৈদিক-ক্রিয়া কলাপের অর্থাৎ সকাম কর্মের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাতে অর্থ-বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, এ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকামকর্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কাম কর্ম অনুজ্ঞাত করিয়া আসিতেছেন। এইজন্য এখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা বলিয়াও পরবর্তী কয়টি শ্লোকের কোন উপায় হয় নাই। সে সকলে যজ্ঞার্থ কাম্য কর্মই বুঝাইতে হইয়াছে।'

যাই হোক, শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কথা হচ্ছে, নিগমানন্দ যে উইলসন সাহেবকে বঙ্কিমচন্দ্রের ঠাট্টা করবার কথা লিখেছেন, তা তিনি পেলেন কোথায়? না পড়েই কি একথা লিখলেন?

নিগমানন্দ লিখেছেন—বঙ্কিম হিন্দু-শাস্ত্রে বর্ণিত অনেক কাহিনীকে গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত বা উপন্যাস বলেছেন।

গীতার কোন কোন শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র কেন বলেছেন, তা আগের আলোচনায় আমরা দেখলাম। তিনি হিন্দু শাস্ত্রের কোন কোন কাহিনীকে যে উপন্যাস বলেছেন, এবার তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কৃষ্ণের বহু বিবাহের কথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

'কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট নরক বধে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়া

নরককে বধ করিলেন। নরকের ষোল হাজার কন্যা ছিল, তাহাদের সকলকে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিলেন। নরকমাতা পৃথিবী নরকাপহৃত অদিতি-কুণ্ডল লইয়া আসিয়া কৃষ্ণকে উপহার দিলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, কৃষ্ণ যখন বরাহ অবতার হইয়া ছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধার জন্য বরাহের যে স্পর্শ, সেই স্পর্শে পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া নরককে প্রসব করিয়া ছিলেন।

সমস্তই অতি প্রকৃত এবং সমস্তই অতি মিথ্যা। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেন নাই, প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই বেদে আছে। কৃষ্ণের সময়ে নরক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজা ছিলেন না— ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন হস্তে নিহত হন। ফলতঃ ইন্দ্রের দ্বারকাগমন, পৃথিবীব গর্ভাধান এবং একজনের ষোড়শ সহস্র কন্যা ইত্যাদি সকলই অতিপ্রকৃত উপন্যাস মাত্র। কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী থাকাও এই উপন্যাসের অংশমাত্র এবং মিথ্যা গল্প…বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে আছে ··কৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত এক স্ত্রী।…গল্পটা কত বড় আষাঢ়ে আর একরকম করিয়া বুঝাই। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ঐ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জন্মে। বিষ্ণুপুরাণেই কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ একশত পঁচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র ও প্রতিদিন ৪টি পুত্র জন্মিত।'

অতএব দেখা গেল—

(১) বঙ্কিমচন্দ্র গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত বা উপন্যাস বলেছেন, (২) সংস্কৃত অনভিজ্ঞরাই 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' লিখে থাকেন, (৩) উইলসন সাহেবকে ঠাট্টা করে লিখেছেন, বলে নিগমানন্দ অহেতুক বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন।

এখন উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে কারও মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাকে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁকে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে। তা না করে শুধু শুধু আক্রমণ করা বা গালি দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। নিগমানন্দ তাঁর প্রবন্ধে তাই করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রক্ষিপ্ত এবং উপন্যাস বলার জন্য নিগমানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁর পক্ষ থেকে কোন যুক্তি দেখান নি। আর শুধু তাই নয়,

বঙ্কিমচন্দ্র যে কথা বলেন নি, সে কথা বলেছেন বলে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন। তাই নিগমানন্দের প্রবন্ধটিকে আদৌ সমালোচনা বলা যায় না। এটি বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধু গালি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই রচিত, একটি যুক্তি-হীন ও অসত্য দোষ-দুষ্ট রচনা মাত্র।

নিগমানন্দের এইরূপ লেখা দেখে এখন সহজেই বলা যেতে পারে, নিগমানন্দ কর্তৃক ১৪ বছর আগে মৃত বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মাকে আনা এবং সেই আত্মার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন রীতিমতই সন্দেহজনক। উইলসন সাহেবের কাহিনীর ন্যায় এ কাহিনীটিও হয়ত অসত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ভুল কথা

২৬-৪-৮০ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'সাগর ও সম্রাট' নামে অর্থাৎ বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঠিক ঐ সময় আমি আমার 'রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী' বইটির শেষাংশ ছাপা ও বইটির প্রকাশ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় 'সাগর ও সম্রাট' প্রবন্ধটি পড়তে পারি নি। আর এও ভেবেছিলাম, নতুন কথা কি আর আছে! অতএব থাক।

এর মাস খানেক পরে ৩১-৫-৮০ তারিখের 'দেশে' দেখলাম, অমিত্রবাবুর 'সাগর ও সম্রাট' প্রবন্ধের প্রতিবাদে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। পরে দেখেছি, অমিত্রবাবু ঐ প্রতিবাদ পত্রের কোন উত্তর দেন নি বা দিতে পারেন নি। তখনও আমি অমিত্রবাবুর মূল প্রবন্ধটি পড়ি নি।

এরপর ১৪ ৬-৮০ তারিখের 'দেশে' অমিত্রবাবুর লেখাকে 'সুলিখিত ও তথ্যসমৃদ্ধ' বলে সমর্থন করে সন্তোষকুমার অধিকারী একটি চিঠি প্রকাশ করেন। এতে তিনি ৩১-৫-৮০ তারিখে 'দেশে' প্রকাশিত প্রতিবাদ পত্রের কোন কথা বলেন নি। এটি তাঁর একটি পৃথক চিঠি। এই চিঠিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি গুরুতর নতুন কথা লিখে বসেন। তিনি লেখেন—বি. এ. পরীক্ষায় 'বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাঁকে গ্রেস মার্ক দিয়ে পাস করানো হয়। আর বাংলা ভাষার পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর।

যিনি পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা এবং সাহিত্য জগতের কর্ণধার, তিনি তাঁর এই প্রথম লাঞ্ছনার কথা কোন দিনই ভুলতে পারেন নি। তাই··· বিদ্যাসাগরের অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভাকে খর্ব করার জন্য···সারা জীবন ধরে চেষ্টা করে গেছেন।'

সন্তোষবাবুর চিঠির এই কথার প্রতিবাদে 'দেশে' একটা চিঠি লিখবো স্থির করেছিলাম। কিন্তু সন্তোষবাবুর চিঠির শেষে 'দেশে'র কর্তৃপক্ষ লিখে দেন—'এ সম্পর্কে আর কোনো চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

অতএব আর চিঠি লেখা গেল না। নিরুপায় হয়ে তখন কেবল ভাবলাম—লক্ষাধিক প্রচারিত 'দেশ' পত্রিকার মারফৎ তাহলে কি দেশবাসী, বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলায় ফেল করেছিলেন, এই অসত্য কথাটা চিরকালের জন্যই জেনে থাকবে ?

'দেশে' সন্তোষবাবুর চিঠি পড়ে এবার অমিত্রবাবুর 'সাগর ও সম্রাট' কিরূপ 'তথ্যসমৃদ্ধ ও সুলিখিত' পড়বার ইচ্ছা হ'ল। দেখলাম, ইনিও লিখেছেন—'আমার ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র জীবনব্যাপী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে গিয়েছিলেন।' এছাড়া অমিত্রবাবু আরও অনেক কথা লিখেছেন, যা 'দেশে'র ৩১-৫-৭০ তারিখের চিঠিতে প্রতিবাদ না হলেও বিশেষ প্রতিবাদ যোগ্য। যেমন,—এখানে দু একটার উল্লেখ করছি—

অমিত্রবাবু লিখেছেন—'সুদূর ইংলণ্ডে জন স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু ঘটলে বঙ্কিম চোখের জল ফেলে বঙ্গদর্শনে দীর্ঘ শোক প্রস্তাব রচনা করেন···কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে বঙ্কিম কোন প্রবন্ধ বা শোক প্রস্তাব রচনার তাগিদ অনুভব করেন নি।'

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য—

জন স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু সম্পর্কে বঙ্কিমের ঐ রচনা চোখের জল ফেলে দীর্ঘ শোক প্রস্তাব মোটেই নয়। বঙ্কিম কি লিখেছিলেন, তার সারাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি—

মিলের মৃত্যু হয়েছে। আমরা তাঁকে কখন চোখে দেখিনি। তবু মনে হচ্ছে, যেন আমাদের কোন পরম আত্মীয়ের সঙ্গে চির বিচ্ছেদ হ'ল।

এই মহোদয় আপনি বুদ্ধি বলে প্রায় সমস্ত মানব জাতিকে ঋণী করেছেন এবং যাবজ্জীবন এই ঋণ দানে নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁর লেখা ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্র ও অর্থব্যবহার শাস্ত্র তাঁর প্রধান কীর্তি।

বিদ্যানুশীলন বিষয়ে তিনি যে পথ প্রদর্শন করেছেন, এখন সর্বত্র সকলেই সেই পথানুসারী হচ্ছে। মিল বলেছেন—তাবৎ লোককে লেখাপড়া শেখানো রাজার কর্তব্য। তাঁর ইচ্ছা ছিল সকল লোকেই বিদ্যাভ্যাস করবে।

মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে মিল অনেকের যথেচ্ছাচারিতা দমন করেছেন। মিল স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন এবং প্রজার রাজকরের লাঘব ও তার সুবিধার কথাও বলেছেন।

এরপর বঙ্কিম দুই দার্শনিক, মিল ও কোমতের পরস্পরের মতবাদ নিয়ে অল্প দু একটা কথা বলেছেন। শেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে মিল যে

কিরূপ ভারতবন্ধু ও ভারতহিতৈষী ছিলেন, সে সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বলেছেন।

বঙ্কিমের এই লেখাকে কি চোখের জল ফেলে দীর্ঘ শোক প্রস্তাব বলে? এ তো এক মহান্ মানব দরদীর মৃত্যুতে প্রথমে শোকের একটা কথা বলে তারপরে তাঁর কাজের কয়েকটা কথাই বলা হয়েছে।

অমিত্রবাবু লিখেছেন—'বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বঙ্কিম বিদ্যাসাগর সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কোন রচনা লেখেন নি। কিন্তু পরিবর্তে··· সেই পুরাতন প্রবন্ধ-খানি (বহুবিবাহ) 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের মধ্যে সাড়ম্বরে মুদ্রিত করলেন।'

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে কোন প্রবন্ধ লেখেন নি সত্য। তবে বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে দেখা যায়—'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর হইবার পর বঙ্কিমবাবু একখানি সমবেদনা সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন; সে পত্রও পাওয়া যায় নাই।'

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐ সমবেদনা সূচক পত্রখানি লিখেছিলেন। বিহারীবাবুর লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে—বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকেও চিঠি লিখতেন।

বঙ্কিমের ঐ সমবেদনা সূচক পত্র এবং বিদ্যাসাগরকে লেখা আরও চিঠির কথা থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে, বঙ্কিম সমগ্র জীবনব্যাপী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে গিয়েছিলেন। এতে বরং অমিত্রবাবুর কথার উল্টোটাই প্রমাণ হয়।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। এর অনেক আগেই 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র লেখাও একরূপ ছেড়ে দেন। তবে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, প্যারীচাঁদের পুত্রদের অনেক বছর আগে কথা দিয়ে রেখেছিলেন বলেই। আর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত জীবনীটি লিখেছিলেন—সে মূলতঃ 'সঞ্জীবনী সুধা' গ্রন্থ করে অভাবী ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশের সংসারে একটা আয়ের ব্যবস্থা করে দিতে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত শ্রীশ মজুমদার তাঁর 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছেন—'১৮৯১ অব্দের শরৎকালে···বঙ্কিমবাবুকে তাঁহার কলিকাতার বাড়িতে দেখিতে পাই। অল্প দিন মাত্র তখন তিনি পেন্সন লইয়াছিলেন,

শরীর ভাল ছিল না। পূর্ণবাবু কাছে বসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—'আগে বলতেন, পেন্সন লইয়া খুব লিখিব—এখন ?' মৃদু হাসিয়া তিনি উত্তর করিলেন—'এখন গঙ্গার চড়ায় হরিনাম লিখিতে পারিলেই আমার হয়। তোমরা লেখ।'

শ্রীশবাবুর লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে—বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর সময় করে বঙ্কিমচন্দ্রের শরীর ভাল ছিল না। তবুও তো তিনি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে নিজের শোক জানিয়ে সমবেদনা সূচক চিঠি লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে পৃথক কিছু না লিখলেও কিছুদিন পরে ১৮৯২ অব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেন—'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।'

আর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থটি করার সময় ঐ বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' বা ভূমিকায় লেখেন—'বহুবিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।·· কেননা এখন তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) শোকে আমরা সকলেই কাতর।···সকলেই রোদন করিতেছি।'

অমিত্রবাবু লিখেছেন—বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে কোন রচনা না লিখে তার পরিবর্তে তাঁর বিদ্যাসাগর-বিরোধী 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি সাড়ম্বরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' ২য় ভাগের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

বঙ্কিমের নিজেরই লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধকে খণ্ডিত করে অর্থাৎ অনেকাংশ বাদ দিয়েই মুদ্রিত করেছিলেন। আর অনেক ইতস্ততঃ করে কেন যে ঐ খণ্ডিত অংশই গ্রন্থভুক্ত করেছিলেন, তারও বিস্তৃত কারণ, প্রবন্ধটির মুখবন্ধে পৃথকভাবে বলেছেন।

অতএব অমিত্রবাবু যে লিখেছেন—বঙ্কিম সাড়ম্বরে তাঁর সেই পুরাতন প্রবন্ধখানি বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে মুদ্রিত করলেন, তা ঠিক নয়।

বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের ভাষাকে অতি সুমধুর মনোহর, ইত্যাদি বলে যে প্রশংসা করেছিলেন, বঙ্কিমের ঐ লিখিত স্বীকৃতিকে অস্বীকার করে অমিত্র-বাবু লিখেছেন—'আমাদের প্রশ্ন বঙ্কিম সত্যই কি এখানে বিদ্যাসাগরের ভাষার মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন ? আমার তা মনে হয় না।···বঙ্কিম যে বিদ্যাসাগরের

ভাষাকে অতি মনোহর বলেছেন, তা নিতান্তই তাঁর মৌখিক উক্তি মাত্র। আসলে স্তুতির ছলে বিদ্যাসাগরের নিন্দাই করেছেন। বঙ্কিম সুদক্ষ লেখক ছিলেন।··তিনি কলম চালাতে জানতেন, আবার তিনি আদালতও চালাতেন।'

ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের প্রণেতা ও গীতার ব্যাখ্যাকার প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ একটা সহজ সরল উক্তিকে, কপট উক্তি ইতিপূর্বে আর কেউই কোন দিনই বলেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় এই সময়েই তরুণ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব এবং বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র।'

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বঙ্কিমের এই কথাকেও কি মিথ্যা উক্তি বলতে হবে?

ঐ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দেই বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষার বাংলা সংকলন গ্রন্থটি করতে গিয়ে তাতে বিদ্যাসাগরের দুটি রচনা দিয়ে ভূমিকায় লিখেছিলেন—Pandit Iswar Chandra Vidyasagar's beautiful renderings from Kalidasa,

একেও কি বলতে হবে, বঙ্কিম এখানেও স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকদের কাছে কপট হয়ে বিদ্যাসাগরের স্তুতির ছলে নিন্দাই করেছিলেন?

এই বইয়ে আগে দেখিয়েছি, বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা ঐ এন-ট্রান্সের বাংলা সংকলন গ্রন্থে দেন নি। তখনকার অন্য অনেক গদ্য লেখকের রচনা ঐ সংকলন গ্রন্থে না দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুটি রচনা দিয়েছিলেন এবং ভূমিকাতেও ঐ কথা বলেছিলেন।

এতেও কি প্রমাণ হয় না যে, বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি বা সাহিত্য প্রতিভাকে স্বীকার করতেন?

বঙ্কিম তাঁর 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধের উপসংহারে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লিখে-ছিলেন—'তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতঘ্ন।'

আগে বলেছি, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে বঙ্কিম তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন—'তাঁহার শোকে আমরা সকলেই কাতর।··· সকলেই রোদন করিতেছি।'

অমিত্রবাবু যাই বলুন, প্রবীণ বঙ্কিমের এ সকল যে অকপট ও সশ্রদ্ধ উক্তি তাতে কারও কোন সন্দেহ নেই।

এবার সন্তোষ অধিকারীর সেই, বঙ্কিমের বাংলায় বি. এ. ফেল করার কথাটা—

'দেশে' সন্তোষবাবুর চিঠি পড়ে আমি তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করি এবং জিজ্ঞাসা করি—বঙ্কিমচন্দ্র যে বি. এ. পরীক্ষায় বাংলায় ফেল করেছিলেন, এ খবর আপনি পেলেন কোথায়?

উত্তরে সন্তোষবাবু বললেন—'মন্দিরা' পত্রিকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শত বার্ষিকী সংখ্যায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধটা পড়ে আমি তখন একদিন হেমেন্দ্র-বাবুর সঙ্গে দেখা করি। সেইদিনই তিনি আমাকে বলেছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র বি. এ. পরীক্ষায় বাংলা এবং সংস্কৃত দুটাতে ফেল করেছিলেন। ৮ নম্বর করে কম পেয়েছিলেন। ঐ দুটা বিষয়েরই পরীক্ষক ছিলেন—বিদ্যাসাগর মশায়।

সন্তোষবাবুকে বললাম—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিট বইয়ে কিন্তু ৮ নম্বর কম পাওয়ার কথা নেই, আছে অনধিক ৭ নম্বর। আর দুটা বিষয়ে তো নয়, একটা বিষয়ে।

সন্তোষবাবু বললেন—হেমেন্দ্রবাবু আমাকে ঐ কথাই বলেছিলেন।

সন্তোষবাবু অমিত্রবাবুর 'সাগর ও সম্রাট' পড়ে যেমন ভুল করে বঙ্কিমচন্দ্রকে আজীবন সর্বপ্রকারে বিদ্যাসাগর-বিরোধী বলে লিখে ভুল করেন, তেমনি হেমেন্দ্রবাবুর কথা শুনে বঙ্কিমকে বাংলায় ফেল করেছিলেন বলে লিখে আর একটা বড় ভুল করেছেন।

এখন এ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Minutes for the year 1958 বইয়ে কি আছে তা প্রথমে উদ্ধৃত করছি—

3. Read a letrer from the University Board of Examiners in Arts, stating that of the 13 candidates for the degree of B. A, three had been absent during the whole or a portion of the Examination and that of the others, all had failed.

Read also a letter from the like Board, recommanding that the candidates viz : Bankim chunder Chatterjee and

Judoonath Bose, who had passed creditably in five of the six subjects, and had failed by not more than seven marks in the sixth, might as a special act of grace, be allowed to have their degrees, being placed in the second division.

হেমেন্দ্রবাবুও তাঁর 'মন্দিরা' কাগজের প্রবন্ধে এই কথাই লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—'প্রথম উপাধি পরীক্ষায় ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দু জন সাফল্য লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাদের অন্যতম। এই দু'জনকেও কিছু গ্রেসমার্ক দিতে হইয়াছিল।'

বঙ্কিম কোন্ বিষয়ে ফেল করেছিলেন, হেমেন্দ্রবাবু তা বলেন নি। তবে সন্তোষবাবুর কাছে বলা তাঁর কথা যে ঠিক নয়, তার প্রথম প্রমাণ, অনধিক ঐ সাত নম্বর গ্রেস দেওয়ার কথা। বঙ্কিমই যে ৭ নম্বর কম পেয়েছিলেন, তা নাও হতে পারে। ঐ ৭ নম্বর যদুনাথের কম ছিল, এমনও হতে পারে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দু জনকে পাস করাবেন স্থির করেই ঐ ৭ নম্বর গ্রেস দিয়েছিলেন।

হেমেন্দ্রবাবুর কথা যে সত্য নয়, তার দ্বিতীয় প্রমাণ—বঙ্কিম সংস্কৃতের পরীক্ষা দেন নি। শুধু বাংলার পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সংস্কৃতের পরীক্ষা দিতে হয় নি। এ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপিত তখনকার নিয়মাবলীর কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

8. Candidate for the Degree of B. A. shall be examined in the following subjects :—

1. Languages

Two of the following Languages, of which English must be one :—

English, Greek, Latin, Hebrew, Arabic, Persian, Sanskrit, Bengali, Oorya, Hindi, Urdu, Barmese.

(University of Calcutta, Minutes for the year 1857, P 89)

বঙ্কিম সংস্কৃতে পরীক্ষা না দিয়ে মাতৃভাষা বাংলাতেই যে শুধু পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তার আরও একটা প্রমাণ এই যে, সেদিন ৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার তারিখে একই সময়ে বাংলা ও সংস্কৃত পরীক্ষা হয়েছিল।

ইংরাজি এবং মাতৃভাষা বা কোন একটি প্রাচীন ভাষা—এই দুটি ভাষা

পরীক্ষা ছাড়া, সেবার আর আর যে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, সেই বিষয়গুলি হ'ল—II. History, III. Mathematics and Natural Philosophy, IV. Physical Sciences, V. Mental and Moral Sciences.

বঙ্কিম দুই ভাষা পরীক্ষায় নয়, এই বিষয়গুলির কোন একটিতেই পাস মার্ক অপেক্ষা অল্প কয়েক নম্বর কম পেয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

এই কম নম্বর পাওয়ার প্রধান কারণ, প্রশ্নপত্র ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং অল্প দিনের নোটিশে তিনি ঘরে পড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

বঙ্কিম কোন মতেই বাংলায় ফেল করতে পারেন না। তার কারণ, সেবার বাংলার পাঠ্য বিষয় ছিল যেমন সহজ, প্রশ্নপত্রও হয়েছিল তেমনি সহজ।

বাংলার পাঠ্য ছিল—বত্রিশ সিংহাসন, পুরুষ পরীক্ষা ও মহাভারতের প্রথম তিন পর্ব।

বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রকে দু ভাগে ভাগ করে একই দিনে দুবারে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। প্রথমার্ধের পরীক্ষার সময় ছিল, সকাল দশটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। আর দ্বিতীয়ার্ধের পরীক্ষা দুটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত।

দুটি প্রশ্নপত্রেই মূল দুটি করে প্রশ্ন ছিল। যেমন, প্রথমার্ধের প্রথম প্রশ্নটি ছিল—

বাংলা মহাভারতের ত্রিপদী ছন্দের এক জায়গার ১৩টি শ্লোক উদ্ধৃত করে, সেই শ্লোকগুলির উপর কয়েকটি ছোট ছোট প্রশ্ন করা হয়েছিল। এই প্রশ্নগুলির প্রায় সব ক'টিতেই ঐ উদ্ধৃত বিভিন্ন শ্লোকের বা শ্লোকার্ধের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

প্রথমার্ধের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল—'পুরুষ পরীক্ষা' থেকে একটি ছোট কাহিনী উদ্ধৃত করে, ঐ কাহিনীর কয়েকটা কথা নিয়ে, সেগুলির অর্থ ও তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

প্রশ্নপত্রের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম প্রশ্ন ছিল,—১১।১২টি বাংলা বাক্যের এক গদ্যাংশকে ইংরাজিতে অনুবাদ করতে বলা হয়েছিল। অপর প্রশ্নটি ছিল, ঐরূপ একটা ইংরাজি গদ্যাংশকে বাংলায় অনুবাদ করতে বলা হয়েছিল।

পরীক্ষার সময় সীমা সাড়ে তিন ঘণ্টা করে থাকলেও, এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যেই এক এক প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখা সম্ভব ছিল।

এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথমে নিয়ম ছিল, পরীক্ষার ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৫ থেকে ৪৯ নম্বর পর্যন্ত পেলে ২য় বিভাগের পাস নম্বর এবং ৫০ থেকে তদূর্ধ্বে পেলে ১ম বিভাগের পাস নম্বর বলে গণ্য হবে। বি. এ. পরীক্ষার ক্ষেত্রে এর কিছু হেরফের হলেও, মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় ঐ সহজ প্রশ্নপত্রে অনেক বেশী নম্বর পেয়েছিলেন।

সেবারের বি. এ. পরীক্ষার ইংরাজি ও বাংলা বিষয় দুটি নিয়ে ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সাহিত্য-সাধক চরিতমালার অন্তর্গত বঙ্কিম-জীবনীতে লিখেছেন—

1. English, Latin, Greek

2. Sanskrit, Bengali, Hindi, Ooria.

এঁরা প্রথম পত্রের ইংরাজির কথায় কেবল বলেছেন—ইংরাজি অবশ্য পাঠ্য ছিল। দ্বিতীয় পত্রের কোন্‌টি অবশ্য পাঠ্য, আর কোনটি ঐচ্ছিক কিনা সে সম্বন্ধে একটিও কথা বলেন নি। তাই এঁদের লেখা পড়লে মনে হবে, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, উড়িয়া সব কটিতেই পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ হয়ত এঁদের লেখা পড়েই ভুল করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা এবং সংস্কৃতেও পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

ব্রজেনবাবুদের ঐরূপ লেখাটি যে ঠিক নয়, ভুল; তা প্রমাণিত হচ্ছে আগে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার নিয়মাবলীর উদ্ধৃতি থেকে।

ব্রজেনবাবুরা আরও ভুল করেছেন, Historyর প্রশ্নপত্রের জায়গায় History and Geography এবং Physical Sciences এর জায়গায় Natural History and Physical Sciences লিখেও।

এবার ঐ 'দেশ' পত্রিকাতেই লেখা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের আর দুটি ভুলের কথা বলছি—

১৯-৭-৮০ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় অমিত্রবাবু তাঁর বঙ্কিম-বিষয়ক আর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—(১) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির বিদ্বজ্জনসমাগম সভার দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। সেই সভা হয়েছিল ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে।

আমার বক্তব্য—বিদ্বজ্জন সমাগম সভায় প্রথম অধিবেশন হয় ১২৮১ সালের

বৈশাখ মাসে। এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয় যথারীতি ১২৮২ সালের বৈশাখেই। তখনকার সাপ্তাহিক 'সাধারণী, পত্রিকায় এই ২য় বার্ষিক সভার একটা বিবরণও প্রকাশিত হয়েছিল। এই সভার অধিবেশন তখন প্রতি বৎসরই হ'ত বলে মনে হয়। তাহলে ১২৮৭ সালের সম্মেলন ২য় না হয়ে হবে ৭ম বার্ষিক সম্মেলন।

(২) অমিত্রবাবু লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় পাঠ করেছিলেন। সেই সভায় সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

এ সম্পর্কেও আমার বক্তব্য—

বিদ্যাসাগরের জীবনী লেখক বিখ্যাত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সেদিনের ঐ প্রবন্ধ পাঠের সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে দারুণ ভীড়ের মধ্যে তিনি সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্রকে সভাস্থলের বাইরে যাওয়ার সহজ সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সভার পরের দিন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তখন তাঁদের উভয়ের মধ্যে আগের দিনের সভার প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক কথাও হয়েছিল। চণ্ডীবাবু তাঁর এক প্রবন্ধে সেসব কথা বিস্তৃতভাবে লিখে গেছেন। তাঁর ঐ প্রবন্ধ ছাপা হয় সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে। চণ্ডীবাবু তাঁর ঐ প্রবন্ধে পরিষ্কার লিখে গেছেন—সেদিন রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠের সভা হয়েছিল জেনারেল এসেম্বলীর (বর্তমান নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) হলে।

অমিত্রবাবু, রবীন্দ্রনাথের ঐ সভা চৈতন্য লাইব্রেরীতে হয়েছিল বলে যা লিখেছেন, তা ভুল। 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের লেখক ভবতোষ দত্তও ঐ কথা লিখে ঠিক এই একই ভুল করেছেন।

অমিত্রবাবু ও ভবতোষবাবু এঁরা এঁদের বঙ্কিম-বিষয়ক বই লেখার সময় বহুবার 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' বইটি পড়েছেন, তবুও এঁরা এই ভুল করেছেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনীতেও বঙ্কিমচন্দ্রের পৌরোহিত্যে চৈতন্য লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধ পাঠের সভা হয়েছিল, এই ভুলই লেখা আছে।

একটি অজ্ঞাত কাহিনী

প্রতিদিনই দেশ-দেশান্তরের লোক কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-তীর্থে এসে এখানকার 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'টি দেখে যান। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে একদিন বিকালে শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত নামে এমনি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এলেন কাঁটালপাড়ায় এই বঙ্কিম-তীর্থে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা দেখলেন। শেষে আমাকে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ জেনে আমার কাছে এসে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটা কথা শুনতে চাইলেন।

আমার মুখে তাঁর প্রশ্ন সমূহের বিস্তৃত উত্তর পেয়ে শেষে তিনি বললেন—এইবার আমি আপনাকে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কাহিনী শোনাব। সেটা আমার পিতামহ শিবশংকর দাশগুপ্তর আমলের একটা বিরাট মামলার কথা। সেই মামলার ফলেই আমার পিতামহ একেবারে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। সেই মামলার কথা আজ আর কেউ জানে না এবং সে কথা এ পর্যন্ত কোথাও লেখাও হয় নি।

এই বলে শান্তিরঞ্জনবাবু একটি চাঞ্চল্যকর কাহিনী শোনালেন।

তাঁর মুখে কাহিনীটি শুনে তাঁর উপস্থিতিতে তখনই আমি ঘটনাটা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে নিই। ঐ ঘটনায় উল্লেখিত নদ, নদী, গ্রাম, গঞ্জ এবং লোকজনের নামগুলিও লিখে নিয়েছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের সেই অজ্ঞাত কাহিনীটি এখন এখানে বলছি—

শিবশংকর দাশগুপ্তের বাড়ি ছিল বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত নলচিড়া নামক গ্রামে। শিবশংকরবাবু ছিলেন একজন ছোটখাট জমিদার। তাঁর জমিদারিটা ছিল খুলনা জেলায় চরডাকাতিয়া গ্রামে। এই চরডাকাতিয়া তালুকের আয় ছিল মাত্র আট হাজার টাকা।

শিবশংকরবাবু তাঁর ভগ্নীপতি রামসাগর সেনকে জমিদারি দেখাশুনার ভার দিয়ে নিজে বরিশাল শহরে মোক্তারি করতেন। রামসাগর সেনের বাড়ি ছিল যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত কালিয়াবেন্দা গ্রামে। রামসাগরবাবু চরডাকাতিয়া গ্রামে কাছারি বাড়িতেই থাকতেন। কাছারিতে নায়েব, গোমস্তা, পাইকও ছিল।

চরডাকাতিয়া গ্রাম থেকে আড়াই মাইল দূরে চিতলমারীতে তখন ছিল একটা খুব বড় হাট।

চিতলমারী হ'ল খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায়। চিতলমারী বাগেরহাট শহর থেকে তের মাইল উত্তর-পূর্বে এবং বাগেরহাট থানার সীমান্তে অবস্থিত। বলেশ্বর ও চিত্রা নদীর সংগমস্থলে এই চিতলমারী। এখানে তখন যে প্রকাণ্ড হাটটি ছিল, সেই হাটে সকল প্রকারের বহু দোকান ছিল। এখনকার মত তখন এত ঘন ঘন হাট বা বাজার ছিল না। চিতলমারীর হাট বা গঞ্জটিতে নিকটবর্তী গ্রামের লোকজনের ন্যায় বহু দূর দূর গ্রামের লোকেও বেচাকেনা করতে আসত।

একবার চরডাকাতিয়া গ্রামের এক নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ ঐ চিতলমারীর হাটে তামাক ও চিটেগুড় বিক্রি করতে যায়।

চিতলমারী ছিল মুসলমান প্রধান গ্রাম এবং ঐ হাটের জমিদারও ছিলেন এক মুসলমান ভদ্রলোক।

সেদিন হাটে এক মুসলমান খরিদ্দার চরডাকাতিয়ার ঐ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের কাছে তামাক ও চিটেগুড় কিনতে গিয়ে দাম নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে থাকে। শেষে এমন হয় যে, দুজনেই খুব তেরিয়া হয়ে ওঠে। এই সময় মসলমান খরিদ্দারটি রাগের বশে ঐ ব্রাহ্মণের চিটেগুড়ের কলসী পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়। এতে কলসীর গুড় সব মাটিতে পড়ে যায়।

ব্রাহ্মণ অপমান সহ্য করে চলে এসে তাদের গ্রামের মালিক রামসাগর সেনকে সমস্ত জানাল। রামসাগর সেনের সঙ্গে চিতলমারীর জমিদারের মোটেই সদ্ভাব ছিল না। অনেক দিন থেকেই একটা ঝগড়া-ঝাটি চলে আসছিল। রামসাগর ভাবলেন—আমার প্রজাকে ওখানকার লোকেরা এইভাবে অপমান করবে, এ কিছুতেই সহ্য করা হবে না। ওরা প্রায়ই এইভাবে চরডাকাতিয়ার লোককে অপমান করে। এই ভেবে তিনি সেইদিনই সন্ধ্যায় গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর নমঃশূদ্রকে ডাকালেন। ডাকিয়ে তাদের চিতলমারীর হাটে মুসলমান খরিদ্দার কর্তৃক তাদের সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের অপমানের কথা শোনালেন।

এদের কেউ কেউ অবশ্য ইতিপূর্বেই ঐ ব্রাহ্মণের অপমানের কথা অন্যদের মুখ থেকেও শুনেছিল।

রামসাগরবাবু সকলকে বললেন—আমি ভেবে দেখলাম, ওখানকার লোক-

দের বড্ড বাড় বেড়েছে। ওদের একটু শায়েস্তা করতেই হবে। আমাদের গ্রামের লোক ওদের হাটে গেলে, ওরা প্রায়ই তাদের উপর অত্যাচার করে। ওদের গ্রামের জমিদারও এতে কিছু বলেন না। জমিদারের বলেই ওদের এত সাহস। তাই আমি অনেক ভেবে স্থির করছি, ঐ চিতলমারী হাট লুঠ করাব। দেখা যাক্, ওখানকার জমিদার কি করতে পারেন? তোমরা এক কাজ কর, আমাদের এই গ্রামকে কেন্দ্র করে কুড়ি মাইল ব্যাপী চারি দিকে যেখানে যত নমঃশূদ্র আছে, তাদের খবর দাও যে, অমুক দিন চিতলমারীর হাট লুঠ করতে হবে। বলবে, ওখানকার মুসলমানরা তোমাদের এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের দারুণ অপমান করেছে। তোমরা এও বলবে—আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। এবং আমিই এই হাট লুঠের হুকুম দিচ্ছি।

চরডাকাতিয়ার নমঃশূদ্ররাও কোন কোন কারণে চিতলমারীর মুসলমানদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। এখন রামসাগরবাবুর এই কথায় তারা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং চারিদিকের গ্রামগুলিতে স্বজাতিদের মধ্যে গোপনে এই হাট লুঠের কথা প্রচার করতে লাগল।

ঠিক ঐ সময় বাগেরহাট থেকে মোল্লারহাট পর্যন্ত ২৫ মাইলের একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছিল। তাতে পাঁচ ছ শ পশ্চিমা কুলী বা মজুর কাজ করছিল। তাদেরও প্রলোভন দেখিয়ে হাট লুঠের কাজে প্ররোচিত করা হয়েছিল।

নমঃশূদ্ররা হাট লুঠের কথা গোপনে প্রচার করলেও কানাঘুষায় কথাটা কিছু কিছু ফাঁস হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ফাঁস কথা চিতলমারী হাটের মুসলমান জমিদারের কানে গিয়েও পৌঁছেছিল। তিনি কিন্তু ঐ কথায় ততটা গুরুত্ব দেন নি। তিনি ভেবেছিলেন--হাট লুঠ হলে ক্ষতি হবে হিন্দুদেরই বেশী। কারণ, হাটে হিন্দুর দোকানই বেশী। অতএব শেষ পর্যন্ত হাট লুঠ নাও হতে পারে।

তাই তিনি লুঠ ঠেকানোর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। আর প্রস্তুত থাকলেও তিনি অত লোকের বিরুদ্ধে পেরেও উঠতেন না।

যাই হোক্, নির্দিষ্ট দিনে কয়েক হাজার লোক লাঠি, সড়কি প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চিতলমারীর বিরাট হাটটি লুঠ করে নিল।

দোকানীরা প্রস্তুত ছিল না। তারা এত লোক দেখে বাধাও দিতে পারল না।

হাটে ছোট বড় করে ছ সাত শ দোকান ছিল। সমস্ত দোকানই লুঠ হ'ল।

লুণ্ঠনকারীরা বিনা বাধাতেই সমস্ত জিনিষ লুঠ করে নিয়ে গেল। অবশ্য যে যত পারল সঙ্গে নিল, বাকি সব জিনিস নদীর জলে ফেলে দিল, নয়তো আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিল।

আগুন লাগাবার ফলে হাটের সমস্ত দোকানই পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

লুণ্ঠনকারীরা অন্যান্য জিনিসের ন্যায় নদীতে এত বেশী কেরোসিন তেল, সরষের তেল ও নারকেল তেল ঢেলে ছিল যে, লোকে কয়েক দিন নদীর জল ব্যবহার করতে পারে নি।

চিতলমারীর হাট লুঠ হবার পর খুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঐ লুঠের খবর গেল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন খুলনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই খবর পেয়ে তখনই কোশ নামে এক রকমের বড় নৌকায় এক পুলিশবাহিনী নিয়ে রওনা হলেন। কোশ নৌকাগুলির পিছন দিকটা একটু উঁচু এবং সামনের দিকটা একটু নীচু। এই নৌকা ৪০।৫০ হাত লম্বা এবং ১৫।১৬ হাত চওড়া। বোঝাই নেয় প্রায় হাজার মণ।

বঙ্কিমচন্দ্র এই কোশ নৌকায় করে জলপথে চিতলমারী আসার সময় নদীতে তেলের স্রোত দেখে লুঠের পরিমাণ অনেকটা অনুমান করতে পারলেন। তিনি চিতলমারীর কাছাকাছি এসে নদীর ঘাটে এক জায়গায় মেয়েদের মুখে শুনতে পেলেন, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে—'আমাদের যা কাপড় লুঠ করে এনেছে, দু তিন বছর আর কাপড় কিনতে হবে না।'

আর একজন বলছে—'আমাদের তেল, ঘি যা এনেছে, তাতে ক' মাস ভালই চলে যাবে।'

বঙ্কিমচন্দ্র পথে কোথাও না থেমে একেবারে চিতলমারী চলে এলেন। চিতলমারীতে এসে হাট লুঠের সমস্ত ঘটনা শুনলেন এবং হাটের ভস্মাবশেষও দেখলেন। আর কে যে এই হাট লুঠের নায়ক বা নির্দেশকারী তাও শুনলেন।

এদিকে রামসাগর সেন বঙ্কিমচন্দ্র আসছেন শুনেই পলাতক হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে রামসাগর সেনের খোঁজ করতে গিয়ে শুনলেন, তিনি পলাতক হয়েছেন; তখন তিনি চরডাকাতিয়া ও তার আশপাশের গ্রামে গ্রামে গিয়ে লুণ্ঠনকারীদের বাড়িতে বাড়িতে হানা দিয়ে লুণ্ঠনকারীদের ধরতে

লাগলেন। এইভাবে তিনি প্রায় ৩০০ লুণ্ঠনকারীকে ধরলেন। ধরে তাদের খুলনায় পাঠিয়ে দিলেন।

এবার তিনি পুনরায় রামসাগর সেনের খোঁজ করতে লাগলেন। রামসাগর প্রথমে চরডাকাতিয়া থেকে আড়াই মাইল দূরে শৈলদহ গ্রামে গিয়ে সেখানে অধিকারী উপাধিধারী এক অবস্থাপন্ন নমঃশূদ্রের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। এখানেও ধরা পড়বার আশঙ্কা দেখে পরে তিনি বলেশ্বর নদের পূর্ব-পারে বরিশাল জেলার মাটিভাঙ্গা গ্রামে গিয়ে এক গোয়ালার বাড়িতে আত্ম-গোপন করে রইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বহু পরিশ্রমে খোঁজ করে করে মাটিভাঙ্গা গ্রামে যে গোয়ালার বাড়িতে রামসাগর লুকিয়ে ছিলেন, একদিন দুপুরে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন।

রামসাগরবাবু তখন রান্না করে স্নান করবার আগে তেল মেখে তামাক খাচ্ছিলেন।

রামসাগরবাবু সামনে পুলিশসহ বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে রামসাগরবাবুর মাথায় ও চোখে-মুখে জল দিয়ে পাখার বাতাস করায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র রামসাগরবাবুকে বললেন—সেন মশায়, আপনি আহারাদি সেরে নিন। আপনার তেমন কোন ভয় নেই।

রামসাগরবাবু আর স্নান আহার করবেন কি! তিনি সকলের কথায় স্নান করে কোন রকমে কিছু মুখে দিলেন।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে নিয়ে খুলনায় চলে এলেন। মূল আসামী রামসাগর সেন সহ ধৃত লুণ্ঠনকারীরা সকলেই হাজতে রইল।

মামলা শুরু হল এবং এই মামলা ছ সাত মাস চলল। মামলা চলাকালে হাজতেই রামসাগর সেন মারা গেলেন।

রামসাগরবাবু মারা গেলে শিবশংকরবাবু জমিদারি দেখাশুনা করবার জন্য মোক্তারি ছেড়ে বরিশাল থেকে বাড়ি চলে এলেন।

বিচারে বহু লোকের জেল হয়েছিল। শিবশংকরবাবু মোকদ্দমার সমস্ত ব্যয় বহন করে ছিলেন। শুধু তাই নয়, যাদের জেল হয়েছিল, তাদের সংসার খরচও বহন করেছিলেন। এই মামলায় তাঁর প্রায় ২৫ হাজার টাকা খরচ

হয়েছিল। শিবশংকরবাবু দেনা করে কোন রকমে জমিদারিটা রক্ষা করতে পারলেও, এই মামলাতেই তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

চিতলমারীর হাট লুঠের এই ধরপাকড় ও মোকদ্দমা থেকে সরকারী কর্মচারী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতা তো বটেই, তাছাড়া তাঁর নিরপেক্ষতা সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ ভাবে জানতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাংলার কৃষক প্রবন্ধে দরিদ্র হাসিম সেখের কষ্টে কাঁদলেও এবং তাঁর উপন্যাসে একাধিক মহৎ মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করলেও, তাঁর উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর মুখের কয়েকটা কথাকে নিয়ে মুসলমানরা তাঁকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলে থাকেন। কিন্তু এই চিতলমারী হাট লুঠের মোকদ্দমা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ না করে হিন্দু লুণ্ঠনকারীদেরই ধরবার জন্য নিজেই কি পরিশ্রমই না করেছিলেন!